

বুড়ো আংলা


অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর



আ লো কি ত মা নু ষ চা ই

বু ড়ো আ ং লা
অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর



 বিশ্বসাহিত্য কেন্দ্র

বিশ্বসাহিত্য কেন্দ্র প্রকাশনা ২০১

গ্রন্থমালা সম্পাদক
আবদুল্লাহ আরু সায়ীদ

প্রথম বিশ্বসাহিত্য কেন্দ্র সংস্করণ
পৌষ ১৪১২ ভিসেস্বর ২০০৫

প্রথম সংস্করণ দ্বিতীয় মুদ্রণ
ফাল্গুন ১৪১৭ ফেব্রুয়ারি ২০১১



প্রকাশক

মোঃ আলাউদ্দিন সরকার

বিশ্বসাহিত্য কেন্দ্র

১৪ কাজী নজরুল ইসলাম এভিনিউ

ঢাকা ১০০০ ফোন ৯৬৬০৮১২ ৮৬১৮৫৬৭

মুদ্রণ

সুমি প্রিন্টিং প্রাইভেট লিমিটেড

৯, নীলক্ষেত্র, বাবুপুরা, ঢাকা ১২০৫

প্রচ্ছদ

প্রব এফ

মূল্য

একশত চল্লিশ টাকা মাত্র

ISBN-984-18-0200-7

BUROANG! A by Apurindranath Tagore (A Novel)

Published by Bishwo Shanitto Kendro, 14 Kazi Nazrul Islam Avenue, Dhaka 1000 Bangladesh

Cover Design: Dhruva Esh, First Edition: December 2005, Price: Tk. 140/-

অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর ও তাঁর বুড়ো আংলা

‘প্রাচীন জ্ঞান ও কাব্যকলার নতুন আবিষ্কার, জীবন সম্বন্ধে মানুষের নতুন আশা-আনন্দ, ধর্ম বা জীবনাদর্শ সম্বন্ধে নতুন বোধ’—এই যে বৈশিষ্ট্যগুলোর কথা বলা হল কোনও জনসমাজে এইসব বোধের জাগরণকে রেনেসাঁস বলা হয়। ‘অধিকাংশের মতে রেনেসাঁসের প্রধান লক্ষণ হল দিব্যচেতনার পরিবর্তে মানবিক চেতনা, ব্রহ্মজ্ঞানের পরিবর্তে বস্তুজ্ঞান, পারলৌকিক বা অলৌকিক কার্যকারণ-পরম্পরা, ভক্তির পরিবর্তে যুক্তি, আগুবােক্যের পরিবর্তে প্রমাণসিদ্ধ বাক্য, অথরিটির পরিবর্তে লিবার্টিং।’ যে বৈশিষ্ট্যগুলোকে এখানে চিহ্নিত করা হল এসবের স্পষ্ট প্রভাব পড়েছিল উনিশ শতকের বাঙালির জনজীবনে। অবশ্য দেশ পরাধীন ছিল বলে এবং এসবের অভিঘাত ব্যাপক হয়ে উঠতে পারেনি বলে অনেকে একে রেনেসাঁস বলে মানতে রাজি হন না। সত্যিকার অর্থে বাংলার রেনেসাঁস হয়েছে কি হয়নি এ নিয়ে জোর বিতর্ক না করেও আমরা অনায়াসে বুঝতে পারি যে বাঙালিদের মধ্যে সে সময় এই ধরনের চেতনার অভিব্যক্তি দেখা দিয়েছিল। হিন্দুসমাজের মধ্যে উনিশ শতকে এ যে দেখা দিয়েছিল তা নয় বিশ শতকের বিশের দশকে ঢাকা শহরকে কেন্দ্র করেও মুসলমান সমাজের মধ্যে দেখা দিয়েছিল এ জাগরণ। আর এই অভিঘাতের সূত্র ছিল ইংরেজদের ঔপনিবেশিক শাসন, এদেশের ইতিহাসের ধারাবাহিকতার পরিণাম নয়। এই অভিব্যক্তিকে রেনেসাঁস বলা হোক আর না হোক এর ফল শ্রুতিতেই ইয়োরোপের রেনেসাঁসের মতো মধ্যযুগীয় দৃষ্টিভঙ্গি থেকে বাংলাদেশের মানুষের মন আধুনিক যুগের দড়জায় এসে দাঁড়িয়েছিল। ইয়োরোপেরও এই প্রক্রিয়া চলেছিল চারশো বছর ধরে। অনেকটা অনুরূপ ঘটনা ঘটেছিল বঙ্গদেশেও, আর সেটা ঘটেছিল সংক্ষিপ্তভাবে দুই দফায়। এইজন্যই বাংলার রেনেসাঁসকে পাশ্চাত্যের রেনেসাঁসের সঙ্গে তুলনা করে দেখা হয়, যদিও আমাদের রেনেসাঁসের সঙ্গে তাদের পার্থক্যও রয়েছে অনেক ক্ষেত্রেই। প্রাসঙ্গিক নয় বলে এখানে তা নিয়ে বিস্তারিত আলোচনার অবকাশ নেই। তবে এ-কথা স্বীকার করতেই হবে যে, অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর (১৮৭১-১৯৫১) শিল্পী হিসেবে বিকশিত হয়ে উঠেছিলেন বাংলার রেনেসাঁসের সেই উনিশ শতকী পরিমণ্ডলে। রেনেসাঁসেরই বেশকিছু বৈশিষ্ট্যের সমাহার ঘটেছিল তাঁর সমগ্র ব্যক্তিত্বে। রেনেসাঁস মানুষ হিসাবে অবনীন্দ্রনাথের পরিচয় তুলে ধরা এই রচনার উদ্দেশ্য নয় বলে এখানে তা নিয়ে বিস্তারিত আলোচনায় যাব না। তবে শিশুসাহিত্য চর্চায় তাঁর অগ্রযাত্রার পথরেখা ধরে এগোতে গেলে আমরা তাঁর মধ্যে যেসব রেনেসাঁসীয় বৈশিষ্ট্য দেখতে পাব তার

উল্লেখ এখানে করব। কারণ তাঁর মধ্যে আধুনিক শিশুসাহিত্যিক সত্তার যে জাগরণ ঘটেছিল তারও উৎসে ছিল উনিশ শতকীয় সেই রেনেসাঁসীয় চেতনাই।

অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুরের জন্ম ১৯৮১ সালের ৭ আগস্ট দুপুর ১২টার দিকে। তিনি ছিলেন জোড়াসাঁকোর ঠাকুর বাড়ির সন্তান। পিতা গুণেন্দ্রনাথ ঠাকুর ছিলেন রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের পিতা দ্বারকানাথ ঠাকুরের সহোদর ভাই গিরীন্দ্রনাথের পুত্র। সেই সূত্রে সম্পর্কে তিনি ছিলেন রবীন্দ্রনাথের ভাইপো। অবনীন্দ্রনাথ রবীন্দ্রনাথকে সম্বোধন করতেন ‘রবিকা’ বলে। পিতা গুণেন্দ্রনাথও ছিলেন গুণী শিল্পী। ছবি আঁকা, গান শোনা, নাচ দেখা ইত্যাদি নিয়ে কাটত তাঁর অনেকটা সময়। ঠাকুরবাড়ির এরকম সাংস্কৃতিক পরিবেশের মধ্যে বড় হয়েছেন অবনীন্দ্রনাথও। রবীন্দ্রনাথের মতো তাঁকেও ভর্তি করা হয়েছিল নর্মাল স্কুলে। কিন্তু সেখানে তিন ক্লাসের বেশি ডিঙানো সম্ভব হয়নি তাঁর পক্ষে কিছুকাল স্কুলের পড়া চলেছে ঘরে বসেই। পরে অবশ্য সংস্কৃত কলেজে ভর্তি করা হয়েছিল তাঁকে। সেখানে কেটেছিল লম্বা নয়টি বছর। সংস্কৃত কলেজে পড়ার শেষ বছরে তাঁর বিয়ে হয় সুহাসিনী দেবীর সঙ্গে। বিয়ের পর ভর্তি হলেন সেন্ট জেভিয়ার্স কলেজে। ওখানে চলল ইংরেজি ভাষার চর্চা। পাশাপাশি সংস্কৃতের চর্চা চলল বাড়িতে। সেন্ট জেভিয়ার্স কলেজে পড়েছিলেন বছরখানেক। এর পর আর বিদ্যায়তনিক লেখাপড়া তেমন চলেনি। সংগীত চর্চা অবশ্য অব্যাহতই ছিল। অব্যাহত ছিল থিয়েটারের চর্চাও। তাও রবীন্দ্রনাথেরই সঙ্গে। গিরিশ ঘোষের মতো সে কালের সেরা নাট্য ব্যক্তিত্ব তাঁর অভিনয় দেখে রীতিমতো প্রশংসা করেছিলেন।

ঠাকুরবাড়ির সাংস্কৃতিক পরিবেশে সকলেই ছোটবেলা থেকে ছবি আঁকার চর্চা করতেন। বড়ভাই গুণেন্দ্রনাথ ঠাকুর তো ছিলেন সমগ্র ভারতবর্ষেরই অন্যতম সেরা চিত্রশিল্পী। তাঁরও ছবি আঁকার চর্চা শুরু হয়েছিল ছোটবেলা থেকে। শুধু তাই নয়, সত্যিকার অর্থে তাঁর সৃষ্টিশীলতারও দৃষ্টিগ্রাহ্য সূচনা ঘটেছিল ছবি আঁকার মধ্য দিয়েই। প্রথমদিকে আঁকতেন ইয়োরোপীয় রীতিতে। ১৮৮০-এর দশকে সে-রীতির শিক্ষা তিনি পেয়েছিলেন আর্টস্কুলের ভাইস প্রিন্সিপ্যাল ওলিনটো গিলার্ডি এবং চার্লস পালমার-এর কাছে। মাত্র তিনমাস প্যাস্টেল, জলরঙ এবং তেলরঙের কাজ শিখে ইয়োরোপীয় রীতির ছবি আঁকায় বিশেষ পারদর্শিতা অর্জন করেছিলেন তিনি। ১৯০৫ থেকে ১৯১৫ সাল পর্যন্ত ক্যালকাটা গভর্নমেন্ট কলেজ অব আর্ট-এ চিত্রকলার প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষা লাভ করলেন। সে-সময়ে সমগ্র ভারতবর্ষ জুড়ে শুরু হয়ে গিয়েছিল স্বদেশি আন্দোলন। তার প্রভাবে সমগ্র ভারতবর্ষব্যাপী শুরু হয়েছিল বিলিতি আচার, বিলিতি দ্রব্য বর্জন। শিল্পী-সাহিত্যিক, রাজনীতিবিদ তথা সমাজের সকল শিক্ষিত মানুষের মধ্যে বৌদ্ধ দেখা দিয়েছিল স্বদেশীয় সংস্কৃতির দিকে। শিল্পী অবনীন্দ্রনাথের মধ্যে এই স্বদেশিয়ানার প্রভাবে ভারতীয় চিত্রশিল্পের ভাষা অনুসন্ধানের সূচনা হয়েছিল। এই পর্যায়ে একে একে তিনি আঁকলেন ‘রাধাকৃষ্ণের চিত্রাবলি’, ‘ভারত মাতা’, ‘শাজাহানের মৃত্যু’, ‘শাজাহানের স্বপ্ন’, ‘কচ ও দেবযানী’, ‘যমুনা তীর’, ‘ঝতু সংহার’, ‘বুদ্ধ ও সুজাতা’, ‘কোণার্কের পথে’, ‘কোণার্কের প্রান্তে’, ‘ওমর খৈয়াম’, ‘যাত্রার শেষ’, ‘শেষ বিশ্রাম’ ইত্যাদি বিখ্যাত ছবিগুলো।

জাপানি চিত্রশিল্পী কাকুজো ওকাকুরার কয়েকজন শিষ্য খাৎসুতা, কন্দু আরাই, হিসীদা ও য়োকোয়ামা তাইকান প্রমুখ এসেছিলেন ভারতবর্ষে। তাঁদের মাধ্যমে জাপানি রীতির চিত্রকলার প্রতি আগ্রহী হয়ে উঠেছিলেন অবনীন্দ্রনাথ। জাপানি শিল্পী হিসীদা এবং য়োকোয়ামা তাইকানের কাছে তিনি নিবিড়ভাবে শিখলেন জাপানি রীতির তুলির কাজ। এ-ছাড়াও তিব্বতী, পার্শিয়ান ও মোগল মিনিয়োচার রীতির ছবি আঁকার অনুশীলন করেছিলেন কিছুকাল। এ-সবেরই প্রভাবে অবনীন্দ্রনাথের ছবিতে এসেছিল নিজস্বতা। এই নিজস্বতাই পরবর্তীকালে প্রাচ্যরীতির আধুনিক চিত্রকলা হিসেবে পরিচিত হতে শুরু করল। ইয়োরোপীয়, জাপানি ও মোগল রীতির মিশেল ঘট্য সত্ত্বেও তাঁর ছবি কিন্তু জটিল নয়, একধরনের সহজতায় বৈশিষ্ট্যপূর্ণ। এই সহজতার পেছনে আছে 'অন্তর্নিহিত রুচি, পরিচ্ছন্নতা, সুমিতি, পরিমিতি এবং সূক্ষ্ম কলাকৌশল'। ১৯০৭ সালে তিনি অন্যান্যদের সঙ্গে প্রতিষ্ঠা করেন 'ইন্ডিয়ান স্কুল অব ওরিয়েন্টাল আর্ট'। সেই সূত্রে তিনি চিহ্নিত হলেন ওরিয়েন্টাল আর্টের পুনরুজ্জীবক হিসেবে। নব্যবঙ্গীয় চিত্রশৈলীর উদ্ভাবক হিসাবে বাঙালি পুনরুজ্জীবনবাদী চিত্রকলা আন্দোলনেরও তিনি পথিকৃৎ। এই যে প্রাচ্যের নবীভবন, শিল্পকলার সৃষ্টিতে শিল্পীর ব্যক্তিত্বের নিজস্বতার ছাপ—এ তো রেনেসাঁসেরই বৈশিষ্ট্য। অবনীন্দ্রনাথদের হাতেই বিলেতি, চীনা, জাপানি, মোগলের সম্মিলনে ভারতশিল্পের রেনেসাঁসের একটা চেহারা দাঁড়িয়েছিল।

তাঁর চিত্রকর্ম প্রথম প্রদর্শিত হয় কলকাতা সরকারি আর্ট কলেজে ১৯০০ সালে; ইন্ডিয়ান স্কুল অব ওরিয়েন্টাল আর্ট, কলকাতায় ১৯০৮ সালে, লন্ডনের কৃষ্ণাল প্যালেসে ১৯১১ সালে; গ্রান্ড প্যালেস, প্যারিস-এর উদ্যোগে *সোসিয়েটে দে ন তু র পঁ অরিয়নটালিস্ত ফ্রঁসেজ*-এর ২২তম প্রদর্শনীতে প্যারিসে ১৯১৪ সালে। ১৯১৯ সালে জাপানেও তাঁর চিত্রকলার একটি প্রদর্শনী অনুষ্ঠিত হয়। এর পর এখানে গ্যালারি, জেনেভার উদ্যোগে সুইজারল্যান্ডে ১৯২৮ সালে এবং বার্লিনে ১৯৩৩ সালে তাঁর চিত্রকলার প্রদর্শনী অনুষ্ঠিত হয়। এ-ছাড়াও ভ্রাম্যমাণ প্রদর্শনী হয় বেলজিয়ামে, নেদারল্যান্ডে এবং ইম্পেরিয়াল ইনস্টিটিউট, ইংল্যান্ডে। ইন্ডিয়ান স্কুল অব ওরিয়েন্টাল আর্ট এবং আমেরিকান ফেডারেশন অব আর্ট ১৯২৪ সালে যৌথভাবে তাঁর চিত্রকলার ভ্রাম্যমাণ প্রদর্শনীর আয়োজন করে। এইসব প্রদর্শনী অনুষ্ঠিত হলে তিনি শিল্পী হিসাবে আন্তর্জাতিক খ্যাতি অর্জন করেন। ১৯৩০ সালের দিকে তাঁর শিল্পীসত্তায় সূচিত হয় নতুন এক ধারা। গাছপালা বা পড়ে পাওয়া জিনিস দিয়ে কোলাজ-এর মতো কার একধরনের ভাস্কর্য গড়তে শুরু করেন তিনি। এর নাম দিয়েছিলেন 'কুটুম কাটাম'।

২

অবনীন্দ্রনাথের সাহিত্যচর্চা শুরু হয়েছিল চিত্রশিল্পী হিসেবে খ্যাতিলাভের অনেক পরে। কিন্তু অবদানের দিক থেকে লেখক হিসেবে তাঁর গুরুত্ব কোনও ভাবেই চিত্রশিল্পী হিসাবে তাঁর গুরুত্বের চেয়ে কম নয়। প্রসঙ্গত অমলেন্দু বসুর বক্তব্য স্মরণীয় :

একই মহৎ শিল্পী একাধিক শিল্পীরূপে আত্মপ্রকাশ করেছেন, এ ঘটনার দৃষ্টান্ত প্রভূত নয়। মনে পড়ে মিকায়েলঞ্জেলো, দা ভিন্সি, ব্লেইক, দান্তে রোসেটির নাম—যাঁরা

একাধারে ছিলেন চিত্রশিল্পী ও কবি। হালে, পিকাসো নাটক লিখেছেন। দুই শিল্পে সব্যসাচিতা শিল্পচেতনার এক অদ্ভুত, হয়তো অবিশ্লেষণীয় রহস্য। যিনি এক শিল্পে মহৎ সৃষ্টি—যেমন অবনীন্দ্রনাথ—তিনি কোনো দুর্বীর প্রাণপ্রাচুর্যে আরেক শিল্পেরও আশ্রয় গ্রহণ করেন, শিল্পীর সৃজনীপ্রতিভার সঙ্গে দুটি শিল্পের পারস্পরিক সম্বন্ধ কী, তা নন্দনতত্ত্বের অজ্ঞাত রহস্য রয়ে যাবে যতদিন না এ-ধরনের প্রত্যেকটি মহৎ শিল্পীর রূপচেতনা প্রথমে পৃথকভাবে ও পরে সামগ্রিকভাবে আলোচিত হয়। এই বিশেষ দিক থেকে দেখলে ভারতীয় এমনকি প্রাচ্য শিল্পীদের মধ্যে অবনীন্দ্রনাথ অনন্য, তাঁর সৃজনশীল জীবনের প্রায় আগাগোড়াই তিনি তুলি ও লেখনীকে ব্যবহার করেছেন সমানভাবে। রবীন্দ্রনাথের কথা এখানে তোলা যায়, কিন্তু চিত্রশিল্পে রবীন্দ্রপ্রতিভার মাত্র ক্ষুদ্র অংশেরই বিকাশ, আর সে বিকাশও সংকীর্ণ কালে সীমাবদ্ধ অথচ অবনীন্দ্রনাথের রচনাকর্ম দীর্ঘকালব্যাপী, আর রচনায় যে তাঁর প্রতিভার এক অভিব্যঞ্জক দিক প্রতিভাত হয়েছে সে-বিষয়েও সন্দেহ সম্ভব নয়। অবনীন্দ্র-প্রতিভার মহিমাময় বিকাশ চিত্রশিল্পে সে-কথা সত্য, কিন্তু লেখনীর ব্যবহারে সে-প্রতিভা হ্রতমান হয়নি। রবীন্দ্রনাথকে যদি আমরা কেবল চিত্রশিল্পী বলেই জানতাম তাহলে সংস্কৃতির ইতিবৃত্তে তাঁর আসন খুব উজ্জ্বল হত না, পক্ষান্তরে সাহিত্যিক অবনীন্দ্রনাথ ও চিত্রশিল্পী অবনীন্দ্রনাথে ব্যবধান বিশাল কিন্তু দূস্তর নয়, সুদূর গদ্য থেকে হিসেবেও বাঙলার ইতিহাসে অবনীন্দ্রনাথের স্থান নিঃসংশয়^৪।

ছোটদের জন্য অবনীন্দ্রনাথের রচনার সংখ্যাও নিতান্ত কম নয়। এই ধারায় তাঁর প্রথম রচনা *শুকুন্তলা* প্রকাশিত হয়েছিল ১৮৯৫ সালে। রবীন্দ্রনাথের উৎসাহে ছোটদের জন্য লেখা শুরু করেছিলেন তিনি। রবীন্দ্রনাথ তাঁকে বলেছিলেন : ‘তুমি লেখো না, যেমন করে তুমি মুখে মুখে গল্প কর, তেমনি করেই লেখো’। সেই থেকে লেখা শুরু। লেখাটা তিনি লিখতেন খুবই সহজে। এই সহজতাই ছিল তাঁর শৈল্পিক ক্ষমতার উৎস। এ ক্ষমতা এমনিতেও কোথাও থেকে পড়ে পাননি, ঠাকুরবাড়ির সাংস্কৃতিক পরিমণ্ডলের মধ্যে থেকে তা তিনি অর্জন করেছিলেন মেধা ও মননের ক্রমাগত উৎকর্ষের মধ্য দিয়ে। প্রাচীন সংস্কৃতির মধ্যে জাতীয় বৈশিষ্ট্যাবলির অনুসন্ধান, স্বজাতির চৈতন্যের মধ্য থেকে সৌন্দর্যের আধারকে খুঁজে নেওয়া, লোকজ ঐতিহ্যের চূর্ণিত উপাদান দিয়ে পরিশীলিত শিল্প সৃষ্টির আকাঙ্ক্ষা, চিত্রকর ও লেখক হিসাবে কল্পনাপ্রতিভার প্রোজ্জ্বল পরিচয় তুলে ধরা—এইসব তো রেনেসাঁস মানুষেরই মধ্যে প্রাপ্তব্য।

অবনীন্দ্রনাথের শিশুসাহিত্য চচার একটা সুস্পষ্ট দর্শন ছিল। তিনি মনে করতেন শিশুসাহিত্যের দায়িত্ব শিক্ষাদান নয়, আনন্দদান। শিশুসাহিত্যের শিক্ষাদান প্রবণতাকে তিনি একেবারেই পছন্দ করতেন না। এ ব্যাপারে তাঁর বক্তব্য ছিল স্পষ্ট। তিনি বলেছেন,

এ-কালে যেন শখ নেই, শখ বলে কোনও পদার্থই নেই। এ-কালে সবকিছুকেই বলে “শিক্ষা”। সব জিনিসের সঙ্গে শিক্ষা জুড়ে দিয়েছে। ছেলেদের জন্য গল্প লিখবে তাতেও থাকবে শিক্ষার গন্ধ...এখন কেউ গল্প বলে না, বলতেই জানে না।

ছোটদের জন্য লেখা তাঁর বইগুলোকে কালানুক্রমিকভাবে সাজালে যে অবস্থা দাঁড়ায় তা নিম্নরূপ :

শকুন্তলা (১৮৯৫), ক্ষীরের পুতুল (১৮৯৬), রাজকাহিনী (প্রথম খণ্ড ১৯০৯), ভূত পতরীর দেশে (১৯১৫), নালক (১৯১৬), খাতাঙ্গির খাতা (১৯২১), বুড়ো আংলা (১৯৪১), রাজকাহিনী (দ্বিতীয় খণ্ড ১৯৪৪), আলোর ফুলকি (১৯৪৭), হংসনাম পালা (১৯৫১), লক্ষকর্ণ (১৯৫৪), একে তিন, তিনে এক (১৯৫৪), মারুতীর পুঁথি (১৯৫৬), রঙবেরঙ (১৯৫৮), চাঁইবুড়োর পুঁথি (১৯৫৯), কিশোর সঞ্চয়ন (১৯৬০)। এ ছাড়াও তাঁর অনেক লেখা পত্রপত্রিকার পাতায় এখনও ছড়িয়ে আছে যা এখনও অপ্রতিষ্ঠিত থাকা অসম্ভব নয়।

অবনীন্দ্রনাথ আধুনিক বাংলা শিশুসাহিত্যের অন্যতম পথিকৃৎ। শিশুসাহিত্যিক হিসেবে ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর (১৮২০-১৮৯১), রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর (১৮৬১-১৮৮১), উপেন্দ্রকিশোর রায়চৌধুরী (১৮৬৩-১৯১৫), সুকুমার রায় (১৮৮৭-১৯২৪) প্রমুখের পরে গুরুত্বের দিক থেকে অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুরের (১৮৭১-১৯৫১) নামই উচ্চারণ করতে হয় অন্যদের আগে। তাঁর গদ্যরচনাগুলো বিদেশি সাহিত্য, দেশীয় লোকসাহিত্য, চিরায়ত কাহিনী বা ইতিহাসের ঘটনা-কাঠামোকে অবলম্বন করে গড়ে উঠেছে। কিন্তু কথা বলার ভঙ্গিতে, কল্পনাপ্রতিভায়, বাংলার সাংস্কৃতিক প্রতিনিধিত্বে অবনীন্দ্রনাথের সে-সব রচনা এতটাই মৌলিক যে তাঁর আগে আর কোনও শিশুসাহিত্যিককে এমন স্বতন্ত্র ভূমিকায় পাওয়া যায়নি। এ কারণেই তাঁকে বাংলা শিশুসাহিত্যের ক্ষেত্রে এক বিশেষ ধারার পথিকৃ্তের আসন না দিয়ে পারা যায় না। সমালোচক যথার্থই বলেছেন অবনীন্দ্রনাথের সৃষ্টিশীলতার ‘সবচেয়ে মহৎ সম্পদ ছিল মুক্ত অন্তর্দৃষ্টি’। অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুরের বইগুলোর কোনটিরই ঘটনা বিন্যাস তাঁর নিজের উদ্ভাবন নয়। পুরাণ, লোককথা বা ইতিহাসের ঘটনাকে আশ্রয় করে গড়ে উঠেছে তাঁর এইসব রচনার আখ্যানভাগ। অথবা তিনি আশ্রয় নিয়েছেন কোনও বিদেশি সাহিত্যের। যেমন শকুন্তলা লেখা হয়েছে পৌরাণিক কাহিনীর ওপর ভিত্তি করে। ক্ষীরের পুতুল রচিত হয়েছে বাংলার লোকায়ত রূপকথাকে অবলম্বন করে। রাজকাহিনীর উৎস ইতিহাসের গল্প। নালক লিখেছিলেন ইতিহাস থেকে গৌতমবুদ্ধের জীবনের ঘটনা নিয়ে। বাঙালার পুঁথিসাহিত্যের নবীভবন হচ্ছে মারুতীর পুঁথি। লোককথা আর পুরাণের মিশ্রণে এক অভিনব রচনা চাঁইবুড়োর পুঁথি।

খাতাঙ্গির খাতা, বুড়ো আংলা, আলোর ফুলকি ও হানাবাড়ি—এই বইগুলো রচিত হয়েছে কোনও-না-কোনও বিদেশি সাহিত্যের প্রভাবে। গল্পের কাঠামোটুকু কিংবা শুধুমাত্র কাহিনীর ধারণাটুকুর ওপরই হয়তো মূলত আশ্রয় করা হয়েছে। তবে কোন বই কোন বিদেশি বইয়ের দ্বারা প্রাণিত তা অনুসন্ধান করলে দেখা যায় Jams Matheu Barre (১৮৬০-১৯০৭) রচিত Peterpan-এর ঘটনা সন্নিবেশনের সঙ্গে মিল রয়েছে খাতাঙ্গির খাতার, এর চেয়ে অতিরিক্ত মিল তেমন কিছু নেই। জাতীয় চেতনাকে মানুষ অনুভব করে তার সংস্কৃতির ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অনুষঙ্গগুলোর মধ্য দিয়ে। সেইসব অনুভূতির জায়গাগুলোর সম্পূর্ণটুকুই বাঙালি সংস্কৃতির অনুষঙ্গে ভরপুর। কোথাও ইয়োরোপীয় সংস্কৃতির সঙ্গে কোনও মিলই নেই খাতাঙ্গির খাতার। ঘটনাবিন্যাসের মিলটুকুও শেষপর্যন্ত হারিয়ে যায়। লোকজ শব্দে, প্রবাদে, ছড়ায়, গানের বৈচিত্র্যে খাতাঙ্গির খাতা

হয়ে উঠেছে বাঙালি সংস্কৃতির উপাদানে পূর্ণ সম্পূর্ণ নতুন এক সৃষ্টি।

আলোর ফুলকি বইটি অবনীন্দ্রনাথ রচনা করেছিলেন ফরাসি ভাষার লেখক Edmond Rostand (১৯৬৮-১৯১৮)-এর লেখা চার অঙ্কের কাব্যনাটক *Chanteceur* (১৯১০) অবলম্বনে। এটিকেও সরাসরি *Chanteceur*-এর অবলম্বনে সৃষ্ট রচনা বলা যাবে না। এর আবার একটি গল্পরূপ দিয়েছিলেন ফ্লোরেন্স ইয়েটসহান নামে একজন মহিলা। তাঁর দেয়া গল্পরূপটির নাম *The Story of Chanteceur*। বইটির চরিত্রগুলো কতগুলো পশুপাখিকে নিয়ে গড়ে উঠেছে। এখানেও মূল গল্পের সঙ্গে কেবল ঘটনাবিন্যাসেরই সামান্য মিল রয়েছে। চিত্রশিল্পী, সঙ্গীতশিল্পী, ভাষাশিল্পী অবনীন্দ্রনাথের প্রতিভা এখানে ভিন্ন এক রূপৈশ্বর্যে উদ্ভাসিত হয়ে উঠেছে। এর ভাষায় রঙ ও রেখায় যে রূপ সৃষ্টি হয়েছে তার পুরোটা অবনীন্দ্রনাথের একেবারেই নিজস্ব। তাই সৌন্দর্যরসের দিক থেকে *আলোর ফুলকি* হয়ে উঠেছে সম্পূর্ণ এক নতুন রচনা। সুতরাং নতুন রচনাকে অন্য এক রচনার রূপান্তর বললে রচনার সঠিক জাতটিকে শনাক্ত করা যায় না। অন্তত তার লেখাকে তো নয়ই।

এ-ছাড়া *হানাবাড়ির কারখানা* বইটি রচিত হয়েছে Thomas Ingoldsby ছদ্মনামে Richard Haris Barham (১৭৮৮—১৮৪৫)-এর লেখা *The Ingoldsby Legends of Mirvels*-এর ভাব অবলম্বনে। এখানে অবনীন্দ্রনাথের নিজস্বতা এতটাই ভাস্বর যে *The Ingoldsby Legends of Mirvels*-এর কথা আর মনেই পড়ে না।

বুড়ো আংলা গড়ে উঠেছে সেল্যা লাগেরলফ-এর 'জিন্মা': ২০ নভেম্বর ১৮৫৮—মৃত্যু: ১৬ মার্চ ১৯৪০] *The Wonderful Adventures of Nils* উপন্যাস অবলম্বনে। আমাদের বর্তমান রচনার লক্ষ্যবিন্দু যেহেতু *বুড়ো আংলা* বইটি এবং যেহেতু সেল্যা লাগেরলফ-এর সম্পর্কে আমাদের পাঠকেরা খুব একটা অবগত নন সেহেতু সেল্যা লাগেরলফ-এর কিছুটা পরিচয় দিয়ে নেয়া প্রাসঙ্গিক মনে করছি। সেল্যা লাগেরলফ প্রথম নোবেল পুরস্কার বিজয়ী সুইডিশ লেখক। শুধু তাই নয়, বিশ্বের প্রথম নোবেল বিজয়ী মহিলা লেখকও তিনি। তাঁর নোবেল পুরস্কার প্রাপ্তি আরও একটি কারণে বৈশিষ্ট্যপূর্ণ। সে-কারণটি হল তিনিই একমাত্র লেখক যাকে প্রধানত নোবেল পুরস্কারের জন্য বিবেচনা করা হয়েছিল তাঁর সৃষ্ট শিশুসাহিত্যের কারণে। সেল্যা লাগেরলফের প্রথম উপন্যাস *Gosta Berlings Saga* (১৮৯১)। ঐ সময়ে তাঁর জীবিকা ছিল স্কুল-শিক্ষকতা। সুইডেনের ভার্মল্যান্ড ছিল তাঁর জন্মস্থান। নিজের জীবনের সেখানকার ঘটনাবলি নিয়ে লেখা হয়েছিল উপন্যাসটি। পরের বইটির নাম *Jerusalem* (১৯০১-০২); এই বইটিই তাঁকে সুইডিশ ভাষার একজন শক্তিশালী ঔপন্যাসিক হিসাবে প্রতিষ্ঠা এনে দেয়। তাঁর ঔপন্যাসিক সত্তা বিশ্বব্যাপী পরিচিতি পায় তাঁর *The Wonderful Adventures of Nils* (১৯০৬-১৯০৭)-এর উপন্যাসের খণ্ডগুলো দিয়ে। এই উপন্যাসমালার ঘটনা পরম্পরা গড়ে উঠেছে ভূগোল ও ফ্যান্টাসির সমন্বয়ে। সেল্যা লাগেরলফ ছিলেন জন্মগত প্রতিভার অধিকারী একজন কাহিনী-লেখক। তাঁর সৃষ্টিকর্মের উৎসভূমি হচ্ছে তাঁর দেশের মধ্যযুগীয় লোকসাহিত্যের সুদীর্ঘ কাহিনী-পরম্পরা-সমৃদ্ধ বীরকাহিনীগুলো। ১৯০৯ সালে ৫২ বৎসর বয়সে তিনি

নোবেল পুরস্কারে ভূষিত হন। বিশ্বজুড়ে বিভিন্ন ভাষায় *The Wonderful Adventures of Nils* (১৯০৬-১৯০৭) বইটির অনুবাদ হয়েছে।

বুড়ো আংলায় সাম্প্রতিক সংস্করণগুলোতে সাধারণত মূল লেখক হিসাবে সেল্মা লাগেরলফের নাম উল্লেখ করা হয় না। এর ফলে কোনও কোনও পাঠককে এই সন্দেহ পোষণ করতেও দেখা গেছে যে অবনীন্দ্রনাথ তাঁর বুড়ো আংলায় কাহিনীসূত্রটি যথাযথভাবে উল্লেখ করেননি। বস্তুত এই সন্দেহ পোষণের কোনও অবকাশ নেই। কারণ বইটির প্রথম সংস্করণের প্রকাশকের নিবেদনে সেল্মা লাগেরলফের প্রতি যথাযথভাবে কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করা হয়েছে। তখনও অবনীন্দ্রনাথ জীবিত এবং তিনি নিজেই বইটির প্রচ্ছদও ঐকে দিয়েছিলেন। নিচে ঐ সংস্করণের প্রকাশকের নিবেদনটি উল্লেখ করা হল :

প্রকাশকের নিবেদন

পূজনীয় শ্রীঅবনীন্দ্রনাথ ঠাকুরের এই উপন্যাসটি আজ প্রায় বাইশ বছর আগে ধারাবাহিকভাবে ‘মৌচাকে’ প্রথম প্রকাশিত হয়। এই প্রথম তাকে বইয়ের আকার দেয়া হল। সুইডিশ লেখিকা Selima Lagerlof-এর *Adventures of Nils* নামক বইখানি পড়ে অবনীন্দ্রনাথ ‘বুড়ো আংলা’ লেখার প্রেরণা পেয়েছিলেন। কিন্তু ‘বুড়ো আংলা’ তর্জমা নয়—সম্পূর্ণ বাংলাদেশের বই। সুইডেনের Nils হচ্ছে আমতলির রিদয়। গণেশের শাপে যে বুড়ো আংলা হয়ে হাঁসের পিঠে কৈলাসে যাত্রা করে। কৈলাসের পথে চাঁদপুরের চর, সুরেশ্বর, কাশিয়ং, দার্জিলিং প্রভৃতি জায়গার নানা ঘটনায় ভরা বুড়ো আংলার ইতিহাস। এই ইতিহাস বাংলাদেশের ছেলেরা যেমন, বড়রা পড়েও তেমনি আনন্দ পাবে বলে আমাদের বিশ্বাস।

এই বইয়ের প্রচ্ছদপট সম্বন্ধে একটি কথা বলবার আছে। সুইডেনে বড়দিনের উৎসবের সময় একরকম খড়ের পুতুল দোকানে দোকানে পাওয়া যায়। Nils ও তার হাঁস খড়ের পুতুল হয়ে এক বড়দিনে সুইডেনে যখন বিক্রি হচ্ছিল, অবনীন্দ্রনাথের কাছে তাঁর এক ফরাসী বান্ধবী শ্রীমতী আন্দ্রে কার্পেলে, পাঠিয়ে দিয়েছিলেন। সেই পুতুল দেখে এই সুন্দর প্রচ্ছদপট আঁকা হয়েছে।

বইয়ের ভিতরের ছবিগুলি শ্রদ্ধেয় নন্দলাল বসু ঐকে আমাদের বিশেষ ধন্যবাদের পাত্র হয়েছেন।

কলিকাতা, শ্রাবণ ১৩৪৮

সুধীরচন্দ্র সরকার

The Wonderful Adventures of Nils-এ রয়েছে ২১টি অধ্যায়। সেগুলো নিম্নরূপ :

1. : THE BOY; THE ELF; 2. AKKA FROM KEBNEKAISE; EVENING; 3. THE WONDERFUL JOURNEY OF NILS; ON THE FARM; 4. GLIMMINGE CASTLE; BLACK RATS AND GRAY RATS; 5. THE GREAT CRANE DANCE ON; KULLABERG; 6. IN RAINY WEATHER; 7. THE STAIRWAY WITH THE THREE STEPS; 8. BY RONNEBY RIVER; 9. KARLSKRONA; 10. THE TRIP TO OLAND; 11. OLANDS SOUTHERN POINT; 12. THE BIG BUTTERFLY; 13. LITTLE KARL'S ISLAND; THE STORM; 14. TWO CITIES; THE CITY AT THE BOTTOM OF THE SEA; 15. THE LEGEND OF

SMALAND, 16 : THE CROWS; THE EARTHIEN CROCK, 17 : THE OLD PEASANT WOMAN, 18 : FROM TABERG TO HUSKVARNA, 19 : THE BIG BIRD LAKE; JARRO THE WILD DUCK, 20 : ULVASA-LADY : THE PROPHECY, 21 : THE HOMESPUN CLOTH^৮

কিন্তু অবনীন্দ্রনাথের বুড়ো আংলায় এতগুলো অধ্যায় নেই। তাঁর বইয়ে অধ্যায় সংখ্যা মাত্র সাতটি। সেগুলো নিম্নরূপ :

আমতলা, চলনবিল, চকা-নিকোবর, শৃগাল, টুং-সোন্নাটা-ঘুম, যোগী-গোফা, আসামী-বুরুঞ্জি।

অধ্যায়ের সংখ্যা সেল্লা লাগেরলফের *The Wonderful Adventures of Nils* বইটিতে বেশি থাকলেও বৈচিত্র্যে বুড়ো আংলা স্বাক্ষরতর। রিদয়ের দুষ্টমির বর্ণনায় অবনীন্দ্রনাথ যে কল্পনাশক্তির পরিচয় রেখেছেন তার তুলনা কিন্তু *The Wonderful Adventures of Nils*-এ নেই। সেল্লা লাগেরলফ খুব সংক্ষেপে নিলস-এর পরিচয় দিয়েছেন :

ONCE there was a boy : He was, let us say, something like fourteen years old; long and loose jointed and towheaded. He wasnt good for much, that boy. His chief delight was to eat and sleep, and after that he liked best to make mischief.

It was a Sunday morning and the boy's parents were getting ready for church. The boy, in his shirt sleeves, sat on the edge of the table thinking how lucky it was that both father and mother were going away so the coast would be clear for a couple of hours. "Good! Now I can take down pop's gun and fire off a shot, without anybody's meddling interference," he said of himself.^৯

এইটুকুই মাত্র তার দুষ্টমির পরিচয়। রিদয়ের দুষ্টমির বর্ণনাটুকু যেমন আলাদা তেমনই চমকপ্রদ। অবনীন্দ্রনাথের বর্ণনায় যে জীবন্ত গণেশঠাকুরের সৃষ্টি হয়েছে তা সেল্লা লাগেরলফ-এর নিলস-এ কোথায়? সেল্লা লাগেরলফের বর্ণনায় যে ELF-এর পরিচয় পাওয়া যায় তার সঙ্গে সাংস্কৃতিক স্বাতন্ত্র্যে গণেশঠাকুরের ব্যবধান রীতিমতো দূস্তর। এছাড়া *The Wonderful Adventure of Nils* -এর চড্ডুই পাখিটি নিলসকে 'Thumbietot' অভিধা দিয়েছিল, আর রিদয়ের পরিচয় সেখানে 'বুড়ো আংলা যক' হিসেবে। লোককথায় বুড়ো আঙলাকৃতি বিরল নয়। চার্লস পেরাইয়ের গল্পের *Hop O my thumb* এবং Hans Andersen-এর *Thumbelina* গল্পের বুড়ো আঙলাকৃতির চরিত্রের কথা দুনিয়ার কে না জানে।

নিলস-এর আকিয়ানের সঙ্গে বুড়ো আংলার হাঁসের মিল শুধু হাঁসের সঙ্গে হাঁসে। কিন্তু অবনীন্দ্রনাথের বর্ণনায় আছে আরও কত বিচিত্র পাখি ও প্রাণীর মিছিল। নবেন্দু সেন পাখি ও প্রাণীদের একটি তালিকা প্রণয়ন করেছেন। তালিকাটিতে দেখা যাচ্ছে ইঁদুর, চিংড়িমাছ, পাঁঠা, বোলতা, কুবোপাখি, গোখরো সাপ, মুরগি, পানকোড়ি, কাদাখোঁচা, বেআল, কপলে গাই, বুনোপাখি, সজারু, পিঁপড়ার ঠ্যাং, গুগলি, গরু,

গঙ্গাফড়িং, শামুক, সারস, পায়রা, টিয়া, ময়না, শালিক, বুনোহাঁস, পাতিহাঁস, বালু-হাঁস, টিকটিকি, ডালুক-ডালুকী, চকা, শেয়াল, কুকুর, প্যাঁচা, চামচিকে, গাঙশালিক, গো-শালিক, বাঁদর, দাঁড়কাক, কাক, রামছাগল, ভালুক, বক, লক্ষ্মীপ্যাঁচা, ময়ূর-ময়ূরী, কোকিল, শকুন, ফিঙে, খাটাশ, দোয়েল, নেউল, কাঠবেরালি, বুদিগাই ইত্যাদি প্রাণী ও পাখিদের পরিচয় এত নিখুঁত, বাস্তবসম্মত ও এমনই চমৎকার বিস্তারিতভাবে উঠে এসেছে যে এর কোনও কোনও অংশকে সমগ্র রচনা থেকে বিচ্ছিন্ন করে নিলে প্রাণীজগতের বৈজ্ঞানিক পরিচয় হিসাবেও তা হয়ে ওঠে অসাধারণ। কিন্তু তাই বলে প্রাণরসের কোনও ঘাটতি পড়ে না। বর্ণনাটুকু সমগ্র রচনার সঙ্গে প্রক্ষিপ্ত অবস্থায় আছে বলেও মনে হয় না। অবনীন্দ্রনাথের শ্রেষ্ঠত্বের এও এক দিক।

বুড়ো আংলা অবনীন্দ্রনাথের চেতনায় যে আশ্চর্যরূপে মৌলিক হয়ে উঠেছে তার কারণ তিনি তাঁর নিজের জীবনের অভিজ্ঞতাকে অসাধারণ এক কৌশলে কাজে লাগিয়েছেন। ১৯১৯-২০ সালে তিনি একবার দার্জিলিং ভ্রমণে গিয়েছিলেন। বুড়ো আংলার 'টুং-সোনাটা-ঘুম' অধ্যায়টিতে সেই অভিজ্ঞতাই প্রাণ পেয়েছে। কৈলাস পর্বত বা মানস-সরোবরের পথে হাঁসের সঙ্গে রিদয়ের ভ্রমণের যে বর্ণনা আছে তাতে বিধৃত হয়েছে বাংলার ভূগোল। সে যাত্রাপথের বর্ণনায় আছে বাংলার মানচিত্রের সাতনল, চন্দনপুর, আগরতলার রাজবাড়ি, মীর-কদম, নারায়ণগঞ্জ, ঢাকার নবাববাড়ি, পাবনা, রামপুর, বোয়ালিয়া, বোগরা, রাজশাহী, জলপাইগুড়ি, শিলিগুড়ি, এদিকে পূর্বে গৌহাটি, ডিব্রুগড়, শিলং, এদিকে ঘুম লেক, সিঞ্চল, কালিম্পং, লিবং সন্দকফু, কার্সিয়াং, টুং সোনাটা ইত্যাদি স্থানের ভৌগোলিক পরিচয়।

বাংলা শিশুসাহিত্যে বাংলার ভূগোলের এমন অভিনব বর্ণনা আর নেই। সেই বর্ণনায় ভূগোলের সঙ্গে আছে ভারতীয় হিন্দু-পুরাণের আকর্ষণীয় মিশেল। ফলে শিশু-কিশোর পাঠকদের ইতিহাস-পুরাণ চেতনা সমৃদ্ধ করবার জন্য এই বই হয়ে উঠেছে চমকপ্রদ। অভিনবত্বে ও স্বাতন্ত্র্যে নিলসের ভ্রমণের সঙ্গে এর ব্যবধান হয়ে উঠেছে সুদূর। অবনীন্দ্রনাথের ভাষা মুখের কথার মতো, তার অতিরিক্ত আছে শব্দের ব্যঞ্জনা। শব্দকে ব্যঞ্জিত করতে তিনি নানাধরনের কৌশল অবলম্বন করেছেন। প্রায়শই এমন অনেক শব্দ ব্যবহার করেছেন যা অভিধানেও নেই। কিন্তু ভাব বুঝতে পাঠকের কোনও অসুবিধা হয় না।

অবনীন্দ্রনাথের শিশুসাহিত্যে শিশুমনস্ক যে জগৎ সৃষ্টি হয় তার সৌন্দর্য অনেক সময় শিশুরা যথার্থভাবে অনুভব করতে পারে না। কারণ তাঁর সূক্ষ্ম পরিচর্যার মাধুর্যকে সম্পূর্ণভাবে অনুভব করতে হলে অনেক ক্ষেত্রে শিশুকালের স্মৃতি লালনকারী পরিণতমনস্ক রসিক মানুষ হয়ে ওঠা প্রয়োজন। এ কারণে তাঁকে বলা যায় শিশুমনোজগতশ্রয়ী পরিণতমনস্কের কথাসাহিত্যের রূপকার। অবনীন্দ্রনাথের শিশুসাহিত্যের সর্বজনীনতার সূত্রও বোধ হয় এটাই।

অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুরের এই চিরকালীন সৃষ্টিকর্মটি সর্বদা বাংলাদেশের সর্বস্তরের পাঠকদের কাছে সুলভ করে রাখবার লক্ষ্যে বিশ্বসাহিত্য কেন্দ্র বুড়ো আংলা বইটির একটি সংস্করণ প্রকাশ করেছে। 'আশ' করি বিশ্বসাহিত্য কেন্দ্রের এই উদ্দেশ্য সফল হবে।

নন্দনতত্ত্ব বিষয়ে অবনীন্দ্রনাথের মৌলিক দৃষ্টিভঙ্গির পরিচয় পাওয়া যায় বাংলাভাষায় রচিত *বাগেশ্বরী শিল্পী প্রবন্ধাবলী* বইয়ে। পাশ্চাত্য নন্দনতত্ত্ববিদদের চিরায়ত দৃষ্টিভঙ্গির সঙ্গে প্রাচীন ভারতীয় তথা প্রাচ্যীয় নন্দনতত্ত্বের আত্মীকরণ ও সমন্বয় সাধনের মধ্য দিয়ে এমন এক নিজস্ব দৃষ্টিভঙ্গিতে তিনি উপনীত হয়েছিলেন যা বিশ্বের নন্দনতত্ত্বের ইতিহাসে অনন্য ঘটনা হয়ে আছে। মননশীল সাহিত্যিক সত্তার সঙ্গে শিল্পীসত্তার এমন অসাধারণ মিথস্ক্রিয়া ঐ বইয়ে ঘটতে দেখা গেছে যার সঙ্গে বাংলাভাষায় তুলনীয় আর কিছুই নেই। কেবল বাংলাভাষার নন্দনতত্ত্বীয় রচনা হিসাবেই নয়, বিশ্বব্যাপী নন্দনতত্ত্ব বিষয়ক দার্শনিক রচনা হিসাবেও এ বইয়ের স্বাভাব্য সর্বমহলে স্বীকৃত। এ-ছাড়াও অবনীন্দ্রনাথের বাংলা রচনাগুলোর মধ্যে *বাংলার ব্রত* বইটিও ভিন্নধর্মী এক অনন্যসাধারণ গ্রন্থ। সুদীর্ঘকাল ধরে গ্রামবাংলায় নারীদের জীবননির্ভর যে লোকসংস্কৃতি এবং ঐতিহ্য গড়ে উঠেছিল তার আন্তরিক পরিচিতি রয়েছে এই বইয়ে। এই বইয়ের মধ্য দিয়ে বাংলার লোকশিল্পের আত্মাকে খুঁজে পেয়েছিলেন তিনি।

টীকা

১. *বাঙলার জাগরণ*, কজী আবদুল ওদুদ
২. *বাংলার রেনেসাঁস*, অনুদাশঙ্কর রায়
৩. *ভূমিকা, অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুরের শ্রেষ্ঠ প্রবন্ধাবলি*, সম্পাদনা : সৈয়দ মনজুরুল ইসলাম, দ্বিতীয় সংস্করণ : এপ্রিল ২০০৩
৪. 'লেখক অবনীন্দ্রনাথ', অমলেন্দু বসু, *চতুরঙ্গ*; সম্পাদক : হুমায়ুন কবির; চতুর্দশ বর্ষ, সংখ্যা ৪, মাঘ-চৈত্র, ১৩৫৯
৫. *বাংলা শিশুসাহিত্য : তথ্য তত্ত্ব রূপ ও বিশ্লেষণ*, নবেন্দু সেন, পুথিপত্র (ক্যালকাটা) প্রাইভেট লিমিটেড, কলকাতা, ১৯৯২
৬. *অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর ও শ্রীমতী রানী চন্দ লিখিত ঘরোয়া*
৭. ওয়েবসাইট মুকুল দে আর্কাইভ <http://www.chitrakleha.org/home.htm>
৮. <http://digital.library.upenn.edu/women/writers.html> A Celebration of Women Writers; *The Wonderful Adventures of Nils*; Selma Lagerlof, translated by Velma Swanston Howard; Doubleday, Page & Company, 1922, New York, USA.
৯. প্রাপ্ত

আহমাদ মায়হার



আমতলি

রিদয় বলে ছেলেটা নামেই হৃদয়, দয়ামায়া একটুও ছিল না। পাখির বাসায় ইঁদুর, গরুর গোয়ালে বোলতা, ইঁদুরের গর্তে জল, বোলতার বাসায় ছুঁচোবাজি, কাকের ছানা ধরে তার নাকে তার দিয়ে নথ পরিয়ে দেওয়া, কুকুরছানা বেরালছানার ল্যাজে কাঁকড়া ধরিয়ে দেওয়া, ঘুমন্ত গুরুমহাশয়ের টিকিতে বিচুটি লাগিয়ে আসা, বাবার চাদরে চোরকাঁটা বিধিয়ে রাখা, মায়ের ভাঁড়ারঘরে আমসির হাঁড়িতে আরশোলা ভরে দেওয়া—এমনি নানা উৎপাতে সে মানুষ, পশুপাখি, কীটপতঙ্গ, সবাইকে এমন জ্বালাতন করেছিল যে কেউ তাকে দু'চক্ষে দেখতে পারত না।

রিদয়ের মা-বাপ ছিল আমতলি গাঁয়ের প্রজা। দু'জনেই বুড়ো হয়েছে। রিদয় তাদের এক ছেলে, বয়স হল প্রায় বারো বছর; অথচ ছেলেটা না শিখলে লেখাপড়া, না শিখলে চাষবাসের কাজ, কেবল নষ্টামি করেই বেড়াতে লাগল। শেষে এমন হল যে তার বাপ-মা বাইরে হাটে-মাঠে যাবার সময় রিদয়কে ঘরে তালাবন্ধ কয়েদ করে রেখে যেত।

তখন শীত গিয়ে গরম পড়তে আরম্ভ হয়েছে। গাছে-গাছে আমের বোল আর কাঁচা আমের গুটি ধরেছে, পানাপুকুরের চারধার আমরুলী-শাকের সবুজ পাতায় ছেয়ে গিয়েছে; আলের ধারে-ধারে নতুন দুর্বো, আকন্দফুল সবে দেখা দিয়েছে; দূরে শাল-পিয়ালের তেঁতুল-তমালের বনে নতুন পাতা লেগেছে, আর দেখতে-দেখতে সমস্ত বন যেন পুরন্ত বাড়ন্ত হয়ে উঠছে; রোদ পাতায়-পাতায় কাঁচা-সোনার রঙ ধরিয়ে দিয়েছে; কুয়াশা আর মেঘ সরে গিয়ে মনে হচ্ছে যেন নীল আকাশের কপাট হঠাৎ খুলে গেছে আর আলো আর বাতাস ছুটে বেরিয়ে এসেছে—বাইরে। রিদয়ের কুলুপ-দেওয়া ঘরেও আজ দরমার ঝাঁপগুলোর ফাঁক দিয়ে রোদ উঁকি দিচ্ছে, বাতাস সরু সূরে বাঁশি দিয়ে

ঢুকছে। রিদয় কিন্তু এসব দেখছে না, শুনছেও না। সে চুপটি করে বসে নষ্টামির ফন্দি আঁটছে। কিন্তু গর্ত ফেলে ইঁদুর যে আজ নতুন বসন্তে শুকনো পাতায় ছাওয়া বাদামতলায় রোদ পোহাতে বেরিয়ে গেছে, বেরালছানাটা কাঁটালতলায় কাটবেরালির সঙ্গে ভাব করতে দৌড়েছে, গোয়ালঘরের কপ্লে গাই তার নেয়াল বাছুরটাকে নিয়ে ল্যাজ তুলে টেকির মতো লাফাতে-লাফাতে মাঠের দিকে দৌড় দিলে, ঘুলঘুলি দিয়ে সেটা রিদয় স্পষ্ট দেখলে।

ঘুলঘুলিটার বাইরে একটা ডালিম গাছ। ডালিমের উপরে ময়ূরের মতো রঙ একটা ছোট কী পাখি এসে শিস দিতে লাগল—রিদয়ের নাগালের ঠিক বাইরেটিতে বসে—“ও হিরিদয়! ও হিরিদয়।” রিদয় ঘুলঘুলির ফাঁক দিয়ে কাঁধ পর্যন্ত বাড়িয়ে দিয়েও মাঝের আঙুলের ডগাটি দিয়ে ডালিমটিকে ছোঁয়া ছাড়া আর কিছু করতে পারলে না। পাখি ডালিমের আর এক ডালে সরে বসে এমন খিটখিট খিটখিট করে হেসে উঠল যে রিদয় একেবারে লজ্জায় মাটি!

সে পাখিটাকে ছুড়ে মারবার জন্যে একটা কিছু খুঁজতে চারদিকে চাইছে, এমন সময় ঘরের কোণে মস্ত দুটো মরচে-পড়া তাল-আঁটা সুঁদুরি কাঠের উপরে পিতলের পাং আর পেরেকের নক্সা-কাটা বহুকালের সিন্দুকটার দিকে তার নজর পড়ল। যে-কুলুঙ্গিতে ইঁদুরে-চড়া লাল-মাটির গণেশ ছোট ঢোলক বাজাচ্ছেন, ঠিক তারি নিচে, ঘরের একদিকের দেয়াল জুড়ে সিন্দুকটা রয়েছে। এবড় যে মনে হচ্ছে যেন একটা রত্নবেদী!

এই সিন্দুকে কী যে আছে, তা রিদয় এ-পর্যন্ত দেখেনি; কিন্তু সে জানে তার ঠাকুরদাদা, তার দাদা, তার দাদা, তার আবার দাদার দাদা—এমনি কত পুরুষের বাসন, গয়না আর যা-কিছু ভালো দামী অশ্চর্য সামগ্রী এই সিন্দুকটায় জমা আছে। লক্ষ্মীপূজার দিন রিদয়ের মা ওই সিন্দুককে সিঁদুরের ফোঁটা, ধানের শিশ দিয়ে সাজিয়ে পূজো করে, চিপটিপ প্রণাম করে কতবার রিদয়কে বলেছেন—“দেখিস, সিন্দুকে গাঠেকাসনে, ওতে লক্ষ্মী আছেন!”

সিন্দুকটা রিদয়ের বাপ-মা এক-একদিন ভাদ্র মাসে ঠেলাঠেলি করে খুলে তার থেকে ভারী-ভারী রূপোর গয়না, বেনারসী শাড়ি, কাঁসার বাসন বার করে, ঝেড়ে পুঁছে যেখানকার যা গুছিয়ে রাখতেন; কিন্তু সিন্দুকের মধ্যেটায় যে কী, রিদয় এ-পর্যন্ত একদিনও দেখতে পেনে না। সে দু’পায়ের বুড়ো আঙুলে ভর দিয়ে খুব চেষ্টা করে মরচে-ধরা তালাদুটোর ফুটোয় চোখ দিতে পারত; তার উপর তার মাথা উঠত না। তালার ফুটোর মধ্যে অন্ধকারে একটা কী চকচক করছে দেখা যায়, কিন্তু সেটাকে আঙুল দিয়ে টেনে বার করবার অনেক চেষ্টা করেও রিদয় পেরে ওঠেনি। তালাদুটোকে যদি ভেঙে ফেলা যেত, তবে তালার মধ্যের জিনিস, সেইসঙ্গে সিন্দুকের মধ্যেটাও সে দেখে নিতে পারত। তালটা কী করে ভাঙা যায় ভাবতে-ভাবতে রিদয়ের হাই উঠতে লাগল, আর চোখও তুলে এল।

সেই সময় কুলুঙ্গি থেকে গণেশের ইঁদুরটা জ্যান্ত হয়ে বুপ করে সিন্দুকের ডালয় লাফিয়ে পড়ে ল্যাজ উঠিয়ে ছুটোছুটি আরম্ভ করলে। রিদয় স্পষ্ট দেখতে পেল গণেশ মোটা-পেটটি নিয়ে গুঁড় দেলাতে-দেলাতে সিংহাসন থেকে নেমে কুলুঙ্গির ধারে পা

ঝুলিয়ে বসে ঢোল বাজাতে লাগলেন আর ইঁদুরটা তালে-তালে ল্যাজ নেড়ে গলার ঘুঙুরের ঝুমঝুম শব্দ করে করে নাচতে থাকল।

রিদয় ইঁদুর অনেক দেখেছে, গণেশের গল্পও অনেক শুনেছে, কিন্তু জ্যান্ত গণেশ সে কখনও দেখেনি! এই বুড়ো-আঙুল যতটুকু, গণেশটি ঠিক ততটুকু! পেটটি বিলিতি-বেগুনের মতো রাঙা চিকচিকে, মাথাটি শাদা, গুঁড়টি ছোট একটি কেঁচোর মতো পেটের উপর গুটিয়ে রয়েছে; কানদুটি যেন ছোট দুখানি কুলো, তাতে সোনার মাকড়ি দুলছে; গলায় একগাছি রূপোর তারের পৈতে ঝোলানো; পরনে লাল-পেড়ে পাঁচ-আঙুল একটি হলদে ধুতি, গলায় তার চেয়ে ছোট একখানি কোঁচানো চাদর; মোটা-সোটা এতটুকু দুটি পায়ে আংটির মতো ছোট-ছোট ঘুঙুর, গোল গাল চারটি হাতে বালা, বাজু, তাড়; গলা থেকে লাল সুতোয় বাঁধা ছিটমোড়া ছোট্টো ঢোলকটি ঝুলছে। কথকঠাকুর সমস্কৃতে গণেশ-বন্দনা করতেন :

গণেশায় নমঃ নমঃ আদি ব্রহ্ম নিরুপম পরম পুরুষ পরাংপর।

খর্ব স্থলকলেবর গজমুখ লম্বোদর মহাযোগী পরমসুন্দর ॥

হেলে শুণ্ড বাড়াইয়া সংসারসমুদ্র পিয়া খেলাছিল করহ প্রলয়।

ফুৎকারে করিয়া বৃষ্টি পুনঃ কর বিশ্বসৃষ্টি ভালো খেলা খেল দয়াময় ॥

এই বন্দনা শুনে সে গণেশকে মনে করেছিল না-জানি কতই বড়! একেবারে পদভরে মেদিনী কম্পমান! মেঘ গর্জনের মতো ঢোল বাজিয়ে—তালগাছের গুঁড়ির মতো মোটা গুঁড় দোলাতে-দোলাতে, কানের বাতাসে ঝড় বইয়ে গণেশ নেচে বেড়াচ্ছেন! আসলে গণেশ যে গণেশ-দাদা পেটটি নাদা, গলায় একটি ঢোলক বাঁধা—পিটুলির পুতুলটির মতো একেবারে ছোট, ঢোলকটি মাদুলীর চেয়ে বড় নয়, আর তিনি নিজে তাঁর ইঁদুরটির চেয়ে একটু ছোট, এটা রিদয় এই প্রথম দেখলে।

রিদয়ের এক-খাঁচা বিলিতি-ইঁদুর ছিল। না খেতে পেয়ে সেগুলো মরেছে! এখন গণেশের সঙ্গে ইঁদুরটিকে ধরবার ফন্দি সে মনে-মনে আঁটতে লাগল। ঘরের মধ্যে নানা জিনিস ছিল, কোনটা গণেশ-ধরার কাজে লাগে, তাই রিদয় দেখতে লাগল। তার এমন সাহস ছিল না যে গণেশকে গিয়ে চেপে ধরে—যদি দাঁত ফুটিয়ে দেয়! বাটনা-বাটা নোড়াটা হাতের কাছে পড়েছিল কিন্তু সেটা ছুড়ে মারলে গণেশ এত ছোট যে চেপেট যাবার ভয় আছে; পিতলের বোকনোটা চাপা দেওয়া যায় কিন্তু গণেশকে তা থেকে বার করে খাঁচায় পোরা মুশকিল; আটকাঠিটা পেলে ঠিক হত কিন্তু রিদয়ের বাবা সেটা চালের মটকায় তুলে রেখেছেন; লক্ষ্মীর ঝাঁপিটা কাজে লাগতে পারে কিন্তু গণেশ তো তার মধ্যে ইচ্ছে করে না সঁধোলে জোর করে ঢোকানো যায় না! চারদিক দেখতে-দেখতে কোণে চৈসানো চিংড়ি-মাছ ধরা কুঁড়োজালিটার দিকে রিদয়ের চোখ পড়ল।

তখন গণেশ সিন্দুকের উপরে নেমে, উপরের দু'হাতে তুড়ি দিয়ে, নিচের দু'হাতে ঢোলে চাঁটি মেরে, ইঁদুরের সঙ্গে-সঙ্গে ঢোল বাজিয়ে নৃত্য করছেন। রিদয় সাঁ করে কুঁড়োজালি যেমন চাপা দেওয়া অমনি গণেশ তার মধ্যে আটকা পড়ে যাওয়া!

ইঁদুর টপ করে লাফিয়ে কুলুঙ্গির উপরে একেবারে সিংহাসনের তলায় যেমন

টুকেছে, অমনি মাটির সিংহাসন দুম করে উল্টে চুরমার হয়ে গেল। ইঁদুর ভয় পেয়ে ল্যাজ তুলে কোথায় যে দৌড় দিলে তার ঠিক নেই।

গণেশ জালের মধ্যে মাথা নিচু করে দু'পা আকাশে ছুড়তে লাগলেন আর বলতে থাকলেন—“ছেড়ে দে, ছেড়ে দে বলছি!” কিন্তু দাঁতে শুঁড়ে ঢোলকে জালে এমন জড়িয়ে গেছেন যে গণেশের নড়বার সাধ্য নেই। তালের নুটির মতো জালের মধ্যে আটকা পড়ে গণেশ হাঁপাতে-হাঁপাতে মা-দুর্গাকে স্মরণ করতে লাগলেন; সেই সময় ইঁদুর অন্ধকারে আস্তে-আস্তে এসে কটাস করে রিদয়ের পায়ে এমনি দাঁত বসিয়ে দিলে যে যন্ত্রণায় সে ছটফট করতে লাগল।

রিদয় জাল ফেলে পায়ে হাত বুলোচ্ছে, এমন সময় গণেশ শুঁড়ে দাঁতে জাল কেটে বেরিয়ে নিজমূর্তি ধরলেন :

মার-মার ঘের-ঘার হান-হান হাঁকিছে,
হপ-হপ দুপ-দাপ আশ-পাশ ঝাঁকিছে!
অট্ট-অট্ট ঘট-ঘট ঘোর হাস লাগিছে,
হম-হাম খুম-খাম ভীম শব্দ ভাষিছে!
উর্ধ্বে বাহু যেন রাহু চন্দ্র সূর্য পাড়িছে,
লক্ষ-লক্ষ ভূমিকম্প নাগ-দন্ত লাড়িছে!
পাদ-ঘায় ঠায়-ঠায় জোড়া লাথি ছুটিছে,
খণ্ড-খণ্ড লণ্ড-ভণ্ড বিক্ষুব্ধ উঠিছে!
হুল-খুল কুল-কুল ব্রহ্মডিম্ব ফুটিছে,
ভ্রমশেষ হৈল দেশ রেণু-রেণু উড়িছে!

দেখতে-দেখতে চালে গিয়ে গণেশের মাথা ঠেকল। তিনি দাঁত কড়-মড় করে বললেন—“এতবড় আশ্রয়!—ব্রাহ্মণ আমি, আমার গায়ে চিংড়ি মাছের জাল ছোঁয়ানো! যেমন ছোটলোক তুই, তেমনি ছোট বুড়ো-আংলা যক্ হয়ে থাক!” বলেই গণেশ শুঁড়ের ঝাপটায় রিদয়কে সাত-হাত দূরে ঠেলে ফেলে ভুস করে চণ্ডীমণ্ডপের চাল ফুঁড়ে অন্তর্ধান হলেন।

রিদয় একদিকের দেয়ালে মাথা ঠুকে ঘুরে পড়ল আর দেখতে-দেখতে তার কপাল ফুলে বেল হল। সে বিষম ভয় পেয়ে তাড়াতাড়ি মাথায় হাত বুলোতে-বুলোতে উঠে দেখলে—কেউ কোথায় নেই, মঝোতে ভাঙা-গণেশের একরাশ রাঙা মাটি ছড়ানো রয়েছে! গণেশ ভেঙেছে দেখলে বাবা আর তাকে আস্ত রাখবেন না ভেবে রিদয় মাটিগুলো কুড়িয়ে সিন্দুকের পাশে লুকিয়ে রাখতে গিয়ে দেখে সিন্দুকটা এত বড় হয়ে গেছে আর সে এত ছোট হয়ে গেছে যে অনায়াসে সিন্দুকের তলায় সে গলে গেল! মাথার উপর কড়িকাঠের মতো সিন্দুকের তলাকার তক্তাগুলো, তার থেকে আরশোলা ঝুলছে। একটা আরশোলা শুঁড় উঁচিয়ে তাকে তেড়ে এল। রিদয় ভাবছে তখনো সে বড়ই আছে; যেমন আরশোলাকে মারতে যাবে, অমনি সেটা উড়ে এসে এক ডানার ঝাপটায় তাতে উল্টে ফেলে বললে—“ফের চালাকি করবি তো কামড়ে দেব! এখন

তুই ছোট হয়ে গেছিস মনে নেই? আগের মতো আর বাহাদুরি চলবে না বলছি!”

রিদয় ভয়ে তাড়াতাড়ি সিন্দুকের তলা থেকে বেরিয়ে নিজের তক্তায় উঠতে গিয়ে দেখে তক্তার খুরোটা তার মাথার থেকে অনেক উঁচুতে উঠে গেছে। তখন রিদয় বুঝলে গণেশের শাপে সে বুড়ো-আঙুলের মতো ভয়ানক ছোট হয়ে একেবারে বুড়ো-আংলা হয়ে পড়েছে! রিদয় প্রথমটা ভাবলে সে স্বপন দেখছে, কিন্তু তিন-চারবার চোখ বুজে, খুলে, নিজের গায়ে চিমটি কেটে যখন সে বুঝলে সব সত্যি—একটুও স্বপ্ন নয়, তখন রিদয় মাথায় হাত দিয়ে বসে পড়ে ভাবতে লাগল—কী করা যায় এখন?

গণেশ তো শাপ দিয়ে গেলেন—যক্ হয়ে থাক! কিন্তু যক্ বলে কাকে? এই বুড়ো আঙুলটির মতো ছোট থাকা? না, আর-কিছু ভয়ানক হবে?

অন্য ছেলে হলে ভয়ে-ভাবনায় একেবারে হতবুদ্ধি হয়ে বসে থাকত, কিন্তু রিদয় ছিল নির্ভয়। সে যক্ কাকে বলে কারো কাছে জানবার জন্যে এদিক-ওদিক চাইতে লাগল।

ছোট হবার সঙ্গে রিদয়ের দুষ্টবুদ্ধিও ছোট হয়ে গেছে, কাজেই সে মাটিতে মাথা ঠুকে গণেশকে মনে-মনে প্রণাম করতে লাগল আর বলতে থাকল—“ঠাকুর, এবারকার মতো মাফ করো। আর আমি এমন কাজ করব না। ঘাট হয়েছে। যক্ কাকে বলে বলে দাও।” কিন্তু গণেশ কোনো সাড়া-শব্দ দিলেন না।

গণেশের ইঁদুর রিদয়ের উপর ভারি চটেছিল, এতক্ষণ তার ভয়ে সে মটকা থেকে নামতে পারেনি, রিদয় ছোট আর ভালোমানুষ হয়ে গেছে দেখে সে গৌফ-ফুলিয়ে কাছে এসে বললে—“কেমন! যেমন কর্ম তেমনি ফল! এখন থাকগে পাতালে যক্ হয়ে অন্ধকারে বসে! আর আলোতেও আসতে পাবে না, বাপ-মাকেও দেখা হবে না।”

বাপ-মায়ের উপর রিদয়ের বড়-একটা টান ছিল না, কিন্তু পাতালে চূপটি করে থাকা কিছুতেই সে পারবে না। সে ইঁদুরকে শুধোলে—“ভাই, যক্ কীরকম?”

ইঁদুর উত্তর করলে—“সেকালে লোকে ছেলে-পিলে না হলে বুড়ো হয়ে মরবার সময় যক্ বসাত—জোক বসানো নয়, যক্ বসানো! আগে সব বাড়িতে একটা করে চোর-কুটরী ছিল, ডাকাত পড়লে সেই ঘরে মেয়ে-ছেলেদের নিয়ে গেরস্তরা গিয়ে লুকিয়ে থাকত। এই চোর-কুটরীর নিচে অন্ধকার সিঁড়ি দিয়ে নেমে পাতালের মধ্যে একটা কুয়ার মতো অন্ধকার জায়গায় লোকে কখনো-কখনো যক্ বসাত। ছেলেধরা দিয়ে খুঁজে খুঁজে তোমার মতো নিডর দুষ্ট ছেলে তারা ধরে এনে, তাকে ভালো কাপড়, সিঁদুরের টিপ দিয়ে বলির পাঁঠা যেমন করে সাজায় তেমনি করে সেই অন্ধকার পাতাল-পুরীতে এক থালা খাবার, এক ভাঁড় জল দিয়ে, নিজে না খেয়ে, দানধ্যান না করে যেসব ধন-দৌলত জমা করেছে তারই কাছে বসিয়ে দিয়ে, একটি পিদিম জ্বালিয়ে তারই নিচে একটা গোখরো সাপের হাঁড়ি রেখে বলত—‘এই যকের ধন তুমি আগলে থাকো। যে এখানে ঢুকবে, তাকে যেন সাপে খায়।’ হিং টিং ফট এই মন্তর বলে বুড়ো গর্তের মুখে একটা মস্ত পাথর চাপা দিয়ে বেরিয়ে আসত।”

রিদয় বিস্ময় ভর পেয়ে বলে উঠল—“তারপর?”

“তারপর আর কী? দু’চার দিনে থালার খাবার, ভাঁড়ের জল ফুরিয়ে গেলে ছেলেটা রোগা হয়ে শুকিয়ে-শুকিয়ে মরে যেত! পিদিমটাও তেল ফুরিয়ে নিভে গেলে অন্ধকারে

ডাঁশ-পোকা সব বেরিয়ে তার গায়ের মাংস ছিঁড়ে খেয়ে ফেলত। সেই সময় গোখরো সাপ ডাঁশের লোভে হাঁড়ি ভেঙে বেরিয়ে এসে মরা-ছেলের ফাঁপা মাথার খুলিটার মধ্যে বাসা বেঁধে ধন-দৌলত আগলাত। আর ছেলেটা যক্ হয়ে সেই অন্ধকারে খিদের জ্বালায় কেবলই কাঁদত আর...”

এই পর্যন্ত শুনেই রিদয়ের এমন ভয় হল যে সে ভাবলে যেন তার চারদিকে অন্ধকারে ডাঁশ-পোকাগুলো বেরিয়েছে, আর যেন লক্ষ্মীর কাঁপিটার মধ্যে থেকে গোখরো সাপ ফোঁসলাচ্ছে!

ইদুর রিদয়কে ভয় দেখিয়ে বললে—“শুনলে তো? এখন ছেলে-ধরা তোমাকে দেখেছে কি ধরে যকে বসিয়েছে! পালাও এই বেলা, মানুষের কাছে আর এগিয়ো না, ধরা পড়লে মুশকিল!” বলেই ইদুর কুলুঙ্গিতে উঠে বসল।

রিদয় কেঁদে বললে—“আর কি আমি মানুষ হব না?”

ইদুর হেসে বললে—“গণেশঠাকুরের দয়া না হলে আর মানুষ হওয়া হচ্ছে না।”

রিদয় আরো ভয় পেয়ে শোধালে—“গণেশ গেলেন কোথা? তাঁর দেখা পেলে যে আমি পায়ে ধরে মাপ চাই। এবার যদি তিনি আমায় মানুষ করে দেন, তবে নিশ্চয় বলছি কোনো দিন সন্দেহ চুরি করে খাব না, খেয়ে আর মিছে কথা বলব না, পড়বার সময় আর মিছি-মিছি মাথা ধরবে না, তেষ্টাও পাবে না; গুরুমশায়কে দেখে আর হাসব না, বাপ-মায়ের কথা শুনব; রোজ তোমার চন্নামেত্তো খাব, একশো দুর্গানাম লিখব। এবার থেকে বামুনের দোকানের পাঁউরুটি আর হাঁসের ডিম ছাড়া অন্য কিছু ছুঁই তো গঙ্গামান করব।”

এমনি ভালোমানুষ হবার যত কিছু প্রতিজ্ঞা কোনোটা করতে রিদয় বাকি রাখলে না! কিন্তু এতেও গণেশ খুশি হয়ে তাকে মানুষ করে দিতে ঘরে এলেন না দেখে বাইরেটায় সে একবার গণেশকে খুঁজে দেখবার মতলবে দরজার ফাঁক দিয়ে গলে বেরুল।

পাড়াগাঁয়ের সব বাড়ি যেমন, রিদয়ের বাড়িও তেমনি ছিল—“পুবে হাঁস, পশ্চিমে বাঁশ, উত্তর বেড়ে, দক্ষিণ ছেড়ে।” ঘরের দাওয়া থেকে নেমেই একহাত অন্তর একখানা চৌকো টালি পাতা রয়েছে। এমনি নানা দিকে সোজা-বাঁকা, ভাঙা-আস্ত টালিগুলো মাটির উপরে পেতে রাস্তা হয়েছে—পুকুর-পাড়ে যাবার, গোয়ালে যাবার, হেঁসেলে ঢোকবার। বর্ষার সময় যখন জলে সব ডুবে যায়, তখন এই টালির উপর পা ফেলে চলে যাও, একটুও পায়ে জল লাগবে না। আবার যেখানে জল যাবার নালা, তার উপরে এপার-ওপার করবার জন্যে দু’টুকরো নারকোল গাছের গুঁড়ি পাটাতন করে পাতা, পুলের মতো তার উপর দিয়ে সোজা চলে যাও।

রিদয় এখনো থেকে-থেকে ভুলে যাচ্ছে যে সে আর বড় নেই, ঘরের দাওয়া থেকে আগেকার মতো লাফিয়ে নামতে গেছে, আর অমনি চিৎপাত! মনে হল যেন একতলার উপর থেকে পড়েছে! ভাগ্যি এক-আঁটি খড়ের উপরে পড়েছিল, না হলে রিদয় সেদিন টের পেতেন বেরালছানাকে দাওয়া থেকে হঠাৎ ঠেলে ফেললে, কতটা তার লাগে।

গোটাকতক ছাতারে-পাখি বাঁশঝাড়ের তলায় শুকনো পাতা উল্টে-উল্টে ফড়িং খেয়ে বেড়াচ্ছিল, বুড়ো-আংলা ডিগবাজি খেয়ে পড়ে যেতে দেখে বলে উঠল—“ছি-

ছি! ও হিরিদয় হল কী? ছি-ছি।” অমনি কুবোপাখি বাঁশের ডগা থেকে বলে উঠল—
“দুয়ো, বেশ হয়েছে, দুয়ো!” আর অমনি চারদিক থেকে হাঁস, হাঁসের ছানা, মুরগি,
মুরগির ছানা, কাদাখোঁচা, পানকৌড়ি এমন সব ঘরের আশপাশের পোষা-পাখি,
বুনোপাখি, মজা দেখতে ছুটে এসে রিদয়কে ঘিরে চোঁচাতে লাগল, হাসতে থাকল—
“ছি-ছি, ছ্যা-ছ্যা, দেখ-দেখ! ঠিক হয়েছে! বেশ হয়েছে! বুড়ো-বুড়ো-বুড়ো-বুড়ো-
আংলা। ও হিরিদয় হল কী?” কুঁকড়ো ঘাড় ফুলিয়ে বললে—“কী হল?” চড়াই ল্যাজ
নেড়ে বললে—“এ কী, যক্ নাকি?”

রিদয় যখন মানুষ ছিল, তখন পাখিদের কিম্বা জানোয়ারদের কথা একটুও বুঝত
না, কিন্তু যক্ হয়ে পরিষ্কার বুঝতে পারছে।

কুঁকড়ো বলছে—“কেমন, আর আমার ঝুঁটি ধরে টানবে।”

মুরগি আমনি বললে—“যেমন দুষ্টমি, তেমনি শান্তি হয়েছে! চুরি করো আমার
ছানা! এইবার এক ঠোকরে মাথা ফুটো করে দেব।” বলে মুরগিটা রিদয়কে ঠোঁট
বাড়িয়ে তেড়ে গেল।

পাতি-হাঁস অমনি বলে উঠল—“থাক, থাক, এবার মাপ করো!”

কুঁকড়ো মাথা নেড়ে বললে—“তোর এমন দশা করলে কে?”

রাজহাঁস অমনি নাক-তুলে শুধোলে—“ঐ্যাঃ?”

রিদয় পাখিদের কথা বুঝতে পারছে জেনে মনে-মনে খুশি হল বটে, কিন্তু মুরগি,
হাঁস—যারা একদিন তাকে দেখলে ভয়ে দৌড় দিত, এখন তারা মুখের সামনে দাঁড়িয়ে
হাসবে, এটা রিদয় সহিতে না পেরে, এক ঢিল ছুড়ে ধমকে উঠল—“প্যাক-প্যাক
করিসনে বলছি—পালা!”

রিদয় যে এখন এতটুকু হয়ে গেছে! পাখিরা তাকে ভয় করবে কেন? সব পাখি
একসঙ্গে খ্যাক-খ্যাক করে তেড়ে উঠল—“দূর হ, দূর হ! পালা!” ধাড়ি-বাচ্ছা সব পাখি
চারদিকে ঘিরে এমনি চোঁচামেচি করতে থাকল যে রিদয়ের কানে তালা ধরবার যোগাড়!
বেচারা কোথায় পালাবে ঠিক পাচ্ছে না, এমন সময় আঁস্তাকুড় থেকে ছাই-পাঁশ মেখে
বাঘের মতো ডোরা-টানা এক বেরাল, চান সেরে সেইদিকে আসতে লাগল—“কিও-
কিও” বলতে-বলতে! বেরালের সাড়া পেয়েই পাখিরা যেন কত ভালোমানুষের মতো,
মাটিতে যেন পোকাই খুঁজছে, এই ভাবে পায়ে-পায়ে রিদয়ের কাছ থেকে সরে পড়ল।

বেরাল মস্তীর বাহন, ইঁদুরের সঙ্গে গণেশ কোথায় লুকিয়ে আছেন নিশ্চয় সে জানে,
ভেবে রিদয় দৌড়ে গিয়ে বেরালকে গণেশের কথা শুধোলে। বেরাল অমনি ল্যাজ
গুড়িয়ে, সামনে দুই থাবা রেখে, গম্ভীর হয়ে বসে চোখ পিট-পিট করতে-করতে যেন
রিদয়ের কথা শুনেও শুনলে না—এইভাবে পায়ের আঙুল থেকে ল্যাজের ডগাটি পর্যন্ত
রোদে বসে চেটে-চেটে সাফ করতে লাগল। রিদয় একবার পাখিদের রাগিয়ে জন্ম
হয়েছে; সে বেরালকে খুব মিষ্টি করে আবার শুধোলে—“বলো না মেনি, গণেশ-ঠাকুর
কোনদিকে গেলেন?”

মেনি বললে—“গণেশঠাকুর কাছেই এক-জায়গায় আছেন, কিন্তু তোমাকে
বলছিনে বাপু!”

রিদয় আরো নরম হয়ে বলছে—“লক্ষ্মীটি, বলো, কোথায়? তিনি আমার কী দশা করেছেন দেখছ!”

বেরাল যেন অবাক হয়ে সবুজ চোখ-দুটো বড় করে রিদয়ের দিকে চাইলে; তারপর গৌফ ফুলিয়ে ফাঁচ করে দাঁত-মুখ খিঁচিয়ে বললে—“তোমায় দেখে দুঃখ হবে না? আমার ল্যাঞ্জে কত কাঁকড়া ধরিয়েছ তুমি! তোমাকে গণেশের খবর দেব না তো দেব কাকে? হু!” বলে বেরাল একবার গা-ঝাড়া দিলে।

রিদয় আর রাগ সামলাতে না পেরে “দেখবি ল্যাজ ধরে টানি কি না” বলে যেমন বেরালের দিকে এগিয়ে গেছে অমনি বেরাল বাঘের মতো ফুলে উঠল! তার রোঁয়াগুলো সজারুর কাঁটার মতো সোজা হয়ে উঠেছে, পিঠ ধনুকের মতো বঁকেছে। ল্যাজ ফুলিয়ে কানদুটো সটান করে কটমট করে চেয়ে বেরাল নখে মাটি আঁচড়াতে লাগল।

রিদয় বেরাল দেখে ভয় পাবার ছেলে নয়। যেমন সে তেড়ে বেরালকে ধরতে গেছে, অমনি বেরাল ফাঁচ করে হেঁচে এক থাপ্পড়ে রিদয়কে উল্টে ফেলে তার বুকে দুই পা দিয়ে চেপে বসে দাঁত-খিঁচিয়ে বললে—“আবার বজ্জাতি! এখনো বুঝি শিক্ষা হয়নি? বুড়ো-অ্যাংলা কোথাকার! জানিস, এখন নেংটি ইঁদুরের মতো তাকে ঘাড়-মটকে খেয়ে ফেলতে পারি!”

বেয়াল যে ইচ্ছে করলে এখনি নখ দিয়ে তার বুকটা চিরে, দাঁত দিয়ে তার কান দুটি কেটে নিতে পারে, তা বাঘের মতো বেরালের নিজ-মূর্তি দেখে রিদয় আজ বেশ বুঝলে। সে নিজে যে আজ কত ছোট হয়ে গেছে, তাই ভেবে রিদয়ের চোখে জল এল। চোখে জল দেখে বেরাল রিদয়কে ছেড়ে দিয়ে বললে—“ব্যাস! আজ এইটুকু শাস্তি দিয়ে ছেড়ে দিলুম—তোর মায়ের অনেক নিমক খেয়েছি! আজ দেখিয়ে দিলুম তোর জোর বেশি, না আমার জোর বেশি! আর কখনো পশুপাখির সঙ্গে লাগতে যাসনে—যাঃ!” বাঘের মাসি বেরাল চারপায়ে দাঁড়িয়ে একবার গা-ঝাড়া দিয়ে ল্যাজটা বুড়ো আঙুলের মতো দুবার রিদয়ের মুখের সামনে নেড়ে আবার ভালোমানুষটির মতো আন্তে-আন্তে হেঁসেলের দিকে চলে গেল। রিদয় লজ্জায় মাথা হেঁট করে আন্তে-আন্তে গোয়াল-বাড়িতে গণেশকে খুঁজতে চলল।

ধলা গাই, কপ্লে গাই, কালো গাই—তিন গাই গোয়ালে বাঁধা। রিদয় কাছে আসতেই এই তিন গাই এমনি দাপাদাপি হামাহামি শুরু করে দিলে যে মনে হল তিরিশটা ষাঁড় সেখানে ছোটোপাটি লাগিয়েছে! রিদয় শুনলে ধলা বলছে—“হবে না? মাথার উপর ধর্ম আছেন। হুঁ হুঁ!”

কপ্লে গাই বললে—“আমার কানে বোলতা ছাড়া? হুঁ হুঁ!”

এই সময় রিদয়কে গোয়ালের দুয়ারে দেখে কালো গাই লাথি ছুড়ে বললে—“খবরদার! দেখেছ, এক লাথিতে মাথার খুলি ফাটিয়ে দেব।”

ধলা বললে—“আয় না, এইবার একবার শিং ধরে নাড়া দিবি!”

কপ্লে বললে—“একবার বোলতা নিয়ে কাছে এসো না, মজাটা টের পাইয়ে দিচ্ছি!”

কালো—সে সবচেয়ে বুড়ি, সবচেয়ে জোরালো গাই, সে বললে—“বড় যে আমাকে টিল মারা হত। আবার সেদিন আমাকে জুতো ছুড়ে মারা হয়েছিল! আয়,

একবার আমার খুরের ঘা খেয়ে যা! রোজ দুখ-দুইবার সময় দুধের কেঁড়ে উল্টে দিয়ে মাকে নাস্তানাবুদ করে তবে ছাড়তিস। আহা, এমন দিন নেই যে তিনি তোর জন্যে না কেঁদেছেন। আয়, আজ একবার তার শোধ তুলব। বাপের বাপ, কী দুষ্ট ছেলে গো! গণেশঠাকুর—তাঁর সঙ্গে লাগা!”

রিদয় গরুদের সঙ্গে ভাব করে বলতে চাইছিল—যদি তারা গণেশঠাকুরকে দেখিয়ে দেয়, তবে কোনোদিন আর সে কারো কাছে কোনো অপরাধ করবে না, কিন্তু গাই তিনটে এমনি ঝাঁপাঝাঁপি আরম্ভ করলে যে রিদয়ের ভয় হল যদি দড়ি ছিঁড়ে এরা বেরোয়, তবে আর রক্ষে রাখবে না। সে আন্তে-আন্তে গোয়াল ছেড়ে সরে পড়ল।

পশু-পাখি কেউ তাকে তো দয়া করলে না! গণেশের দেখা যদিই বা পাওয়া যায়, তবে তিনিও যে এদেরই মতো তাকে খেদিয়ে দেবেন না, তারই বা ঠিক কী! সবার কাছে তাড়া খেয়ে বেচারি রিদয় বেড়ার ধারে মুখ-চুন-করে এসে বসল। এ-জন্মে আর সে মানুষ হবে, এমন আশা নেই। মা-বাপ হাট থেকে যখন এসে দেখবেন ছেলেটি যক্ হয়ে গেছে, তখন তাঁদের দুঃখের আর সীমা থাকবে না! সে তো জানা কথা। কিন্তু পাড়ার লোক, এমনকি ভিন্-গাঁ থেকে ছেলে-বুড়ো সবাই বুড়ো-আংলা দেখতে দলে-দলে এসে তাকে ঘেরাও করবে। হয়তো কাগজওয়ালারা তার ছবি তুলে ছাপিয়ে দেবে নিচে বড়-বড় করে লিখে—“আমতলিতে এই অবতারটি নষ্টামির ফল পেয়েছেন—ইনি দ্বিতীয় কালাপাহাড়, হিন্দুকুলকলঙ্ক!” হয়তো বা কোনোদিন আলিপুরের চিড়িয়াখানায় নতুন জানোয়ার বলে টিকিট-মারা খাঁচায়, নয়তো তেলে ভেজে যাদুঘরের কাঁচের সিঁদুকে চাবি দেওয়া হবে! রিদয় আর ভাবতে পারলে না, দুই হাতে মুখ ঢেকে কাঁদতে লাগল! আর সে মানুষের ছেলেদের সঙ্গে খেলতে পাবে না, সবাই তাকে দেখলে যক্ বলে সরে যাবে, কেউ তার সঙ্গে মেয়ের বিয়ে দেবে না, আর এই ঘর-বাড়ি—রিদয় তাদের বাড়ির দিকে চেয়ে দেখলে। খড়ের চাল ছোট-ছোট তিনখানি থাকবার ঘর; তার চেয়ে ছোট রান্না-ঘরখানি; তার চেয়ে ছোট গোয়াল-ঘর; টেকিশাল, ধানের মরাই, আর এতটুকু সেই পুকুর; তার চারদিকে চারটিখানি শাক-সবজি। রিদয়দের বাড়ি নেহাত সামান্য-রকমের, কিন্তু তা হলেও এই সামান্য জমিটুকু—ক’খানি ঘর, হাঁসপুকুর, বাঁশঝাড়, তেঁতুল-গাছটি নিয়ে, কী সুন্দরই ঠেকল! যেন একখানি ছবি! অথচ এই বাড়ি ছেড়ে কতবার রিদয় মনে করেছে পালাবে; আজ কিন্তু সেই বাড়ির দিক থেকে তার চোখ আর ফিরতে চায় না!

দিনটি আজ আমতলি গ্রামখানির উপর, তাদের এই ঘর ক’খানির উপর কী আলোই ফেলেছে! চারদিক ঝকঝক করছে, ঝুরঝুর করছে! পাখি গাইছে, ভোমরা উড়ছে, বাতাস ছুটেছে, নদী চলেছে—কল-কল, কুল-কুল, ফুরফুর! চারদিক আজ উল্লেসে উঠেছে, কেবল মাঝে বসে রয়েছে রিদয়—একলাটি মুখ-চুন-করে। সে ভাবছে, কোথায় যাবে—কী করবে? সে যক্ হয়েছে, মানুষের সঙ্গে তার সম্পর্ক উঠে গেছে। গণেশের অভিশাপে এখন অন্ধকার পাতালপুরীতে সাপের সঙ্গে যক্ হয়ে থাকা ছাড়া আর কী উপায় আছে? গণেশের সন্ধান করে শিবের বাড়ি কৈলাস-পর্বত পর্যন্ত যদি তাকে হেঁটে যেতে হয়, তাও স্বীকার, কিন্তু পাতালপুরীতে সে কিছুতে যেতে

পারবে না! এই প্রতিজ্ঞা করে রিদয় কোমর-বেঁধে উঠে দাঁড়াল। এই সময় শেওলায়-পিছল রাস্তা দিয়ে গুগলি আস্তে-আস্তে চলেছে। রিদয়কে গুগলি শুধোলে—“কোথায় যাওয়া হচ্ছে এত তাড়াতাড়ি?”

রিদয় পাখিদের কাছে, পশুদের কাছে দাবড়ি খেয়ে চিট হয়ে গিয়েছিল, এবারে সে খুব ভদ্রতা করে উত্তর দিলে—“আজ্ঞে, আমি কৈলাস-পর্বতে শ্রীশ্রীগণেশঠাকুরের ছি-চরণে কিছু নিবেদন করতে যাচ্ছি। আপনি কোথায় যাচ্ছেন?”

গুগলি উত্তর করলে—“আমি গঙ্গাসাগরে ছান কত্তি যেতেছি।”

রিদয় মুচকে হেসে শুধোলে—“কতদিনে সেখানে পৌছবেন?”

“যে কয়দিনে পারি।” বলে গুগলি রিদয়কে শুধোলে—“কৈলাস-পর্বতে তুমি কখন পৌছাবে?”

“বোধহয় দুচারদিনে।” বলে রিদয় আস্তে-আস্তে গুগলির সঙ্গে চলল।

গুগলি খানিক চুপ করে থেকে বললে—“আমি বোধকরি দ্যেড় দিন-ট্যেকের মধ্যেই গঙ্গাসাগরে পৌচে যাব, কী বলো?”

রিদয় এবার ঘাড়-নেড়ে বললে—“তা কেমন করে হবে? যে গুটিগুটি আপনি চলেছেন, তাতে ঐ হাঁসপুকুরে পৌছতেই তো আপনার একদিন লাগবে।”

গুগলি বললে—“ওহান থিকে নাই বড়জোর একটা দিন লাগুক। পুকুরের ওপারটাতেই তো সুমুদুর।”

রিদয় হেসে বললে—“তবেই হয়েছে! পুকুরের ওধারে পুকুরের পাড়, তারপর সবজি-খেত, তার ওধারে তেপান্তর মাঠ, মাঠের ওধারে সব গ্রাম, গ্রামের পরে বন, বনের পর নদী, নদীর ওপারে নগর, নগরের পরে উপনগর, তার পরে উপবন, উপবনের পরে উপদ্বীপ, তারপর উপসাগরের উপকূল, তারপর উপসাগর—যেখানে গঙ্গার স্রোত গিয়ে পড়েছে। দেড়দিন কী, দেড়-বছরে সেখানে পৌছতে পারেন কি না সন্দেহ। কেন মিছে হাঁটছেন? নিজের ঘরে ফিরে যান!”

গুগলি ভাবলে রিদয় তার সঙ্গে মক্কা করছে। সে আকাশে নাক তুলে বললে—“আর তুমি ভাবছ দিন-চারেকে কৈলাস-পর্বতে যাবা—এই পিপড়ার মতো সরু-সরু ঠ্যাং চালিয়ে? যদি দিন রাত চলে যাতি পার, তথাপি চার-বছরে তুমি সেখানে পৌছতি পার কি না সন্দেহ। এই আমতলি, ইহার পর জামতলি, তেঁতুলতলি, বটতলি—অমনি পর-পর কত যে গ্রাম তার ঠিকানা মেলে না। তারপর নদীর ধারে এ-নগর, সে-নগর; উপনদীর ধারে সকল উপনগর; তৎপরে এ-ঘাট ও-ঘাট, সে-ঘাট; এ-মাঠ, ও-মাঠ, সে-মাঠ; এ-বন, ও-বন, সে-বন; তাহার পর উপত্যকা, উপত্যকা বাদ পাহাড়তলি, তৎপরে, চিত্রকূট, ত্রিকূট, পরেশনাথ, চন্দ্রনাথের পাহাড়-পর্বত; তাহার পর বিষ্ণাচল, তাহার পর সীমাচল তবে হিমাচল! তৎপরে রামগিরি, তাহার পরে ধবলাগিরি, তৎপরে মানস-সরোবর, উহার ওধারে তিব্বত, আরো ওধারে কৈলাস-পর্বত। এই নদ-নদী পাহাড়-জঙ্গল ভাংতি-ভাংতি সেখানে যাওয়া গঙ্গা-ফড়িংটির-প্রায়-তোমার কর্ম! পক্ষীরাজ-ঘোড়া যে, সেও সেখানে যাতি পারে না চারি হুণ্ডায়, তুমি তো তুমি! ঘরের ছেলে ঘরে গিয়া বৈসা থাহ; কৈলাসের আশা ছাড়ি দ্যোও।”

রিদয় বললে—“আমি যেখানে যাব বলে বেরিয়েছি সেখানে যাবই!”

গুগলিও বললে—“আমিও যেখানে যাত্রা করি বাইরেচি, এই বেঙ্কোকালে, সেহ্যেনে গঙ্গাসাগরে না যাইয়া আমি ছাড়মুনি।”

ঠিক সেই সময় খোঁড়া-হাঁস পুকুর থেকে ছপছপ করে উঠে এসে টুপ করে গুগলিটিকে খেয়ে মাঠের দিকে চলল। রিদয় তাকে শুধোলে—“কোথায় যাওয়া হচ্ছে?”

“মানস-সরোবরে!” বলে হাঁস হেলতে-দুলতে আগুয়ান হল।

রিদয় দেখলে বড় সুবিধে, মানস-সরোবর পর্যন্ত হাঁসের সঙ্গে যাওয়া যাবে; তারপর তিব্বত, তারপরেই কৈলাস। সে আর কোনো কথা না বলে তার মা সুবচনী-ব্রত করতে যে খোঁড়া-হাঁস পুষেছিলেন, তার সঙ্গে ঘর ছেড়ে বেরিয়ে পড়ল!



চলন বিল

মানুষ যেমন, গুলিও তেমনি হাঁটা-পথে চলে, কাজেই কৈলাস যাবার হাঁটা-পথের খবরই গুলি রাখত। কিন্তু মাটির উপর দিয়ে হাঁটা-পথ যেমন, তেমনি আকাশের উপর দিয়ে জলের নিচে দিয়ে সব পথ আছে, সেই রাস্তায় পাখিরা মাছেরা দূর-দূর দেশে যাতায়াত করে। মানুষ, গরু, গুলি, শামুক—এরা সব পাহাড়-জঙ্গল ভেঙে, নদী পেরিয়ে চলে, কাজেই কোথাও যেতে এদের অনেক দিন লাগে। মাছেরা একে-বেকে এ-নদী সে-নদী করে যায়, তাদের ডাঙায় উঠতে হয় না, কাজেই তারা আরো অল্পদিনে ঠিকানায় পৌঁছয়। আর পাখিরা নদী-ডাঙা দুয়েরই উপর দিয়ে সহজে উড়ে চলে—সবচেয়ে আগে চলে তারা! কিন্তু তাই বলে পাখিরাও যে পথের কষ্ট একেবারেই পায় না, এমন নয়। আকাশের নানা-দিকে নানা-রকম নরম-গরম হাওয়া নদীর স্রোতের মতো বইছে—এইসব স্রোত বুঝে পাখিদের যাতায়াত করতে হয়। এ ছাড়া বড় পাখিরা যে-রাস্তায় চলে, ছোট পাখিরা সেসব রাস্তায় গেলে তাদের বিপদে পড়তে হয়—হয়তো ঝোড়ো হাওয়াতে কোথায় যেতে কোথায় গিয়ে পড়ল তার ঠিক নেই!

আবার বড় পাখিদের যে-পথে কম বাতাস, সে-পথে গেলে ওড়াই মুশকিল—ডানা নাড়তে নাড়তে কাঁধ ব্যথা হয়ে যায়! বাতাসের এক-একটা পথ এমন ঠাণ্ডা যে সেখানে খুব শক্ত পাখিরা ছাড়া কেউ যেতে পারে না—শীতে জমে যাবে। কোনো রাস্তায় এমন গরম বাতাসের স্রোত চলেছে যে সেখানে আগুনের ঝলকে পাখা পুড়ে যায়। এ ছাড়া জোয়ার-ভাটার মতো অনুকূল-প্রতিকূল দু'রকম হাওয়া বইছে—সেটা বুঝেও পাখিদের যাওয়া-আসা করতে হয়। সব পাখি আবার রাতে উড়তে পারে না, সেজন্য যে-দিক দিয়ে গেলে বন পাবে, নদী পাবে, আকাশ থেকে নেমে দু'দণ্ড বসে জিরোতে পাবে—এমন সব যাবার রাস্তা তারা বেছে নেয়। এর উপরে আকাশ দিয়ে মেঘ চলাচল

করছে; জলে-ধোঁয়ায় ঝাপসা এইসব মেঘের রাস্তা কাটিয়ে পাখিদের চলতে হয়; না হলে ডানা ভিজে ভারী হয়ে, কুয়াশায়, ধোঁয়ায় দিক ভুল হয়ে একদিকে যেতে আর একদিকে গিয়ে পড়বে। এমনি সব নানা ঝনঝট বাতাসের পথে আছে; কাজেই পাখিদের মধ্যে পাকা মাঝির মতো সব দলপতি-পাখি থাকে। পাণ্ডুরা যেমন দলে-দলে যাত্রী নিয়ে তীর্থ করাতে চলে, তেমনি এরাও ভালো-ভালো রাস্তার খবর নিয়ে দলে-দলে নানা পাখি নিয়ে আনাগোনা করে—উত্তর থেকে দক্ষিণে, দক্ষিণ থেকে উত্তরে, পূব থেকে পশ্চিমে, পশ্চিম থেকে পূবে, সমুদ্র থেকে পাহাড়ের দিকে, পাহাড় থেকে সমুদ্রের দিকে, পৃথিবীর একধার থেকে আর-একধারে নানা-দেশে নানা-স্থানে।

মানুষ যখন একদেশ থেকে আর একদেশে চলে, সে নিজের সঙ্গে খাবার, জিনিস-পত্তর গুছিয়ে নিয়ে চলে। খুব যে গরীব, এমনকি সন্ন্যাসী সেও এক লোটা, এক কঞ্চল, খানিক ছাতু, ছোলা, আটা, দুটো মোয়া, নয়তো দুমুঠো মুড়িও সঙ্গে নেয়; কিন্তু পাখিদের এখান থেকে কিছু খেয়ে নিয়ে, সেখানে নেমে, সেখানে কিছু খেয়ে নিয়ে—এমনি খানিক পথ উড়ে, খানিক আবার ডাঙায় কিম্বা জলায়, কোথাও বা চরে, ঘাটে-ঘাটে জিরিয়ে খেয়ে-দেয়ে না নিলে চলবার উপায় নেই। বাচ্চাদের জন্যে দূর থেকে পাখিরা মুখে করে, গলার থলিতে ভরে খাবার আনে; আর টিয়েপাখি ঠোঁটে ধানের শিষ, হাঁস পদ্মফুলের ডাঁটা নিয়ে সময়-সময় এদিকে-ওদিকে উড়ে চলে বটে, কিন্তু দল বেঁধে যখন তারা পাণ্ডুর সঙ্গে দূর-দূর-দেশে যাত্রা করে বেরোয় যখন কুটোটি পর্যন্ত সঙ্গে রাখে না—একেবারে ঝাড়া-ঝাপটা হাঙ্কা হয়ে উড়ে যায়। রেলগাড়ি যেমন দেশ-বিদেশের মধ্য দিয়ে বাঁশি দিতে-দিতে স্টেশনে-স্টেশনে নতুন-নতুন লোক ওঠাতে-ওঠাতে চলে, এই পাখির দলও তেমনি আকাশ দিয়ে ডাক দিতে-দিতে চলে; আর এ-গ্রাম সে-গ্রাম এ-দেশ সে-দেশ এ-বন ও-বন থেকে যাত্রী-পাখি সব উড়ে গিয়ে ঝাঁকে মিশে আনন্দে মস্ত এক দল বেঁধে চলতে থাকে। আকাশ দিয়ে একটার পর একটা ডাকগাড়ির মতো সারাদিন এমনি দলে-দলে যাতায়াত করে ডাক-হাঁক দিতে-দিতে—হাঁস, বক, সারস, পায়রা, টিয়া, শালিক, ময়না, ডাহুক-ডাহুকী—ছোট বড় নানা পাখি।

খোঁড়া-হাঁসের সঙ্গে মানস-সরোবরে যাবার জন্যে রিদয় ঘর ছেড়ে মাঠে এসে দেখলে নীল আকাশ দিয়ে দলে-দলে বক, সারস, বুনাহাঁস, পাতিহাঁস, বালুহাঁস, রাজহাঁস সারি দিয়ে চলেছে। এইসব পাখির দল পূবে সন্ধ্যাপ থেকে ছেড়ে আমতলির উপর দিয়ে দুভাগ হয়ে এক ভাগ চলেছে—গঙ্গাসাগরের মোহানা ধরে গঙ্গা-যমুনার ধারে-ধারে হরিদ্বারের পথ দিয়ে হিমালয় পেরিয়ে মানস-সরোবরে; আর একদল চলেছে—মেঘনানদীর মোহানা হয়ে আমতলি, হরিৎঘাটা, গঙ্গাসাগর বাঁয়ে ফেলে আসামের জঙ্গল, গারো-পাহাড় খাসিয়া-পাহাড় ডাইনে রেখে, ব্রহ্মপুত্র নদের বাঁকে-বাঁকে ঘুরতে-ঘুরতে হিমালয় পেরিয়ে তিব্বতের উপর দিয়ে কাঞ্চনজঙ্ঘা ধবলাগিরির উত্তর গা ঘেঁষে সিধে পশ্চিম-মুখে মানস-সরোবরে। সমুদ্রের দিক থেকে গঙ্গাসাগরের পথ পশ্চিম-উত্তর হয়ে হিমালয় পেরিয়ে পূবে ঘুরে পড়েছে মানস-সরোবরে; আর ব্রহ্মপুত্রের পথ উত্তর-পূব হয়ে পশ্চিম ঘুরে শেষ হয়েছে মানস-সরোবরে—যেন বেড়ির

দুই মুখ একটি জায়গায় গিয়ে মিলেছে। এই বেড়ির মিলের কাছে রয়েছে সুন্দরবন আর আমতলি, মাঝখানে অনুপূর্ণার অনুপাত্র সুজলা সুফলা সোনার বাঙলা-দেশ; ডাইনে আসাম; বাঁয়ে বেহার অঞ্চল।

সুবচনীরা খোঁড়া-হাঁস রিদয়ের সঙ্গে মাঠে বেরিয়ে প্যাক-প্যাক করে আপনার মনেই বকতে-বকতে চলল—“উঃ বাবারে! আর যে চলতে পারিনে! পা ছিড়ে পড়ছে! কেন এলুম গো, মরতে ঘর থেকে বেরিয়েছিলুম! এতদূরে মানস-সরোবর কে জানে গো—ঐঃ!” খোঁড়া-হাঁস হাঁপাচ্ছে আর চলেছে আর বকছে। বাতে বেচারার পা-টি পঙ্খ। সে অনেক কষ্টে খাল-ধারে—যেখানে গোটাকতক বক, গোটাকতক পাতিহাঁস চরছিল, সেই পর্যন্ত এসে উলুঘাসের উপরে খোঁড়া পা রেখে জিরোতে বসল।

রিদয় কী করে? একটা কচুপাতার নিচে বসে আকাশের দিকে চেয়ে দেখতে লাগল—দলে-দলে হাঁস উত্তর-মুখে উড়ে চলেছে—নানা কথা বলাবলি করতে-করতে। রিদয় শুনে হাঁসেরা বাজে বকছে না; কাজের কথাই বলতে-বলতে পথ চলছে।

সেখো হাঁসেরা বললে—“থাকে-থাকে ফুলের গন্ধ লাগছে নাকে!”

অমনি পাণ্ডা-হাঁস যে সব আগে চলেছে, জবাব দিলে—“ছুটলে খোসবো বাদলা রাখে।”

সেখোরা বললে—“নিচে-বাগে নামল তাল-চড়াই!”

পাণ্ডা উত্তর করলে—“উপরে বড়ই ঠাণ্ডা ভাই!”

সেখোরা বললে—“জাল টেনে মাকড় দিল চম্পট!”

পাণ্ডার জবাব হল—“এল বলে বৃষ্টি—চলো চটপট!”

সেখোরা বললে—“ফুল সব দিল ঘোমটা টেনে।”

পাণ্ডা বললে—“এল বৃষ্টি এল হেনে!”

“ছুঁচোয় গড়েছে মাটির টিপি।”

“বিষ্টি পড়বে টিপিটিপি।”

“সাগরের পাখি ডাঙায় গেল।”

“ঝড় জল বুঝি এবার এল।”

“কাক যে বাসায় একলা বড়!”

“গতিক খারাপ; নেমে পড়ো, নেমে পড়ো।”

অমনি সব হাঁস ঝুপ-ঝুপ করে খালে-বিলে নেমে পড়ে আপনার-আপনার পিঠের পালকগুলো জল দিয়ে বেশ করে ভিজিয়ে নিলে, পাছে পালকগুলো শুকনো থাকলে বিষ্টির জল বেশি করে চুষে নেয়। দেখতে-দেখতে ঝড়ো বাতাস ধুলোয়-ধুলোয় চারদিক অন্ধকার করে দিয়ে বড়-বড় গাছের আগ দুলিয়ে শুকনো ডাল-পাতা উড়িয়ে হু-হু করে বেরিয়ে গেল। তারপরই একপশলা বৃষ্টি হয়ে গেল—খাল-বিল ভর্তি করে দিয়ে। একটু পরে বিষ্টি থেমে আবার রোদ উঠল; তখন দলে-দলে হাঁস, বক, সারস আবার চলল—আকাশপথে আগের মতো বলাবলি করতে-করতে—

“মাকড় আবার জাল পেতেছে।”
 “আর ভয় নেই—রোদ এসেছে।”
 “মৌচাক ছেড়ে মাছির ছোট্টে।”
 “বাদলের ভয় নাইকো মোটে।”
 “বনে-বনে ওঠে পাখির সুর।”
 “উড়ে চলো, পার যতদূর।”
 “আকাশ জুড়িল রামধনুকে!”
 “চলো—গেয়ে চলো মনের সুখে।”

আগে-আগে পাণ্ডা-হাঁস চলেছে, পিছে-পিছে তীরের ফলার মতো দু’সারি হাঁস ডাক দিতে-দিতে উড়ে যাচ্ছে। অনেক উপর দিয়ে একদল ডাক দিয়ে গেল—“পাহাড়তলি কে যাবে? পাহাড়তলি!” বুনো-হাঁসের ডাক শুনে পোষা-পালা খালের বিলের হাঁস, তারা ঘাড় তুলে যে যেখানে ছিল জবাব দিলে—“যে যায় যাক, আমরা নয়।” মাটির উপরে যারা, তারা মুখে বলছে—“যাব না” কিন্তু আকাশ এমনি নীল, বাতাস এমনি পরিষ্কার যে মন তাদের চাচ্ছে উড়ে চলি—ঐ আলো-মাখা হাওয়ায় ডানা ছড়িয়ে হু-হু করে! যেমন এক-এক দল বুনো-হাঁস মাথার উপর দিয়ে ডাক দিয়ে যাচ্ছে, আর অমনি যত পালা-হাঁস তারা চঞ্চল হয়ে পালাই-পালাই করছে। দু’চারটে বা ডানা ঝটপট করে এক-একবার উড়ে পড়তে চেষ্টা করলে, অমনি বুড়ি হাঁস ঘাড় নেড়ে বলে উঠল—“এমন কাজ কোরো না, আকাশপথে চলার কষ্ট ভারি, পাহাড় দেশে শীত বিষম, কিছু মেলে না গো, কিছু মেলে না!”

বুনো-হাঁসের ডাক শুনে সুবচনীরা খোঁড়া-হাঁস উড়ে পড়তে আনচান করতে লাগল। সে বলতে লাগল—“এইবার একদল হাঁস এলে হয়, ঝপ করে উড়ে পড়ব! আর পারিনে বাপু মাটিতে ঝুঁড়িয়ে চলতে!”

সন্দ্বীপ থেকে বালু-হাঁসের দল হিমালয় পেরিয়ে একেবারে মানস-সরোবর পর্যন্ত যাবার জন্য তৈরি হয়ে বেরিয়েছে; এবারে সেই দূর-দূরের যাত্রীরা, আমতলির ঠিক উপর দিয়ে চলতে-চলতে ডাক দিতে থাকল টানা সুরে—“মানস-সরোবর! ধোলাগিরি!”

খোঁড়া-হাঁস অমনি উলুঘাসের ঝোপ ছেড়ে গলা তুলে ডাক দিলে—“আসছি, একটু রও, একটু রয়ে ভাই, একটু রয়ে চলো!” তারপর সে তার শাদা দু’খানা ডানা মেলে বাতাসে গা ভাসিয়ে দু-চার-হাত গিয়ে আবার ঝুপ করে মাটিতে পড়ল—বেচারার কতদিন ওড়েনি, ওড়া প্রায় ভুলে গেছে! খোঁড়া-হাঁসের ডাক বালু-হাঁসেরা শুনেছিল বোধ হয়, তাই মাথার উপরে ঘুরে-ঘুরে তারা দেখতে লাগল যাত্রী আসছে কি না! সুবচনীরা হাঁস আবার চোঁচিয়ে বললে—“রও ভাই, একটু রয়ে!” তারপর যেমন সে উড়তে যাবে, অমনি রিদয় লাফ দিয়ে তার গলা জড়িয়ে—“আমিও যাব” বলে ঝুলে পড়ল!

খোঁড়া-হাঁস তখন বাতাসে ডানা ছড়িয়ে উড়তে ব্যস্ত, রিদয়কে নামিয়ে দেবার সময় হল না, দুজনেই মাটি ছেড়ে আকাশে উঠল। রিদয়কে নিয়ে খোঁড়া-হাঁস বাতাস কেটে উপরে উঠছে—এমনি বেগে যে, মনে হল ডগায় ঝোলানো একটা টিকটিকি

নিয়ে হাউই চলেছে। হঠাৎ সেই খোঁড়া-হাঁস এমন তেজে মাটি ছেড়ে উপরে উঠে পড়বে, এটা হাঁসটা নিজেও ভাবেনি; রিদয় তো মনেই আনতে পারেনি—এমনটা হবে! এখন আর নামবার উপায় নেই—পায়ের তলায় মাটি কতদূরে পড়ে আছে তার ঠিক নেই, ডানার বাতাস ক্রমাগত তাকে ঝাপটা দিচ্ছে। রিদয় হাঁপাতে-হাঁপাতে অতি-কষ্টে গাছে-চড়ার মতো হাঁসের গলা ধরে আস্তে-আস্তে তার পিঠে চেপে বসল। কিন্তু এমন গড়ানো হাঁসের পিঠ যে সেখানেও ঠিক বসে থাকা দায়—রিদয় ক্রমেই পিছলে পড়তে যাচ্ছে! দুখানা শাদা ডানার ওঠা-পড়ার মধ্যে বসে তার মনে হতে লাগল যেন শাদা দু'টো সমুদ্রের ঢেউয়ের মাঝে সে দুলতে-দুলতে চলেছে। প্রাণপণে খোঁড়া-হাঁসের পিঠের পালক দুই মুঠোয় ধরে, দু'পায়ে গলা জড়িয়ে রিদয় স্থির হয়ে বসবার চেষ্টা করতে লাগল।

মাটির উপর দিয়ে খোঁড়া-হাঁসের পায়ে হেঁটে যাওয়া এক, আর এক-কুড়ি-একটা উড়ন্ত হাঁসের হাঁক-ডাক, চলন্ত ডানার ঝাপটার মধ্যে বসে ঝড়ের মতো শূন্যে উড়ে চলা আর এক! বাতাস তোলপাড় করে চলেছে হাঁসের দল! কুড়ি-জোড়া দাঁড়ের মতো ঝপঝপ উঠছে-পড়ছে জোরালো ডানা! রিদয় দেখছে কেবল হাঁস আর পালক বিজবিজ করছে! শুনছে কেবল বাতাসের ঝপঝপ, সোঁ-সোঁ, আর থেকে-থেকে হাঁসদের হাঁক-ডাক! উপর-আকাশ দিয়ে যাচ্ছে, না মেঘের মধ্যে দিয়ে চলেছে, কি মাটির কাছে দিয়ে উড়ছে, রিদয় কিছুই বুঝতে পারছে না!

উপর-আকাশে এমন পাতলা বাতাস যে হঠাৎ সেখানে উঠে গেলে দম নিতে কষ্ট বোধ হয়, কাজেই নতুন-সেখো—খোঁড়া-হাঁসকে একটু সামলে নেবার জন্যে বালু-হাঁসের দল নিচেকার ঘন হাওয়ার মধ্যে দিয়ে বরং আস্তেই চলেছে, এতেই রিদয়ের মনে হচ্ছে যেন পাশাপাশি দুটো রেলগাড়ি পুরোদমে ছুটেছে আর তারি মাঝে এতটুকু-সে দুলতে-দুলতে চলেছে! ওড়ার প্রথম চোটটা কমে এলে রিদয়ের হাঁস ক্রমে টাল সামলে সোজা তালে-তালে ডানা ফেলে চলতে শুরু করলে। তখন রিদয় মাটির দিকে চেয়ে দেখবার সময় পেলে। হাঁসের দল তখন সুন্দরবন ছাড়িয়ে বাঙলাদেশের বুকের উপর দিয়ে উড়ে চলেছে। রিদয় আকাশ থেকে দেখছে যেন সবুজ-হলদে-রাঙা-মেটে-নীল এমনি পাঁচ-রঙের ছক-কাটা চমৎকার একখানি কাঁথা রোদে পাতা রয়েছে। রিদয় ভাবছে এ কোনখানে এলেম? সেই সময় বাখরগঞ্জের ধান-ক্ষেতের উপর দিয়ে হাঁসেরা চলল। রিদয় দেশটা দেখে ভাবলে প্রকাণ্ড একটা যেন শতরঞ্জ-খেলার ছক নিচের জমিতে পাতা রয়েছে।

রিদয় ভাবছে—“বাস রে? এত বড় খেলার ছক, রাবণে দাবা খেলে নাকি?” অমনি যেন তার কথার উত্তর দিয়ে হাঁসেরা হাঁক দিলে—“ক্ষেত আর মাঠ, ক্ষেত আর মাঠ—বাখরগন্জো!” তখন রিদয়ের চোখ ফুটল। সে বুঝলে সবুজ ছকগুলো ধান-ক্ষেত—নতুন শিষে ভরে রয়েছে! হলদে ছকগুলো সরষে-ক্ষেত—সোনার ফুলে ভরে গিয়েছে! মেটে ছকগুলো খালি জমি—এখনো সেখানে ফসল গজায়নি। রাঙা ছকগুলো শোন আর পাট। সবুজ পাড়-দেওয়া মেটে-মেটে ছকগুলো খালি জমির ধারে-ধারে গাছের সার। মাঝে-মাঝে বড়-বড় সবুজ দাগগুলো সব বন। কোথাও সোনালি, কোথাও

লাল, কোথাও ফিকে নীলের ধারে ঘন সবুজ ছককাটা ডোরা-টানা জায়গাগুলো নদীর ধারে গ্রামগুলি—ঘর-ঘর পাড়া-পাড়া ভাগ করা রয়েছে। কতগুলো ছকের মাঝে ঘন সবুজ, ধারে-ধারে খয়েরি রঙ—সেগুলো হচ্ছে আম-কাঁঠালের বাগান—মাটির পাঁচিল-ঘেরা। নদী, নালা, খালগুলো রিদয় দেখলে যেন রূপোলি ডোরা নক্সা—আলোতে ঝিকঝিক করছে। নতুন ফল, নতুন পাতা যেন সবুজ মখমলের উপরে এখানে-ওখানে কারচোপের কাজ!—যতদূর চোখ চলে এমনি! আকাশ থেকে মাটি যেন শতরশ্মি হয়ে গেছে দেখে রিদয় মজা পেয়েছে; সে হাততালি দিয়ে যেমন বলছে—“বাঃ, কী তামাশা।” অমনি হাঁসেরা যেন তাকে ধমকে বলে উঠল—“সেরা দেশ—সোনার দেশ—সবুজ দেশ—ফলন্ত-ফুটন্ত বাংলাদেশ!”

রিদয় একবার গণেশকে নিয়ে হাসি-তামাশা করতে গিয়ে বিপদে পড়েছে, হাঁসের ধমক শুনে মুখ বুজে গম্ভীর ভালোমানুষটির মতো পিটপিট করে চারদিকে চাইতে লাগল আর মিটমিট করে একটু-আধটু হাসতেও থাকল—খুব ঠোট চেপে। দলে-দলে কত পাখি—কেউ চলেছে দক্ষিণ থেকে উত্তরে, কেউ উত্তর থেকে দক্ষিণে, পূব থেকে পশ্চিমে, পশ্চিম থেকে পূবে; আর পথের মাঝে দেখা হলেই এদল ওদলকে শুধাচ্ছে—এদিকের খবর, ওদিকের খবর—খবর কী ভাই, খবর কী? অমনে বলাবলি চলল “ওধারে জল হচ্ছে।” “এধারে রোদে পুড়ছে।” “সেধারে ফল ফলেছে।” “এধারে বউল ধরেছে।” রিদয়কে নিয়ে চলতি হাঁসেরা পাহাড় থেকে একদল ফিরতি হাঁসকে শুধিয়ে জানলে—ওধারে এখনো কুয়াশা কাটেনি; শিল পড়ছে; জল হিম; গাছে এখনো ফল ধরেনি! অমনি তারা টিমে চালে চলতে আরম্ভ করলে। তাড়াতাড়ি পাহাড়-অঞ্চলে গিয়ে লাভ কী, বলে তারা এগ্রাম-সেগ্রাম, নদীর এপার-ওপার করতে-করতে ধীরে-সুস্থে এগোতে থাকল।

গ্রামে-গ্রামে ঘরের মটকায় কুকড়ো সব পাহারা দিচ্ছে। ঘাটিতে-ঘাটিতে চলন্ত পাখিরা তাদের কাছে খবর পাচ্ছে। “কোন গ্রাম?” “তেঁতুলিয়া, সাবেক তেঁতুলিয়া, হাল তেঁতুলিয়া।” “কোন শহর?” “নোয়াখালি—খটখটে।” “কোন মাঠ?” “তিরপুরণীর মাঠ—জলে থৈথৈ।” “কোন ঘাট?” “সাঁকের ঘাট—গুগলি ভরা।” “কোন হাট?” “উলোর হাট—খড়ের ধুম।” “কোন নদী?” “বিয়নদী—ঘোলা জল।” “কোন নগর?” “গোপাল নগর—গয়লা ঢের।” “কোন আবাদ?” “নাসীরাবাদ—তামুক ভালো।” “কোন গঞ্জ?” “বামুনগঞ্জ—মাছ মেলা দায়।” “কোন বাজার?” “হালতার বাজার—পলতা মেলে।” “কোন বন্দর?” “বাগা বন্দর—হুকাছায়া।” “কোন জেলা?” “রুঙ্গলী জেলা—সিঁদুরে মাটি।” “কোন বিল?” “চলন বিল—জল নেই।” “কোন পুকুর?” “বাঁধা পুকুর—কেবল কাদা।” “কোন দীঘি?” “রায় দীঘি—পানায় ঢাকা।” “কোন খাল?” “বালির খাল—কেবল চড়া।” “কোন ঝিল?” “হীরা ঝিল—তীরে জেলে।” “কোন পরগনা?” “পাতলে দ—পাতলা হ।” “কোন ডিহি?” “রাজসাই—খাসা ভাই!” “কোন পুর?” “পেসাদপুর—পিঁপড়ে কাঁদে।” “কার বাড়ি?” “ঠাকুর বাড়ি।” “কোন ঠাকুর?” “ওবিন ঠাকুর—ছবি লেখে।” “কার কাচারি?” “নাম কারো না, ফাটবে হাঁড়ি!”

এমনি দেশের নাম, লোকের নাম, বাড়ির নাম, আর নামের সঙ্গে একটা করে বিশেষণ দিয়ে কুঁকড়ো, সব যেমন-যেমন প্রশ্ন হচ্ছে, সঙ্গে-সঙ্গে তার উত্তর দিয়ে যাচ্ছে। যাত্রীরাও বুঝে নিচ্ছে কোন জায়গায় কী পাওয়া যায়, কোথায় নামলে বিপদ, কোথায় নিরাপদ—কোথায় কী খাওয়া পাওয়া যায় তা পর্যন্ত! মানুষে হয়তো দিয়েছে গ্রামের নাম ‘ভদ্রপুর’ কিন্তু সেখানে না আছে ফলের বাগান, চরবার খাল, বিল, মাঠ; লোকগুলোও চোয়াড়; পাখির ভাষায় সে গ্রামের নাম হল—‘নরককুণ্ড’। কোনো দুঁদে জমিদার প্রজার সর্বনাশ করে তেতলা বাড়ি ফেঁদে তার নাম দিয়েছে ‘অলকাপুরী’; কিন্তু সেখানে কোনোদিন কারু পাত পড়ে না; শেয়াল-কুকুর কেঁদে যায়; পাখিরা মিলে সে-বাড়ির নাম দিলে ‘পোড়াবাড়ি’। হয়তো একটা পাড়া—সেখানে ভণ্ড বৈরাগীর আড্ডা; তারা দিনে মাল জপে, রাতে বাড়ি-বাড়ি সিঁদ দিয়ে আসে; সে-জায়গাটার নাম মানুষ দিলে ‘বৈরিগি-পাড়া’, কিন্তু পাখিরা তাদের বললে ‘নিগিরিটিং’—ভাবটা যে কেবল এদের খঞ্জনীই সার! হয়তো এক ভালো পরগনার জমিদার কিন্তু পরগনার নাম মানুষে বলছে ‘খোলা মুচি’; কিন্তু পাখিরা দেখতে সেখানে ধান খুব, ফল ভালো, ভালো জমিদার; বন্দুক-হাতে শিকারে বেরোয় না; অমনি সে পরগনার নাম তারা হাঁকলে—‘রাজভোগ—সাবেক রাজভোগ—হাল রাজভোগ।’ হয়তো ‘রাজভোগ’ যেমন, তেমনি কোনো ভালো পরগনা নষ্ট জমিদারের হাতে পড়ে উচ্ছন্ন গেল—সেখানে না মেলে ঘাস, না আছে ভালো জল, না আছে বাগান, থাকবার মধ্যে মাতাল জমিদারের বন্দুকের গুলি, দুঁদে নায়েবের লাঠি-সোটা; মানুষ সে-পরগনার নাম ‘লক্ষ্মীপুর’ দিলেও পাখিরা তাকে বললে ‘মশাল-চুলি’।

কোনো-কোনো জায়গায় সাতপুরুষ ধরে ভালো মানুষ, ভালো আবহাওয়া, ভালো খাওয়া-দাওয়া, খালবিল হাটবাজার গুলজার; সেখানকার কুঁকড়ো বুক-ফুলিয়ে হাঁকলে—মনোহর নগর—সাবেক মনোহর নগর—হালে মনোহর।” এমনি যেখানে পাখিদের সুখ, সেসব জায়গার নাম এক-এক কুঁকড়ো হেঁকে দিচ্ছে—যেমন যেমন হাঁসের দল, সারসের দল, মাথার উপর দিয়ে উড়ে যাচ্ছে—“সোহাগদার, দৌলতপুর, সুনামগঞ্জ!” যেখানে ফলফুলুরী ফসল ঢের, সেসব জায়গার কুঁকড়োরা হাঁকছে—“দানাসিরি, লাঙ্গলবাঁধ, উলুর হাট, আমতাজুড়ি, জঙ্গিপুর!” হাঁস—পদ্মনাল এমনি সব খেতে পছন্দ করে, যেখানে খালে-বিলে এসব জন্মেছে, সেখানকার কুঁকড়ো হাঁকছে—“সাতনল, নলচিটে, পাটের হাট, বেতগাঁ, বেতাজী, সোলভাঙা, শাকের হাট।” যেখানে খাবার নেই, তার কুঁকড়ো হাঁকলে—“ঝালকাটি, কাটিপাড়া, আশাশূন্য, সন্ন্যাসীহাট।” যেখানে ছায়াকরা বন অনেক, সেখানকার নাম হাঁকলে কুঁকড়ো—“কমলাবাড়ি, ফুলঝুরি, ডাকেটিয়া, শিরিশদিয়া, কোকিলামুখ।” যেখানে ছোট-বড় নদী, ছোট-বড় মাছ, কুঁকড়ো হাঁকলে—“চাঁদপুর, ইলশেঘাট, ব্যাঙধুই, বোয়ালিয়া, বোয়ালমারি।”

রিদয় দেখলে হাঁসেরা সোজা যে উত্তর-মুখো চলেছে, তা নয়। তারা এ-গ্রাম সে-গ্রাম, এ-ক্ষেত ও-ক্ষেত, এ-বিল ও-বিল, করে হরিংঘাটা, মেঘনা—এই দুই নদীর মাঝে যা কিছু আছে সব যেন দেখতে-দেখতে চলেছে—বাংলাদেশের সুন্দরবন,

ধানক্ষেত, পদ্মদীঘি, বালুচর, খালবিল ছাড়তে যেন তাদের মন উঠছে না। বাখরগঞ্জ, বরিশাল, খুলনা, যশোহর, ফরিদপুর হয়ে ধলেশ্বরী নদী পেরিয়ে ক্রমে হাঁসের দল চাঁদপুরের দিকে চলল—পুবমুখে।

হাঁসের মধ্যে ঘেংরাল আর সরাল দু-জাতের হাঁস—এরা কোনোদিন কোথাও যেতে চায় না, নড়তেও চায় না—ভারি কুনো! বুনো-হাঁস এদের দেখলেই তামাশা করতে ছাড়চে না। তারা উত্তর-আকাশ থেকে একের পর এক ডেকে চলল—“পাহাড়তলি, কামরূপ, ধোলাগিরি, মানস-সরোবর—চলেছি, চলেছি!” অমনি সরাল, ঘেংরাল এরা উত্তর দিচ্ছে—“যেও না যেও না, বড় শীত। যেও পরে, যেও পরে।”

বুনো-হাঁসের দল আরো নিচে নেমে একসঙ্গে বলে উঠল—“ভারি মজা, উড়তে মজা—শীতে মজা—পাহাড়ে মজা। উড়তে শেখাব; চলে এসো না!”

সরাল, ঘেংরাল কোথাও উড়ে যাবে না; যেখানকার সেখানে থাকবে, অথচ উড়তে পারে না বললে তারা ভারি চটবে; এবারে বুনো-হাঁসের কথায় তারা জবাবই দিলে না। তখন বালু-হাঁসের দল একেবারে মাটির কাছে নেমে এসে বলে উঠল—“ওরে হাঁস নয় রে—ভেড়া!” তারপর হাঃ-হাঃ করে হাসতে-হাসতে ডানায় তালি দিতে-দিতে আবার আকাশে উঠল। নিচে থেকে ঘোরো-হাঁস তারা গলা চিরে গালাগালি শুরু করলে—“মর, মর! গুলি খেয়ে মর, শীল পড়ে মর, বাতে ধরে মর, বাজ পড়ে মর, বিদেশে মর, বিভূয়ে মর!”

এমন হাসি-তামাশার মধ্যে রিদয় আনন্দে চলেছে। কিন্তু তবু নিজের দূরবস্থা ভেবে—সে যে মা-বাপ ঘর-বাড়ি ছেড়ে কোথায় নির্বাসনে চলেছে, সেকথা মনে করে—এক-একবার তার চোখে জলও আসছে। কিন্তু তবু এই আকাশ দিয়ে একেবারে হু-হু করে উড়ে চলায় কী মজা কত আনন্দ! বাতাসে কোথাও ভিজে মাটির গন্ধ, কোথাও ফোটা-ফুলের খোসবো, কোথাও পাকা ফলের কী মিঠে বাসই আসছে! পৃথিবীর গায়ের বাতাস যে এমন সুগন্ধে ভরা রিদয় আগে তো জানেনি! মেঘের উপর দিয়ে জলের চেয়ে পরিষ্কার বাতাসের উপর দিয়ে ভেসে চলতে-চলতে রিদয়ের মনে হতে লাগল যেন সব দুঃখ, সব কষ্ট, পৃথিবীর যত কিছু জ্বালা-যন্ত্রণা ছেড়ে সে সত্যি উঠে এসেছে সেইখানে, যেখানে ধুলো নেই, বালি নেই, ভয় নেই, ভাবনা নেই, রোগ নেই, শোক নেই—কেবল আনন্দে উড়ে চলা দিন-রাত!



চকা-নিকোবর

সুবচনীর খোঁড়া-হাঁস এইসব বুনো-হাঁসদের দলে ভিড়ে উড়তে, আর এ-গ্রামের সে-গ্রামের সব সরাল, ঘেংরালদের দেখে হাসি-মস্করা করতে পেয়ে, ভারি খুশি হয়েছে। সে ভুলে গেছে যে নিজেই সে এত-কাল পালা-হাঁসই ছিল—ঐ সরাল-ঘেংরালের মতো ঘর আর পুকুর করে কাটিয়েছে। তার উপর সে আজন্ম-খোঁড়া, সবে আজ নূতন উড়ছে। বুনো-হাঁসের সঙ্গে সমানে পাল্লা দিয়ে চলা তার কর্ম নয়! খোঁড়ার ডানার তেজ ক্রমেই কমছে আর দমও ক্রমে ফুরিয়ে আসছে, সে হাঁপাতে-হাঁপাতে তাড়াতাড়ি ডানা ঝাপটেও আর পেরে উঠছে না, মধ্যে থেকে এক-এক-করে প্রায় আট হাঁস পিছিয়ে পড়েছে। সেথো হাঁসরা যখন দেখলে খোঁড়া পিছিয়ে পড়ে, আর পারে না, তখন পাগু-হাঁসকে ডাক দিয়ে জানালে—‘চকা-নিকোবর, চকা-নিকোবর!’

চকা উড়তে-উড়তেই শুধোলো—“ক্যেন্-ক্যেন্ কও ক্যেন্?”

সেথোরা বললে—“পিছিয়ে পোলো খোঁড়া ঠ্যাং!”

আগের মতো সোঁ-সোঁ করে চলতে-চলতেই চকা বলে উঠল—

জোরে চলায় নাই কোনো দায়,

আস্তে গেলেই হাঁপ লেগে যায়!

অমনি সব হাঁস একসঙ্গে বলে উঠল—“চলে চল, চলে চল, ভাই, চলে চল।”

চকার কথা-মাফিক খোঁড়া-হাঁস জোরে চলতে চেষ্টা করতে দুগুণ হাঁপিয়ে পড়ল; আর সে আস্তে-আস্তে ক্রমে মাঠের ধারে-ধারে নারকোল গাছের প্রায় মাথা পর্যন্ত নেমে পড়বার মতো হল। তখন সেথো হাঁসরা আবার ডাক দিলে—“চকা-নিকোবর—চকা-চকা-চকা!”

এবার চকা গরম হয়ে বললে—“ক্যেন্ কর ভ্যেন্ ভ্যেন্।”

সেথোরা বলে উঠল—“খোঁড়া-হাঁস তলিয়ে যায়!”

চকা একবার চেয়েও দেখলে না, যেমন বেগে চলেছিল, তেমনি পুরোদমে যেতে-
যেতে বললে—“বলো ওকে হালকা হাওয়ায় উঠে আসতে।”

নিচের বাতাস ঠেলা মুশকিল,
ডানা নেড়ে নেড়ে লাগে ঘাড়ে খিল।
উপর বাতাস পাতলা ভারি,
এক ঝাপটে বিশ হাত মারি।

খোঁড়া-হাঁস চকার কথায় উপরে উঠবার চেষ্টা করতে লাগল, কিন্তু এবার বাতাস
ঠেলে উঠতে বেচারার দম নিকলে যাবার যোগাড় হল।

আবার সেথোরা ডাক দিল—“চকা! চকা!”

“কেনে? চলতে দিবে না নাকি!”—বলে চকা গৌঁ হয়ে উড়ে চলল।

সেথোরা বললে—“খোঁড়া-বেচারার প্রাণসংশয়!”

চকা রেগে উত্তর দিলে—

উড়তে না পারে ঘরে যাক,
থাক-দাক বসে থাক।
কে বলেছে উড়তে ওরে,
ভিড়তে দলে রঙ্গ করে?

খোঁড়া-হাঁসের জানতে বাকি রইল না যে বুনো-হাঁসরা কেবল তামাশা দেখবার
জন্য তাকে এতটা সঙ্গে এনেছে মানস-সরোবরে নিয়ে যেতে নয়। আঃ কী আপসোস!
ডানা যে তার আর চলছে না। না হলে খোঁড়া-হাঁসও যে উড়তে পারে, সেটা একবার
বুনো-হাঁসদের সে দেখিয়ে দিত। তা ছাড়া এই চকা-নিকোবর—এমন হাঁস নেই যে
একে জানে না; এই একশো বছরের বুড়ো-হাঁস, যার সঙ্গে পয়লানম্বর হাঁসও উড়ে
পেরে ওঠে না, পড়বি তো পড় তারি পাল্লায়! যে-চকা পোষা-হাঁসকে হাঁসের মধ্যেই
ধরে না, লজ্জা পেতে হল কিনা তারি সামনে! এ দুঃখ সে রাখবে কোথায়!

খোঁড়া সবার পিছনে ভাবতে-ভাবতে চলল—বাড়ি ফিরবে, কি, প্রাণ যায় তবু
সমানে বুনো-হাঁসের সঙ্গে চলে সে দেখিয়ে দেবে যে সেও জানে উড়তে! রিদয় এই
সময় খোঁড়াকে বললে—“সুবচনীর কৃপায় এতদূর এসেছ, আর কেন? এইবার ফেরো।
এদের সঙ্গে পাল্লা দিয়ে চলতে গিয়ে শেষে দম-ফেটে মরবে নাকি! আমি তো ওদের
মতলব ভালো বুঝিছি!”

রিদয় কিছু না বললে, হয়তো খোঁড়া আপনা-হতেই বাড়ি-মুখো হত; কিন্তু এই
বুড়ো-আংলা, এও ভাবছে তাকে কমজোর! খোঁড়া বিষম রেগে ধমকে উঠল—“ফের
কথা কইলে মাটিতে ঝেড়ে-ফেলে চলে যাব।” বলেই রেগে ডানা আপসে খোঁড়া
এমনি তেজে উড়ে চলল যে বুনো-হাঁসরাও একেবারে অবাক হয়ে গেল। রাগের মুখে
গৌঁ-ভরে যেমন তেজে খোঁড়া চলেছিল, রাগ পড়লে সে-তেজ থাকত কি না সন্দেহ।
কিন্তু ঠিক সেই সময় সূর্য পাটে বসতে চললেন। দেখতে-দেখতে বেলা পড়ে এল।

অমনি হাঁসরা সবাই জমি-মুখো হয়ে রূপ-রূপ আকাশ থেকে চাঁদপুরের সামনে মেঘনার মাঝে বাগদী-চরে নেমে পড়ল। চরে উড়ে বসতেই রিদয় হাঁসের পিঠ থেকে লাফিয়ে পড়ল।

তখন চরের উপর থেকে সবেমাত্র জল সরে গেছে, ভিজ়ে কাদা তখনো কালো প্যাচ-প্যাচ করছে—মাঝে-মাঝে ডোবায় এখনো জল বেধে আছে। এবড়ো-খেবড়ো ভাঙা-চোরা পিছল চর; খানা, ডোবা, নালা, এখানে-ওখানে,এরি উপরে সন্দের হিম হাওয়া বইছে। রিদয়ের গা কাঁটা দিয়ে উঠল শীতে। নদীর কিনারায় যেদিকে হাঁসরা নেমেছে, সেদিকে খানিক জঙ্গল অন্ধকারে কালো দেখাচ্ছে। জঙ্গল ছাড়িয়ে খোলা মাঠ, সেদিকে মানুষ কি গরু কিছুই নেই। চারদিক সুনসান! মেঘনার মাঝে লাল ফানুসের মতো রাঙা সূর্য্য পশ্চিম-আকাশে রামধনুকের রঙ টেনে দিয়ে আস্তে-আস্তে জলে ডুবছে।

রিদয়ের মনে হল সে যেন কোথায় কতদূরে মানুষের বসতি ছেড়ে পৃথিবীর শেষে এসে পড়েছে! বেচারী সমস্ত দিন খেতে পায়নি। তার কেবলি কান্না আসতে লাগল। এই একলা চরে কেউ কোথাও নেই—কোথায় খায়, কোথায় যায়? আর যদি বাঘ আসে, কে তাকে বাঁচায়? আর যদি বিষ্টি আসে, কোথায় সে মাথা গুঁজবে? কোথা রইলেন বাপ-মা, কোথা রইল ঘর-বাড়ি! সূর্য লুকিয়ে গেছেন; জল থেকে উঠছে কুয়াশা; আকাশ থেকে নেমেছে অন্ধকার; চারদিকে ঘনিয়ে আসছে ভয়! ওধারে বনের তলাটা যেন নিঝুম হয়ে আসছে। ঝিমঝিম সেখানে ঝিঝি ডাকছে, আর লতায়-পাতায় খুসখুস শব্দ উঠছে।

রিদয়ের মনে আকাশে উঠে যে ফুটিটা হয়েছিল, এখানে নেমে সেটুকু একেবারে নিভে গেল। এখন এই হাঁসগুলো ছাড়া সঙ্গী আর কেউ নেই। রিদয় দেখলে সুবচনীর হাঁস একেবারে কাবু হয়ে পড়েছে। বেচারী মাটিতে পা দিয়েই শুয়ে পড়েছে! কাদার উপর গলা বাড়িয়ে দুই-চোখ বুজে সে কেবলি জোরে-জোরে শ্বাস টানছে—যেন আধ-মরা!

রিদয় তার সঙ্গের সাথী খোঁড়া-হাঁসকে বললে—“একটু জল খেয়ে নাও—এই তো দু’পা গেলেই নদী!” কিন্তু খোঁড়া সাড়া-শব্দ দিলে না। রিদয় আর এখন দুষ্ট নেই। এই খোঁড়া-হাঁস এখন আর শুধু হাঁস নয়—তার বন্ধু,সাথী সবই। সে আস্তে-আস্তে তার গলাটি ধরে উঠিয়ে জলের ধারে নিয়ে চলল। রিদয় ছোট, হাঁস বড়; কিন্তু প্রাণপণে সে হাঁসকে টেনে নিয়ে জলের কাছে নামিয়ে দিলে। হাঁস জলে কাদায় খানিক মুখ ডুবিয়ে চুক-চুক-করে জল খেয়ে নিয়ে গা-ঝাড়া দিয়ে জলে নেমে শর-বেণার ঝাড় ঠেলে সাঁতরে-সাঁতরে খাবারের সন্ধান করতে লাগল।

বুনো-হাঁসগুলো নেমেই জলে গিয়ে পড়েছিল; খোঁড়া-হাঁসের কোনো খবরই নেয়নি; দিব্যি চান করে ডানা ঝেড়ে গুলি-শামুক শাক পাতা খেয়ে বেড়াচ্ছে। রিদয়ের হাঁস জলে নেমেই সুবচনীর কৃপায় একটা পাকাল মাছ পেয়ে গেল। সে সেইটে মুখে নিয়ে ডাঙায় এসে রিদয়ের কাছে ফেলে দিয়ে বললে—“এই নাও, মাছটা তোমায় দিলুম। আমার যে উপকার করেছে, তা চিরদিন মনে থাকবে। খেয়ে নাও মাছটা!”

হাঁসের কাছে দুটো মিষ্টি কথা পেয়ে রিদয় একেবারে গলে গেল। তার মনে হল

সেই খোঁড়া-হাঁসের গলা ধরে তার দু'ঠোটে দুটো চুমু খায়। রিদয় কাদা থেকে মাছটি তুলে একবার ভাবলে—রাঁধি কিসে? অমনি মনে পড়ল সে যে এখন আর মানুষ নেই, যক্ হয়েছে; হয়তো কাঁচা মাছ খেতে পারবে। রিদয়ের ট্যাকে এটা-ওটা কাটতে একটা ছুরি থাকত; সে সেইটে টেনে বার করে মাছটা কুটেতে বসল। ছুরিটা এখন একটা খড়কে-কাঠির মতো ছোট হয়ে গেছে, কিন্তু তাতেই কাজ চলে গেল। মাছটা ছোট-ছোট করে বানিয়ে কতক-কতক হাঁসকে খাইয়ে দিয়ে নিজে খেতে বসল। তার যকের মুখে কাঁচা মাছ নেহাত মন্দ লাগল না। রিদয়ের খাওয়া হলে খোঁড়া তাকে চুপি-চুপি বললে যে চকা-নিকোবরের দল পোষা-হাঁসকে হাঁসের মধ্যে গণ্য করে না। রিদয় চুপি-চুপি বললে—“তা তো দেখতে পাচ্ছি।”

খোঁড়া-হাঁস গলা-ফুলিয়ে বললে—“মজা হয়, যদি একবার এদের সঙ্গে সমানে আমিও মানস-সরোবর পর্যন্ত উড়ে যেতে পারি। পোষা-হাঁস কী করতে পারে তবে ওরা টের পায়।”

“তা তো বটেই!” বলে রিদয় চুপ করলে।

খোঁড়া বলে চলল—“আমার মনে হয় একলা আমি অতটা যেতে পারি কি না! কিন্তু তুমি যদি সঙ্গে চল, তবে আমি সাহস করি।”

রিদয় ভেবেছিল এখান থেকে সে বাড়ি ফিরবে। কিন্তু হাঁসের ইচ্ছে শুনে সে একটু তা-না-না করে বললে—“দ্যাখো, আমার সঙ্গে তোমার বনবে কি? আমি তোমাকে আগে কত জ্বালাতন করেছি।” কিন্তু রিদয় দেখলে হাঁস আগের কথা ভুলে গেছে, রিদয় যে তার প্রাণ বাঁচিয়েছে—জল খাইয়ে যত্ন করে, সেই কথাই সে খোঁড়া-হাঁস মনে রেখেছে। একবার বাপ-মায়ের কথা তুলে রিদয় হাঁসকে বাড়ি ফেরাবার চেষ্টা করলে, কিন্তু হাঁস বললে—“কোনো ভাবনা নেই, আসছে-শীতে তোমায় আমি ঠিক বাড়িতে পৌঁছে দেব। তোমাকে ঘরের দরজায় নামিয়ে দিয়ে তবে আমার ছুটি। তার মধ্যে তোমায় একলা ছেড়ে আমি কোথাও নড়ব না—প্রতিজ্ঞা করছি!”

রিদয় ভাবছে—মন্দ না! এই যক্ হয়ে মা-বাপের কাছে এখন না যাওয়াই ভালো! কী জানি, মানস-সরোবর থেকে হয়তো কৈলাসেও গণেশের সন্ধান করা যেতে পারবে। এই ভেবে রিদয় খোঁড়া-হাঁসকে জবাব দেবে এমন সময় পিছনে অনেকগুলো ডানার ঝটাপট শোনা গেল! এক-কুড়ি বুনো-হাঁস একসঙ্গে জল ছেড়ে ডাঙায় উঠে গায়ের জল ঝাড়ছে। তারপর মাঝে চকা-নিকোবরকে রেখে সারবন্দি সব হাঁস তাদের দিকে এগিয়ে আসতে লাগল। খোঁড়া-হাঁস বুনো-হাঁসদের চেহারা দেখে একটু ভয় খেলে। সে ভেবেছিল হাঁস-মাত্র পোষা-হাঁসের মতো দেখতে; আর ধরন-ধারণও সেই রকম। কিন্তু এখন দেখলে বুনো-হাঁসগুলো বেঁটে-খাটো গাঁট্টা-গোঁট্টা-কাঠখোঁট্টা-গোছের। এদের রঙ তার মতো শাদা নয়, কিন্তু ধুলো-বালির মতো ময়লা, পালক এখানে খয়েরি, ওখানে খাকির ছোপ। আর তাদের চোখ দেখলে ভয় হয়—হলুদবর্ণ—যেন গুলের আগুন জ্বলছে! খোঁড়া বরাবর দেখে এসেছে হাঁস চলে হেলতে-দুলতে—পায়ে-পায়ে; কিন্তু এরা চলেছে খটমট চটপট—যেন ছুটে বেড়াচ্ছে। আর এদের পাগুলো বিশ্রী—চ্যাটালো, বেটো-বেটো, ফাটা-চটা—হতকুৎসিত! দেখলেই বোঝা

যায় যেখানে-সেখানে শুধু-পায়ে এরা ছুটে বেড়ায়—জল কাদা কিছুই বাছে না ; তাদের ডানার পালক, গায়ের পালক, ল্যাজের পালকগুলো পরিষ্কার ঝকঝক করছে বটে কিন্তু ধরন-ধারণ দেখলে বোঝা যায় এগুলো একেবারে বুনো আর জংলি! খোঁড়া তাড়াতাড়ি রিদয়কে সাবধান করে দিলে—যেন সে কে, কী বৃত্তান্ত, এসব কথা বুনো-হাঁসদের না বলে। তার পর সে খোঁড়াতে-খোঁড়াতে এগিয়ে গেল। চকা-নিকোবর, খোঁড়া-হাঁস আর বুনো-হাঁসদের মধ্যে খানিকক্ষণ ঘাড়-নেড়ে নমস্কার প্রতি-নমস্কার চলল। তারপর চকা শুধোলে—“এখন বলো তো তোমরা কে? কোন জাতের পাখি?”

খোঁড়া আস্তে-আস্তে বললে—“কী আর পরিচয় দেব? গেল বছর ফাল্গুন মাসে হরিংঘাটায় আমি ডিম-ভেঙে বার হই। জন্মাবধি পা-টি খোঁড়া। এই শীতে আমতলির হাটে আমি বিকোতে আসি; সেখান থেকে রিদয়ের বাপ আমায় সাত-সিকেতে কিনে আনে; তারপর তোমাদের দলে ভিড়েছি।”

চকা-নিকোবর নাক তুলে বললে—“তুমি তবে নেহাত সাধারণ হাঁস দেখছি! খেতাব, মান-সম্মান, বোলবোলা—কিছুই নেই! কোন সাহসে আমাদের দলে আসতে চাও শুনি?”

খোঁড়া-হাঁস খোঁড়া পা-টি নাচিয়ে বললে—“আমি দেখাতে চাই যে সাধারণ হাঁসও কাজের হতে পারে।”

চকা হেসে বললে—“সত্যি নাকি? কই, দেখাও দেখি কেমন কাজের কাজী তুমি?”

এক হাঁস অমনি বললে—“ওড়ার কাজে কেমন যে মজবুত তা তো দেখিয়েচ!”

অন্যে বললে—“হয়তো তুমি সাঁতারে পাকা।”

খোঁড়া ঘাড়-নেড়ে বললে—“না, আমি সাঁতারু মোটেই নয়। আমি বর্ষার সময় নালাগুলো এপার-ওপার করতে পারি, তার বেশি নয়।” খোঁড়া-হাঁস ভাবছিল, চকা তো তাকে আমতলিতে ফিরে পাঠাবেই স্থির করেছে, তবে কেন মিছে-কথা বলা? পষ্ট জবাব দেওয়াই ভালো—যা থাকে কপালে!

চকা শুধোলে—“সাঁতার জানো না, তবে দৌড়তে মজবুত বোধ হয়?” বলেই চকা একবার তার খোঁড়া পায়ের দিকে চেয়ে চোখ মটকালে।

খোঁড়া-হাঁস গম্ভীর হয়ে বললে—“রাজহাঁস কোনোদিন ছুটে চলে না, তাই ছোট্ট আমার অভোসই হয়নি।” বলে সে খোঁড়া-পা আরো ঝুঁড়িয়ে রাজহাঁস কেমন চলে একবার দেখিয়ে দিলে। তার মনে হচ্ছিল এইবার চকা বললে বুঝি—“তোমায় আমাদের দরকার নেই, ঘরে যাও।” কিন্তু ঠিক তার উল্টোটা হল। চকা-নিকোবর দু’-চারবার ঘাড়-নেড়ে বলল—“তুমি তো বেশ সাফ-সাফ জবাব দিলে—একটু ভয় না করে! ভালো ভালো, তোমার সাহস আছে—সময়ে লায়েক হতে পারবে—বুকের পাটা শক্ত, সকল কাজে পোক্ত”। দুদিন এদলে থাকো, দেখি তোমার হিম্মৎ কতটা, তারপর যা হয় বিবেচনা করা যাবে। কি বল?”

খোঁড়া-হাঁস মাথা নেড়ে বলল—“আমি তো তাই চাই। এতেই আমি খুশি।”

এইবার চকা-নিকোবর বুড়ো-আংলা রিদয়ের দিকে ঠোট বাড়িয়ে বললে—“এ কী, এ কোন জানোয়ার? ভারি তো অদ্ভুত!”

খোঁড়া-হাঁস তাড়াতাড়ি বললে—“এটি আমার দেশের লোক, হাঁস চরাবার কাজ করে, সঙ্গে থাকলে কাজে লাগতে পারে।”

চকা নাক তুলে উত্তর করলে—“বুনো-হাঁসের কোনো কাজে লাগবে না—পোষা-হাঁসের কাজে লাগবে বটে! ওর নাম কী?”

মানুষের নাম বললে পাছে বুনো-হাঁসরা ভয় খায়, সেইজন্যে খোঁড়া-হাঁস অনেক ভেবে বললে—“ওর নাম অনেকগুলো। আমরা ওকে ডাকি বুড়ো-আংলা বলে। আঃ, বড় ঘুম পাচ্ছে।” বলেই খোঁড়া দু’বার হাই তুলে চোখ বুজলে; পাছে চকা আর-কিছু প্রশ্ন করে তাই খোঁড়া আগে থাকতে সাবধান হচ্ছে—“মাগো, চোখ আপনা হতেই ঢুলে আসছে! চলরে বুড়ো-আংলা ঘুমোবি চল।”

চকা-নিকোবর বড় পাকা হাঁস; বুড়ো হয়ে তার মাথা থেকে ল্যাজের পালক পর্যন্ত রূপোর মতো শাদা হয়ে গেছে; মাথাটা যেন চুনের হাঁড়ি; পা-দুটো যেন চ্যালা কাঠ—বাঁকা, ফাটা-চটা; ডানা-দুটো যেন দু’খানা ঝরঝরে বাঁশের কুলো; ঠোঁট ভোঁতা; গলা ছিনে-পড়া, কিন্তু চোখ এখনো জোয়ান-হাঁসের চেয়েও ঝকঝকে—যেন আগুন ঠিকরে পড়ছে! চকা দেখলে খোঁড়া পাশ-কাটাবার চেষ্টায় আছে, সে এগিয়ে এসে বুক-ফুলিয়ে খোঁড়াকে বললে—“আমি কে, জানো তো? আমার নাম—চকা-নিকোবর। আর এই আমার ডাইনের হাঁস দেখেছ, ইনি আমার ডান-হাত বললেও চলে, এঁর নাম পাপড়া নানকোঁড়ি! আর এই আমার বাঁ-হাত, এঁর নাম নেড়োল-কাটচাল। তারপর ডাইনে হলেন লালসেরা আগামনি; বাঁয়ে হলেন চোক-ধলা ডানকানি। তার পরে পাটাবুকো হামস্তি, মারগুই চাপড়া, তিরশুলী আকায়ব, সন্দ্বীপের বাঙাল, ধনমানিকের কাওয়াজি, রাবণাবাদের রাজহাঁস, রায়-মঙ্গলার ঘেংরাল, চক্ৰিশ-পরগনার সরাল। আরো ডাইনে-বাঁয়ে দ্যাখো লুসাই, তিব্বতি, তাতারি—এমনি সব বড়-বড় খেতাবি হাঁস—কেতাবে যাদের নাম উঠছে। আমরা কি যার-তার সঙ্গে আলাপ করি, না যাকে-তাকে দলে ভিড়তে দিই? আমাদের সঙ্গে যদি ওঠা-বসা করতে চাও তো স্পষ্ট করে ওই বুড়ো-আংলাটির গাঁইগোন্তর পদবি-উপাধি বলো, নয়তো নিজের পথ দ্যাখো!”

চকার দেমাক দেখে রিদয় আর চুপ করে থাকতে পারল না, সে বুক-ফুলিয়ে এগিয়ে এসে বলল—“আমার নাম ছিল ছিযুক্ত রিদয়নাথ পুততুও, ফুলুরী গাঁই, কাশ্যপ গোত্র—পুণ্ড্রপুত্র; ডিহি বাখরগঞ্জ, মোকাম আমতলি—হাঁসপুকুর, তেঁতুলতলা। জাতে আমি মানুষ ছিলাম, সকলে এখন—” আর বলতে হল না; মানুষ শুনেই চকা-নিকোবরের দল দশহাত পিছিয়ে গিয়ে গলা বাড়িয়ে খ্যাক-খ্যাক করে বললে—“যা ভেবেছি তাই! সরে পড়ো। মানুষ আমরা দলে নিইনে। ভারি বজ্জাত তারা!”

খোঁড়া-হাঁস আমতা-আমতা-করে বললে—“এইটুকু মানুষ, ওকে আবার ভয় কী? কাল ও তো আপনিই বাড়ি চলে যাবে; আজ রাতটা এখানে থাক না! এইটুকু টিকটিকির মতো ওকে এই অন্ধকারে শেয়াল-কুকুরের মুখে ছেড়ে দেওয়া তো চলে না। তা ছাড়া ও আর এখন মানুষ নেই—যক হয়ে গেছে!”

চকা ‘যক’ শুনে সাহস পেয়ে এগিয়ে এসে বললে—“বাপু, মানুষ জাত খরাপ,

বরাবর দেখে এসেছি। ওদের বিশ্বাস নেই। তবে তুমি যদি জামিন থাক, তবে রাতের মতো ওকে আমরা থাকতে দিই। এই হিমে চড়ায় শুয়ে ঘুমিয়ে যদি অসুখে পড়ে, তার দায়ী আমরা হব না—এইবেলা বুঝে দ্যাখো!”

খোঁড়া-হাঁস পিছবার পাত্র নয়; সে বললে—“সে-ভয় নেই। চড়ায় এক রাত কেন, সাত রাত কাটালেও ওর কিছু হবে না। এমন সৎসঙ্গ, ভালো জায়গা বনে আর পাবে কোথা? ওর বড় জোর-কপাল যে চকা-নিকোবরের সঙ্গে এক-চরে শুতে পেয়েছে! চকার বাছা বাগদী-চর; এতে শুয়ে আরাম কর।” বলে খোঁড়া রিদয়কে চোখ টিপলে।

চকা খোশামোদে খুশি হয়ে বললে—“তাহলে কাল কিছু ওর বাড়ি ফেরা চাই—কেমন?”

খোঁড়া বললে—“ওর সঙ্গে তাহলে আমাকেও ফিরতে হয়। আমি যে প্রতিজ্ঞা করেছি—ওকে ছাড়ব না!”

চকা-নিকোবর উত্তর দিলে—“তুমি যেমন বোঝো। ইচ্ছে হয় আমাদের সঙ্গে থাকতে পারো, ইচ্ছে হয় ফিরতে পারো।” এই বলে চকা চরের মধ্যখানে উড়ে বসল।

একে-একে বুনো-হাঁস চরে গিয়ে ডানায় মুখ গুঁজে শুয়ে পড়েছে। খোঁড়া-হাঁস রিদয়ের কানে-কানে বললে—“চরে বড় হিম; যত পারো শুকনো ঘাস কুড়িয়ে নিয়ে আমার সঙ্গে এসো।” রিদয় দু’-বোঝা শুকনো কুটো-কাটা হাঁসের পিঠে দিয়ে চেপে বসল। হাঁস তাকে চরের একটা গর্তে নাবিয়ে বললে—“ঘাসগুলো বালির উপর বিছিয়ে দাও, আমি ওর উপর বসি, তুমি আমার ডানার মধ্যে ঢুকে পড়ো, আর ঠাণ্ডা লাগবে না।” রিদয়কে ডানার মধ্যে নিয়ে সুবচনীর খোঁড়া-হাঁস—“এই আমায় তুমি আরামে রাখো, আমি তোমায় গরমে রাখি—” বলে খড়ের উপরে আরামে বসে ঘুম দিতে লাগল। রিদয়ের মনে হল সে পালকের তোশকে শুয়েছে। সেও একটিবার হাই তুলেই চোখ বুজলে।



শৃগাল

মেঘনার মোহানায় চর যে কখন কোথায় পড়ে, তার ঠিক-ঠিকানা নেই। আজ যেখানে জল, কাল সেখানে দেখা গেল চড়া পড়ে বালি ধু-ধু করছে; কাল যেখানে দেখেছি চরে উলু-ঘাস, বালু-হাঁস; বছর ফিরতে সেখানে দেখলেম চরও নেই, ঘাসও নেই—অগাধ জল থৈ-থৈ করছে! এক-রাতের মধ্যে হয়তো নদীর স্রোত ফিরে গেল—জলের জায়গায় উঠল বালি, বালির জায়গায় চলল জল।

বাগদী-চরে হাঁসেরা যখন উড়ে বসল, তখন চরের চারদিকে জল—ডাঙা থেকে না সাঁতরে চরে আসা মুশকিল। অপার মেঘনার বুকে এক-টুকরো ময়লা গামছার মতো ভাসছিল চরটি, কিন্তু রাত হতেই জল ক্রমে সরতে লাগল, আর দেখতে-দেখতে সৰু এক-টুকরো চড়া ডাঙা থেকে বাগদী-চর পর্যন্ত, একটি সাঁকোর মতো দেখা দিলে।

চাঁদপুরের জঙ্গলে বসে খেঁকশিয়ালী হাঁসের দলের উপরে নজর রেখেছিল; কিন্তু চকা-নিকোবরকে সে চেনে; এমনি বেছে-বেছে নিরাপদ জায়গায় চকা তার দল নিয়ে রাত কাটাত যে এ-পর্যন্ত তার দলের একটি হাঁস শিয়ালে ধরতে পারেনি। মেঘনার পূর্ব-তীরের জঙ্গল ভেঙে রাতের বেলায় খেঁকশিয়ালী শিকারে বেরিয়েছে, এমন সময় জলের বুকে কুমিরের পিঠের মতো সৰু সেই চরটির দিকে চোখ পড়ল। এক লাফ দিয়ে সে চর ডিঙিয়ে পায়ে-পায়ে অগ্রসর হল। খেঁকশিয়ালী প্রায় হাঁসের দলে এসে পড়েছে, এমন সময় হুপ-করে একটা ডোবার জলে তার পা পড়ল; এমনি চকা চমকে উঠে ডাক দিলে—“কেও?” আর সব হাঁস ডানা ঝেড়ে উড়ে পড়তে আরম্ভ করলে; সেই অবসরে তীরের মতো ছুটে গিয়ে শেয়াল লুসাই-হাঁসের ডানা কামড়ে ধরে হিড়-হিড় করে সেটাকে ভাঙার দিকে নিয়ে চলল।

সব হাঁসের সঙ্গে ভয় পেয়ে ঝোঁড়া-হাঁসও ডানা ছড়িয়ে আকাশে উঠল; কেবল রিদয় হাঁসের ডানা থেকে ঝুপ-করে মাটিতে পড়ে চোখ রগড়ে চেয়ে দেখলে অন্ধকারে

সে একা, আর দূরে একটা কুকুর হাঁস ধরে পালাচ্ছে। অমনি রিদয় হাঁসটা কেড়ে নিতে শেয়ালের সঙ্গে ছুটল। মাথার উপর থেকে খোঁড়া-হাঁস একবার হাঁক দিলে—“দেখে চলো!” কিন্তু রিদয় তখন হৈ-হৈ করে ছুটেছে। রিদয়ের গলা পেয়ে লুসাই কতকটা সাহস পেলে, কিন্তু বুড়ো-আঙুলের মতো ছেলে কেমন করে শেয়ালের মুখ থেকে তাকে বাঁচাবে, এটা তার বুদ্ধিতে এল না। এত দুঃখও লুসায়ের হাসি এল। সে পাঁক-পাঁক করে হাসতে হাসতে চলল।

মাথার উপরে খোঁড়া-হাঁস রিদয়ের সঙ্গে-সঙ্গে চলেছে; তার ভয়—পাছে রিদয় খানায় ডোবায় পড়ে হাত-পা ভাঙে। কিন্তু যক্ হয়ে অবধি খুব অন্ধকার রাতেও যকের মতো রিদয় দেখতে পাচ্ছে। খানা-খন্দ লাফিয়ে দিনের বেলার মতো রিদয় সহজে ছুটেছে আর চোঁচাচ্ছে—“ছেড়ে দে বলছি, না হলে এক ইট মেরে পা খোঁড়া করে দেব!” কে তার কথা শোনে? শেয়াল এক লাফে চড়া ছেড়ে পারে উঠে দৌড়ে চলল। রিদয়ও চলেছে হাঁকতে-হাঁকতে—“মড়াখেকো-কুকুর কোথাকার! ছাড় বলছি, না হলে মজা দেখাব।”

চাঁদপুরের খেঁকশেয়াল যার নাম, আসামের জঙ্গলে হেন পাখি নেই যে তাকে জানে না। সে শহরে গিয়ে কতবার মুরগি, হাঁস ধরে এনেছে। তাকে ‘মড়াখেকো-কুকুর’ বলে এমন সাহস কার? শেয়াল একটু থেমে যেমন ঘাড় ফিরিয়ে দেখেছে, অমনি রিদয় গিয়ে তার ল্যাজ চেপে পিঠে একটা কিল বসিয়ে দিলে। মানুষটি বুড়ো-আংলা, তার কিলটি কত বড়ই বা? শেয়ালের পিঠে একটা যেন বেদানা-বিচি পড়ল! কিন্তু মানুষের মতো গলার সুর শুনে শেয়াল সত্যি ভয় পেলে; সে ল্যাজ তুলে বনের মধ্য দিয়ে পালিয়ে চলল; আর রিদয় তার ল্যাজ ধরে টিকটিকির মতো ঝুলতে-ঝুলতে চলল—উলু-বাসের মধ্যে দিয়ে গা-ঘেঁষড়ে। কাঁকড়ার মতো ল্যাজে কী কামড়ে রয়েছে, সেটা দেখবার শেয়ালের অবসর ছিল না, সে একেবারে নিজের গর্তের কাছে এসে দাঁড়িয়ে, মুখ থেকে হাঁসটা নামিয়ে, সেটার বুক পা দিয়ে দাঁড়াল, তখন তার চোখ পড়ল ল্যাজে-গাঁথা বুড়ো-আংলার দিকে! এই টিকটিকির মতো ছেলেটা—ইনি চাঁদপুরী শেয়ালকে জন্ম করবেন, ভেবে শেয়াল ফ্যাক করে মুখ-ভেংচে হেসে বলল—“এইবার তোমার মনিবকে খবর দাওগে চাঁদপুরের শেয়াল হাঁস খেয়েছে।”

ছুটালো মুখ, নাটা-চোখ দেখে এতক্ষণে রিদয় বুঝলে এটা শেয়াল। কিন্তু শেয়াল তাকে ভেংচেছে, এর শোধ সে দেবেই-দেবে! রিদয় আরো শক্ত করে তার ল্যাজ চেপে, দুই পায়ে একটা গাছ আঁকড়ে, যেমন শেয়াল হাঁ করে হাঁসটার গলা কাটতে গেছে অমনি পিছনে এক টান দিয়ে, হাঁস থেকে শেয়ালকে দু-হাত তফাতে টেনে নিয়েছে! আর সেই ফাঁকে লুসাই-হাঁসও ভাঙা ডানা ঝাপটাতে-ঝাপটাতে উড়ে পালিয়েছে।

“হাঁস যাক, আজ তোকে খাব!”—বলে খেঁকশেয়ালী দাঁত-খিচিয়ে রিদয়কে ধরবার জন্যে কেবলি নিজের ল্যাজটার সঙ্গে ঘুরতে লাগল। রিদয়ও ল্যাজ আঁকড়ে চরকিবাঁজির মতো শেয়ালের সঙ্গে ঘুরতে থাকল, আর বলতে লাগল—“ধর দেখি মড়াখেকো-কুকুর!”

বনের মধ্যে শেয়াল-মানুষে চরকিবাজি এমনতরো কেউ কোনোদিন দেখেনি। প্যাঁচা, চামচিকে, এমনকি দিনের পাখিরাও তামাশা দেখতে বার হল। কিন্তু রিদয় দেখলে তামাশা ক্রমে শক্ত হয়ে উঠেছে—সে নিজে শেয়ালের ল্যাজ ছাড়তে চাইলেও, শেয়াল তাকে সহজে ছাড়ে কি না সন্দেহ! খেঁকশেয়ালী পাকা শিকারী; তার গায়ের শক্তিও যেমন, বুদ্ধিও তেমনি, সাহসও কম নয়! রিদয় বুঝলে ঘুরে-ঘুরে সে নিজে যেমন হাঁপিয়ে পড়বে অমনি টুপ-করে তাকে ধরবে শেয়াল! রিদয় একবার চারদিক চেয়ে দেখলে, হাতের কাছে কোনো বড় গাছ আছে কি না। কাছেই একটা সরু ঝাউগাছ বন ঠেলে আকাশে সোজা উঠেছে, ঘুরতে-ঘুরতে রিদয় সেইদিকে এগিয়ে গেল, তারপর হঠাৎ একসময় শেয়ালের ল্যাজ ছেড়ে একেবারে ঝাউগাছটার আগডালে উঠে পড়ল। শেয়াল তখনো নিজের ল্যাজ কামড়াতে বোঁ-বোঁ লাঠিমের মতো ঘুরছে। রিদয় গাছের উপর থেকে চোঁচিয়ে বলছে—

তাকুড়-তাকুড় তাকা!
 যাচ্ছে শেয়াল ঢাকা!
 থাকে-থাকে-থাকে
 হুকাহুয়া ডাকে!
 চাঁদপুরের কাঁকড়া-বুড়ি
 কামড়েছে তার নাকে!

শেয়াল দেখলে শিকার তাকে ঠকিয়ে পালাল! সে গাছের তলায় হাঁ করে বসে রিদয়ের দিকে চেয়ে বললে—“রইলুম এইখানে বসে, কতক্ষণে নেমে আসিস দেখি! তোকে না খেয়ে নড়ছিনে।” এক-ঘণ্টা গেল, দু-ঘণ্টা গেল, শেয়াল আর নড়ে না। ঝাউগাছের সরু ডালে পা ঝুলিয়ে শীতের রাতে জেগে বসে থাকা যে কী কষ্ট আজ রিদয় বুঝলে। শীতে তার হাত পা অসাড় হয়ে গেছে, চোখ ঢুলে পড়ছে, কিন্তু ঘুমোবার যো নেই—পড়ে যাবার ভয়ে। আর বনের মধ্যে অন্ধকারই বা কত! দু’হাত তফাতে নজর চলে না—মিশকালো ঘুটঘুটে চারিদিক! মনে হল যেন গাছপালা সব শীতে কালো পাথরের মতো পাষাণ হয়ে গেছে! একটি পাখি ডাকছে না, একটি পাতা নড়ছে না—সব নিথর নিঝুম! রিদয়ের মনে হচ্ছে রাত যেন ফুরোতে চায় না!—রিদয় আর না-ঘুমিয়ে থাকতে পারে না! এই সময় ভোরের কনকনে বাতাস বইল, আর দেখতে-দেখতে ভূসো-কালির মতো রাতের রঙ ক্রমে ফিকে হতে-হতে মিশি থেকে রাঙা, রাঙা থেকে রূপোলি, রূপোলি থেকে সোনালি হয়ে উঠল। তারপর বনের ওপারে সূর্য উঠলেন। বেলায় উঠত, কাজেই সূর্যকে চিরকাল রিদয় দেখে এসেছে কাঁচা-সোনার মতো হলুদ বর্ণ; সূর্য যে খ্যাপা মোষের চোখের মতো এমন লাল টকটকে, তা তার জ্ঞান ছিল না; তার ঠিক মনে হল যে যেন রাণিরের কাণ্ডকারখানা শুনে রেগে তার দিকে চাচ্ছেন!

তারপর গাছের ফাঁকে-ফাঁকে সকালের আলো উঁকি মারতে লাগল—বনের গাছ-পালা জীব-জন্তু রাতের আড়ালে আবডালে অন্ধকারে বসে কী কাণ্ড করেছে, তারি

খোঁজ নিতে লাগল। বনের তলাকার চোরকাঁটা, শেয়ালকাঁটা, কাটি-কুটি, কাঁটা-খোঁচা, যা-কিছু সব যেন আলোর ধমকে লজ্জায় রাঙা হয়ে উঠল। ক্রমে মেঘে-মেঘে আলো পড়ল—রঙ ধরল; গাছের পাতা, ঘাসের শিষ, ফোটা-ফুলের পাপড়ি, তার উপরে শিশিরের ফোঁটা—সবই আলোতে ঝলক দিতে থাকল! যেন সবাই সিঁদুর পরে সাটিনের কাপড়ে সেজেছে! ক্রমে চারিদিক আলোতে আলোময় হয়ে উঠল; অন্ধকারের ভয় দেখতে-দেখতে কোথায় পালাল; আর অমনি কত পাখি, কত জীব-জন্তুই বা বনে ছুটোছুটি আরম্ভ করল! লাল-টুপি মাথায় কাঠঠোকরা ঠকাস-ঠকাস গাছের ডালে ঘা দিতে বসে গেল, কাঠবেরালি অমনি খোপ ছেড়ে গাছের তলায় বসে কুটুস-কুটুস বাদাম ছাড়াতে লেগে গেল; গাং-শালিক, গো-শালিক, ছাতারে, গাছের তলায় নেমে শুকনো পাতা উল্টেপাল্টে কিড়িং ফড়িং ধরে-ধরে বেড়াতে লাগল; আগ-ডালে বসে শ্যামা-দোয়েল শিস দিতে আরম্ভ করলে। রিদয়ের মনে হল সূর্য যেন সব পশু-পাখি কীট-পতঙ্গদের জাগিয়ে দিয়ে অভয় দিতে থাকলেন—রাত পালিয়েছে, তোরা ঘর ছেড়ে বার হ, আমি এসেছি, ভয় নেই!

রিদয় শুনলে মেঘনার চরে হাঁসেরা ডাকাডাকি, হাঁকাহাঁকি লাগিয়েছে, দল একত্র হচ্ছে। চকা-নিকোবর হাঁকলে—“মানস-সরোবর! ধৌলাগিরি! আও আও আও!” তারপর রিদয় দেখলে তার মাথার উপর দিয়ে নিকোবরের পুরো দল উড়ে চলল—খোঁড়া-হাঁসটি সুন্দর! রিদয় তাদের একবার ডাক দিলে কিন্তু এত উপর দিয়ে হাঁসেরা চলেছে যে তার ডাক শুনলে কি না বোঝা গেল না—উড়তে-উড়তে আকাশে মিলিয়ে গেল। রিদয় স্থির করলে হাঁসেরা নিশ্চয়ই দেখেছে শেয়াল তাকে খেয়েছে। সে হতাশ হয়ে আকাশে চেয়ে রইল। কিন্তু এত দুঃখেও সকালের আলো আর বাতাস, সে যেখানটিতে বসে আছে সেই ডালটি সোনার রঙে রাঙিয়ে ঝাউপাতার মধ্যে দিয়ে চুপিচুপি তাকে এসে বলতে থাকল—“ভয় কী? দিন হয়েছে—সূর্য উঠেছেন, আমরা থাকতে কিসের ভয়!” ঠিক সে-সময় কমলালেবুর রঙের সাজ পরে হলুদবর্ণ যে-সূর্য আমতলির মাঠে রোজ-রোজ রিদয়কে দেখা দিতেন, তিনি চাঁদপুরের জঙ্গলের উপরে দেখা দিলেন।

বেলা প্রায় এক প্রহর। রিদয় গাছের উপরে, শেয়াল নিচে বসে আছে, হাঁসের দলেরও কোনো খবর নেই, যে-যার খাবার সন্ধানে বেরিয়ে গেছে। ঠিক যখন বেলা ন’টা, তখন দেখা গেল, বনের মধ্যে দিয়ে একটিমাত্র হাঁস, যেন উড়তেই পারছে না, এইভাবে আস্তে-আস্তে চলেছে। খেকশেয়ালী অমনি কান খাড়া করে হাঁসের দিকে নাক উঠিয়ে পায়ে-পায়ে এগিয়ে চলল। হাঁসটা শেয়ালকে দেখেও দেখলে না, তার নাকের সামনে দিয়েই উড়ে চলল। হাঁসটাকে ধরবার জন্যে শেয়াল একবার ঝঙ্ক দিলে, হাঁস অমনি ফিক করে হেসে, উড়ে গিয়ে চড়ায় বসল। এর পরেই আর-এক হাঁস ঠিক তেমনি করে আরো-একটু মাটির কাছ দিয়ে উড়ে চলল। শেয়ালটা লাফ দিলে; তার কানের রোঁয়াগুলো হাঁসের পায়ে ঠেকল, কিন্তু ধরতে পারলে না—হাওয়ার মতো হাঁস উড়তে-উড়তে চড়ার দিকে চলে গেল। একটু পরে আর-এক হাঁস—এটা যেন উড়তেই পারছে না—একবারে মাটির কাছ দিয়ে ঝাউগাছের গা-ঘেঁষে উড়ে চলল।

এবারে প্রাণপণে শেয়াল ঝুঁপ দিলে। ধরেছে, এমন সময় হাঁস সোঁ-করে তার দাঁতে পালক বুলিয়ে দিয়ে একেবারে মুখের মধ্যে থেকে পালিয়ে গেল। এবার যে এল, সে এমনি বেকায়দায় লটপট করে উড়ে আসছে যে খেঁকশেয়াল ভাবলে—একে তো ধরেছি! কিন্তু বারবার তিনবার ঠেকে শেয়াল বিরক্ত হয়ে উঠেছে, সে হাঁসের দিক থেকে মুখটা ফিরিয়ে গৌঁ হয়ে রইল। যে-পথে আগের তিনটে হাঁস গেছে, এটাও সেই পথ ধরে ঝাউতলায় এসে শেয়ালের এত কাছ দিয়ে চলল যে শেয়াল আর থির থাকতে না পেয়ে দিয়েছে লাফ এমন জোরে যে তার ল্যাঙ্গটা ঠেকল হাঁসের পিঠে। কিন্তু হাঁসও পাকা; সে সোঁ-করে শেয়ালের পেটের নিচে দিয়ে গলে তার ঝাঁটার মতো ল্যাঙ্গে ডানার এক খাপ্পড় বসিয়ে হাসতে-হাসতে চম্পট দিলে। শেয়ালের আর দম নেবার সময় হল না, ঝপ-ঝপ করে আরো গোটা-পাঁচেক হাঁস নাকের সামনে দিয়ে বেরিয়ে গেল, একটাকেও সে ধরতে পারলে না—লাফানি-ঝাঁপানি সার হল! এবারে পর-পর আবার পাঁচটা হাঁস একে-একে শেয়ালকে লোভ দেখিয়ে সজোরে তার পিঠে ডানার বাতাস দিয়ে হোঃ হোঃ করে হাসতে-হাসতে একেবারে তার রণ-ঘেঁষে চলে গেল, কিন্তু শেয়াল না-রাম, না-গঙ্গা—চুপ করে বসে রইল। সে বুঝেছে চকা-নিকোবরের দল কাল রাতে হাঁস নিয়ে যাওয়ার শোধ তুলতে মক্ষরা লাগিয়েছে।

অনেকক্ষণ আর হাঁসেদের দেখা নেই, শেয়াল ভাবচে তারা গেছে, এমন সময় চকা-নিকোবর দেখা দিলেন। তার সেই পাকা পালক, ছিনে গলা দেখেই শেয়াল তাকে চিনে নিলে। একটা ডানা বেঁকিয়ে খোঁড়াতে-খোঁড়াতে এক-কাৎ হয়ে সে উড়ে এল—একেবারে যেন চলতেই পারে না, এই ভাবে। শেয়াল এবারে লাফ দিয়ে নদীর ধার পর্যন্ত হাঁসটাকে তাড়িয়ে গেল; কিন্তু হাঁস যেন ধরা দিয়েও ধরা দিলে না; সোজা গিয়ে চরে বসে প্যাক-প্যাক করে হেসে উঠল। শেয়াল একেবারে লজ্জায় লাল হয়ে জঙ্গলের দিকে ফিরে দেখলে—এবারে চমৎকার ধবধবে মোটাসোটা রাজহাঁস তার দিকে উড়ে আসছে। বনের অন্ধকারে তার শাদা ডানা-দুখানা যেন রূপোর মতো ঝকঝক করছে। এবারে শেয়ালের নোলা সকসক করে উঠল। সে এমন লাফ দিলে যে, ঝাউগাছের পাতাগুলো তার গায়ে খোঁচা মারলে, কিন্তু খোঁড়া রাজহাঁস ধরা পড়ল না—সোজা ঝাউগাছ ঘুরে চড়ায় গিয়ে উঠল।

এর পরে আর হাঁসের সাড়া-শব্দ নেই; সব চুপচাপ। শেয়াল ঝাউগাছের দিকে চেয়ে দেখলে, ছেলেটাও সেখান থেকে সরে পড়েছে। শেয়াল ফ্যালফ্যাল করে চারদিকে চাইছে এমন সময় চড়ার দিক থেকে একে-একে হাঁস সব আগেকার মতো তাকে লোভ দেখিয়ে উড়ে চলল। কিন্তু শেয়ালের তখন মাথার ঠিক নেই; সে পাগলের মতো কেবল ঝাঁপাঝাঁপি-লাফালাফি করতে থাকল আর কেবলি হাঁস তার নাকের সামনে দিয়ে যেতে থাকল—এক, দুই, তিন, চার, পাঁচ, দশ, পনেরো, কুড়ি, বাইশ! শেয়াল তাদের একটি পালক পর্যন্ত ছিঁড়ে নিতে পারলে না। শেয়াল এমন নাকাল কখনো হয়নি। চাঁদপুরের শেয়াল সে, কতবার গুলির মুখ থেকে মুরগি-হাঁস শিকার করেছে তার ঠিক নেই; শেয়ালের রাজা বললেই হয়; কিন্তু এই শীতকালে হাঁস-শিকার করতে আজ তার ঘাম ছুটে গেল! সারাদিন ধরে মোটাসোটা চিকচিকে

হাঁস দলে-দলে তার নাকের উপর দিয়ে যাওয়া-আসা করছে, অথচ একটাকেও সে ধরে খিদে মেটাতে পারছে না। সবচেয়ে তার লজ্জা—মানুষটাও তাকে ফাঁকি দিয়ে পালিয়েছে! আর তার দুর্দশার কথা সেই পোষা রাজহাঁসটাও জেনে গেল! দেশে-দেশে নিশ্চয়ই তারা চাঁদপুরের খেকশেয়ালের কীর্তি-কাহিনী রাষ্ট্র করে দেবেই দেবে।

ভোরে এই শেয়ালের গা চিকচিকে, ল্যাজ মোটা, রোঁয়াগুলো কেমন যেন সাটিনের মতো খয়েরি-কালো-শাদা ঝকঝক করছিল; কিন্তু বিকেলে তার পেটের চামড়া ঝুলে পড়েছে, গা ধুলোয়-ঘামে কাদা হয়ে গেছে, চোখ বিমিয়ে পড়েছে, জিভ চার-আঙুল বেরিয়ে পড়ে মুখে গোটানাল ভাঙছে। তাকে দেখে কে বলবে সকালের সেই দুরন্ত শেয়াল! সারাদিন ধরে কেবলি উড়ে-উড়ে হাঁসের দল তাকে এমনি নাকাল করেছে যে, বেচারা শেয়াল একেবারে হয়রান হয়ে পড়েছে; তার মাথার আর ঠিক নেই; কেবলি দেখছে যেন চোখের সামনে হাঁস ঘুরছে। সে গাছের তলায় সূর্যের আলো দেখে ভাবছে হাঁস; প্রজাপতি উড়লে হাঁস বলে লাফিয়ে ধরতে যাচ্ছে! যতক্ষণ দিনের আলো রইল চকা-নিকোবরের দল কিছু দয়া-মায়া না করে শেয়ালকে হয়রান করেই চলল। শেয়ালের তখন আর নড়বার শক্তি নেই, সে কেবল মাটির উপরে হাঁসের ছায়াগুলো থাবা দিয়ে দিয়ে আঁচড়াতে থাকল। হাঁসেরা যখন দেখলে শেয়ালটা মড়ার মতো শুকনো পাতার উপরে শুয়ে পড়ে হাঁপাতে লেগেছে, তখন তারা—“কেমন! কেমন! হাঁস ধরবে!” বলতে-বলতে চাঁদপুরের জঙ্গল ছেড়ে নালমুড়ির চরের দিকে চলে গেল।



হংপাল

ঝাউগাছের উপর থেকে খোঁড়া-হাঁস ঠোটে-করে রিদয়কে বাগদী-চরের থেকে একটু দূরে নালমুড়ির চরে নামিয়ে দিয়ে সারাদিন বুনো-হাঁসের দলের সঙ্গে শেয়ালকে নিয়ে ঝপ্পাটি আর দাতকপাটি খেলে বেড়াচ্ছে। ক্রমে সন্ধে হয়ে এল দেখে রিদয় ভাবছে, নিশ্চয়ই হাঁসেরা রাগ করে তাকে ফেলে গেছে, এখন কেমন করে সে বাড়ি যায়? আর কেমন করেই বা ঐ বুড়ো-আংলা চেহারা নিয়ে বাপ-মায়ের সঙ্গে দেখা করে? ঠিক এই সময় মাথার উপর ডাক দিয়ে হাঁসের দল উড়ে এসে নালমুড়িতে ঝুপঝুপ পড়েই জলে নেমে গেল। চরে মেলাই কাছিমের ডিম, রিদয় তারি একটা ওবেলা, একটা এবেলা খেয়ে পেট ভরিয়ে চুপচাপ শুয়ে পড়ল। এমনি সে-রাত কাটল। ভোর না হতে হাঁসের দল রিদয়কে নিয়ে আবার চলল। রিদয় দেখলে হাঁসেরা তাকে বাড়ি যাবার কথা বললে না। সেও সে-কথা চেপে গিয়ে চুপচাপ খোঁড়া-হাঁসের পিঠে চুপটি করে উঠে বসল।

লুসাই-হাঁসের ডানাটা শেয়ালের কামড়ে একটু জখম হয়েছে, কাজেই বুনো-হাঁসের দল আজ আর বেশি দূরে উড়ে গেল না। গোবরাতলির মাটির কেন্দ্রা 'নুড়িয়া কাসেলের' উপরটায় এসে দেখতে লাগল, সেখানে মানুষ আছে কি না। সেখানে শিকে-গাঁথা ফাটা-চটা কতকগুলো মাটির সঙ, পরী, সেপাই—এমনি সব। বাগানে মালী নেই, মালিকও নেই, কেবল একটা ভাঙা ফটকের মার্বেল-পাথরে কালি-দিয়ে-দাগা সাইনবোর্ডে, লেখা রয়েছে—“পালদিং অফ নুড়িয়া।” ঠিক তারি নিচে একটা ভাঙা পিপের মধ্যে বসে একটা রোগা, কানা, দেশী কুকুর পোড়ো কেন্দ্রায় পাহারা দিচ্ছে।

বুনো-হাঁসেরা আকাশ থেকে শুধালে—“ছপ্পড়টা কার? ছপ্পড়টা কার?”

কুকুরটা অমনি আকাশে নাক তুলে চোঁচিয়ে উঠল, ভেউ-ভেউ করে বললে—

“ছপ্পড় কী? দেখছ না এটা নুড়িয়ার কেল্লা—পাথরে গাঁথা! দেখছ না কেল্লার বুরুজ, তার উপরে ওই গোল-ঘর—সেখানে কামান-বসাবার ঘুলঘুলি, নিশেন ওড়াবার দাঙা। গবাক্ষ, বাতায়ন, দরশন-দরওজা। এসব দেখছ না!”

হাঁসেরা কিছুই দেখতে পেল না—না কামান, না ঘুলঘুলি, না গবাক্ষ, না বাতায়ন। কেবল একটা চিলের ছাতে একটা আকাশ-পিদিম দেবার বাঁশ দেখা গেল, তাতে এক-টুকরো গামছা-ছেঁড়া লটপট করছে! হাঁসেরা হো-হো করে হেসে বললে—“কই? কই?”

কুকুরটা আরো রেগে বললে—“দেখছ না, কেল্লার ময়দান যেন গড়ের মাঠ! দেখছ না, কেলিকুঞ্জ—সেখানে রানী থাকেন। দ্যাখো ওই হাম্মাম, সেখানে গোলাপজলের ফোয়ারা। দেখতে পাচ্ছ না বাগবাগিচা, আম-খাস, দেওয়ান-খাস?” হাঁসেরা দেখলে, পানাপুকুর, লাউ-কুমড়োর মাচা—এমনি সব, আর কিছু নেই।

কুকুর আবার ঠোঁটে বললে—“ঐ দ্যাখো ওদিকে গাছ-ঘর, মালীর ঘর, আর এইসব সুরকি-পাতা রাস্তার ধারে-ধারে পাথরের পরী, গ্যাস-লাইটের থাম, বাঁধা ঘাট, বার-দোয়ারি নাটমন্দির। এসব কি চোখে পড়ছে না যে বলছ ছপ্পড় কার? ছপ্পড়ে কখনো কেলিকানন, পুষ্পকানন, কামিনীকুঞ্জ থাকে? না, পাথরের পরী, ঘাটের সিঁড়ি থাকে? ঐ দ্যাখো রাজার কাচারি, ঐ হাতিশাল, ঘোড়াশাল, তোষাখানা। এসব কি ছপ্পড়ে থাকে? না ছপ্পড় কখনো দেখেছ? ছপ্পড় দেখতে হয়তো ওপাড়ার ওই জমিদারগুলোর বাড়ি দেখে এসে। আমার মনিব কি জমিদার? এরা মূর্খাভিষিক্ত। লেখাপড়ার ধার দিয়েও যায় না। ঘোড়া-রোগে এদের সবাই মরেছে। সেকালে এরা চীনের রাজা ছিল। এখনো দেখছ না ফটকে লেখা—‘পাল্‌দিং অফ নুড়িয়া!’ এই ছপ্পড়ের নহবতখানার চুড়ো দশক্রোশ থেকে দেখা যায়—এমনি ছপ্পড় এটা!”

কানা কুকুরটা ঘেউ-ঘেউ করে থামলে হাঁসেরা হাসতে-হাসতে বললে—“আরে মুখ্য, আমরা কি তোর রাজার কথা, না রাজবাড়ির কথা, না মাটির কেল্লার কথা শুধোচ্ছি? ওই ভাঙা ফটকের ধারে পোড়ো বাগানে ভাঙা মদের পিপেটে কার, তাই বল না!” এমন রঙ-তামাশা করতে-করতে হাঁসেরা নুড়িয়া ছাড়িয়ে সুরেশ্বরে—যেখানে প্রকাণ্ড ঠাকুরবাড়ির ধারে সত্যিকার বাগ-বাগিচা, দীঘি-পুকুরিণী, মাঠ-ঘাট রয়েছে, সেইখানে কুশ-ঘাসের গোড়া খেতে নামল। ওদিকে মেঘনা, এদিকে পদ্মা—এই দুই নদী যেখানে মিলেছে, সেই কোণটিতে হল সুরেশ্বর-মঠ। চারদিকে আম-বাগান, জাম-বাগান, ঠাকুরবাড়ি, অতিথিশালা, ভোগমন্দির, দোলমঞ্চ, আনন্দবাজার, রথতলা, নাটমন্দির, রন্ধনশালা, ফুল-বাগান, গোহাল-গোষ্ঠ, পঞ্চবটী, তুলসীমঞ্চ, রাসমঞ্চ, রামকুণ্ড, সীতাকুণ্ড, গোলকধাম, দেবদেবীস্থান—এমনি একটা পরগনা জুড়ে প্রকাণ্ড ব্যাপার! এরি এক-কোণে বন আর মাঠ। সেইখানে হাঁসেদের সঙ্গে রিদয় নেমেছে। কেন যে এত বেলা থাকতে এখানে হাঁসেরা এসে আড্ডা গেড়ে বসল, রিদয় তা বুঝলে না, ভেবেও দেখলে না, নিজের মনে বনে-বনে ঘুরে পাত-বাদাম আর শাক-পাতা কুড়িয়ে ছায়ায় খেলে বেড়াতে লাগল।

লুসাই-হাঁসের ডানা ভালো হওয়া পর্যন্ত হাঁসেরা সেখানে অপেক্ষা করবার মতলব করেছে! একদিন খোঁড়া-হাঁস দুটো শোল-মাছের ছানা এনে রিদয়কে দিয়ে বললে—

“খেয়ে ফ্যালো। মাছ না খেলে রোগা হবে।” রিদয় এবারে টপ-করে হাঁসের মতো সে-দুটো গিলে ফেললে। তারপর খোঁড়া-হাঁসের পিঠে চড়ে নানারকম খেলা চলল। কোনোদিন জলে বুনো-হাঁসেদের সঙ্গে সাঁতার-খেলা, কোনোদিন দৌড়াদৌড়ি, লুকোচুরি, হাঁসের লড়াই—এমনি সারাদিন ছোটোছুটি চেষ্টামেচি! এমন আনন্দে রিদয় জন্মে কাটায়নি। পড়াশুনো সব বন্ধ, একেবারে কৈলাস পর্যন্ত লম্বা ছুটি আর ছুট! খেলা শেষ হলে দুতিন-ঘণ্টা দুপুরবেলায় ধলেশ্বরীর ভাঙনের উপরে বসে জিরোনো; বিকালে আবার খেলা; আবার চান; সন্ধ্যাবেলা খেয়ে নিয়েই ঘুম। রিদয়ের খাবার ভাবনা গেছে, শোবারও কষ্ট মোটেই নেই। খোঁড়া-হাঁসের ডানায় এখন বেশ ভালো পালকের গদি পেতে সে বিছানা করে নিয়েছে, ঘুম পেলেই সেখান ঢোকে। কেবল রাত হলেই তার ভয় আসে, বুঝি কাল সকালে বাড়ি ফিরতে হয়! কিন্তু হাঁসেরা তার ফেরবার কথাই আর তোলে না। একদিন, দুদিন, তিনদিন হাঁসেরা সুরেশ্বরেই রইল; কোনোদিকে যাবার নামটি করলে না। রিদয়ও মনে ভরসা পেয়ে সুরেশ্বরের মন্দির, মঠ লুকিয়ে দেখে নিতে লাগল—চারদিক ঘুরে। চার-দিনের দিন চকা-নিকোবরকে কাছে আসতে দেখেই রিদয় ভাবলে—এইবার যেতে হল ফিরে! চকা গম্ভীর হয়ে তাকে শুধোলে—“এখানে খাওয়া-দাওয়া চলছে কেমন?”

রিদয় একটু হেসে বললে—“চলছে মন্দ নয়। তবে শীতকাল, ফল বড় একটা নেই।”

চকা তাকে সঙ্গে নিয়ে এক-ঝাড় কাঁচা বেত দেখিয়ে বললে—“বেত খেয়ে দ্যাখো দেখি, কেমন মিষ্টি!”

রিদয় বেত অনেকবার খেয়েছিল, আরো খাবার তার মোটেই ইচ্ছে নেই! কিন্তু চকার হুকুমে খেতে হল। খেয়ে দেখে মিষ্টি গুড়! ঠিক যেন আক চিবোচ্ছে!

চকা বললে—“কেমন, ভালো লাগল কি? গুরুমশায় খাওয়ান শুকনো বেত, তাই লাগে বিশ্রী। যাহোক, এখন বলি শোনো। এই বাগানে, বনে যে তুমি আজকাল একলাটি ঘুরে বেড়াতে আরম্ভ করেছ, এটা ভালো হচ্ছে না।”

রিদয় ভাবলে, এইবার যেতে হল রে!

চকা বলে চলল—“এই বনে তোমার কত শত্রু রয়েছে, তা জানো? প্রথম হচ্ছে শেয়াল, সে তোমার গন্ধে-গন্ধে ফিরছে, সুবিধে পেলেই ধরবে, তারপর ভোঁদড়, ভাম দুজনে আছে—যেখানে-সেখানে গাছের কোটরে ঢুকতে গেলে বিপদে পড়বে কোনদিন! জলের ধারে উদ্বেড়াল আছে—একলা চান করবার সময় সাবধান! যেখানে-সেখানে জড়ো-করা পাথরের উপরে বসতে যেও না, তার মধ্যে বেজি লুকিয়ে থাকতে পারে। শুকনো-পাতা-বেছানো জায়গা দেখলেই সেখানে গুতে যেয়ো না; পাতাগুলো নেড়ে, তলায় সাপ কি বিছে আছে কি না, দেখা ভালো। মাঠ দিয়ে যখন চল, তখন আকাশের দিকে কি একবার চেয়ে দেখ—সেখানে বাজ-পাখি, চিল কাক, শকুনি আছে কি না? সেটা একবার-একবার দেখে চলা মন্দ নয়। ফস-করে ঝোপে-ঝাড়ে উঠতে যেয়ো না; গেরো-বাজগুলো অনেক সময় সেখানে শিকার ধরতে লুকিয়ে থাকে। সন্ধ্যা হলে কান পেতে শুনবে, কোনোদিকে পোঁচা ডাকল কি না। পোঁচার এমন নিঃশব্দে উড়ে আসে যে টের পাবে না কখন ঘাড়ে পড়ল!”

তার এত শত্রু আছে শুনে রিদয় ভাবলে, বাঁচা তো তাহলে শক্ত দেখছি। সে চকাকে বললে—“মরতে ভয় নেই। তবে শেয়াল-কুকুরের কিংবা শকুনের খাবার হতে আমি রাজি নই। এদের হাত থেকে বাঁচবার উপায় কিছু আছে বলতে পার?”

চকা একটু ভেবে বললে—“বনের যত ছোট পাখি আর জন্তু এদের সঙ্গে ভাব করে ফেলবার চেষ্টা করো; তাহলে কাঠঠোকরা, হুঁদুর, কাঠবেরালি, খরগোশ, তালচড়াই, বুলবুলি, টুনটুনি, শ্যামা, দোয়েল, এরা তোমায় সময়মতো সাবধান করে দেবে; লুকোবার জায়গাও দেখিয়ে দেবে। আর দরকার হয় তো এইসব ছোট জানোয়ারেরা তোমার জন্যে প্রাণও দিতে পারে।”

চকার কথা-মতো সেই দিনই রিদয় এক কাঠবেরালির সামনে উপস্থিত—ভাব করতে। যেমন দৌড়ে রিদয় সেদিকে যাওয়া, অমনি কাঠবেরালির গিয়ে গাছে ওঠা; আর ল্যাজ-ফুলিয়ে কিচ-কিচ করে গালাগালি শুরু করা—“অত ভাবে আর কাজ নেই! তোমাকে চিনিনে? তুমি তো সেই আমতলির রিদয়! কত পাখির বাসা ভেঙেচ, কত পাখির ছানা টিপে মেরেছ। ফাঁদ পেতে, ধামা চাপা দিয়ে কত কাঠবেরালি ধরে খাঁচায় পুরেছ, মনে নেই? এখন আমরা তোমায় বিপদ থেকে বাঁচাব? এই ঢের যে বন থেকে আমরা এখনো তোমায় তাড়িয়ে মানুষের মধ্যে পাঠিয়ে দিচ্ছিনে! যাও আমাদের দ্বারা কিছু হবে না। সরে পড়ো বাসার কাছ থেকে।”

অন্য সময় হলে রিদয় কাঠবেরালিকে মজা দেখিয়ে দিত! কিন্তু এখন সে ভালোমানুষ হয়ে গেছে; আস্তে-আস্তে হাঁসকে এসে সব খবর জানালে! খোঁড়া-হাঁস বললে—“অত দৌড়ে কাঠবেরালের কাছে যাওয়াটা ভালো হয়নি। হঠাৎ কিছু-একটা এসে পড়লে সব জানোয়ারই ভয় পায়, রাগ করে। যখন জানোয়ারদের কাছে যাবে—সহজে, আস্তে, অদ্ভুতভাবে যাবে। হুটোপাটি করে কিংবা চুপিচুপি চোরের মতো গেলেই তাড়া খাবে। তোমার স্বভাব একটু ভালো হয়ে এসেছে; এমনি আর দিনকতক ভালোমানুষটি থাকলেই, ওরা আপনি তোমার সঙ্গে ভাব করবে। তুমি যদি তাদের উপকার কর, তবে তারাও তোমার সহায় হবে—বনের এই নিয়ম জেনে রাখো।”

রিদয় সারাদিন ভাবছে, কেমন করে সে বনের পশু-পাখিদের কাজে লাগতে পারবে, এমন সময় খবর হল, বেতগাঁয়ের একটা চাষা কাঠবেরালের বৌকে ধরে খাঁচায় বন্ধ করেছে; আর সে-বেচারার আটদিনের বাচ্চাগুলি না-খেয়ে মরবার দাখিল! খোঁড়া-হাঁস রিদয়কে বললে—“দ্যাখো, যদি কাঠবেরালির উপকার করতে চাও তো এই ঠিক সময়।” রিদয় অমনি কোমর বেঁধে সন্ধানে বেরুল।

লক্ষ্মীবার পিঠে-পার্বণের দিন কাঠবেরালের বৌ-চুরি হল সুরেশ্বরে, আর শনিবার বাগবাজারের ছাপার কাগজে বার হল সেই খবর। কাগজওয়ালা-ছোঁড়াগুলো গলিতে-গলিতে হেঁকে চলল—

সুরেশ্বরের মজা ভারি—কাঠবেরালের বৌ চুরি!

বুড়ো-আংলা মানুষ এল, দুটো বাচ্চা দিয়ে গেল।

মহন্ত ঠাকুর বড় দয়াল!

খাঁচা খুলে, ছেড়ে দিলে বাচ্চা-সমেত কাঠবেরাল ।

মজার খবর এক পয়সা—পড়ে দ্যাখো এক পয়সা ।

কাণ্ডটা হয়েছিল এই : কাঠবেরালের বৌটি ছিল একেবারে শাদা ধপধপে; তার একটা রোঁয়াও কালো ছিল না! চোখ-দুটি মানিকের মতো লাল টুকটুকে, পাগুলি গোলাপি, এমন কাঠবেরালি আলিপুরেও নেই! এ এক নতুনতর ছিষ্টি! গাঁয়ের ছেলে-বুড়ো, রেল-কোম্পানির সায়েবসুবো তাকে ধরতে কত ফাঁদই পেতেছে, কিন্তু এ-পর্যন্ত কাঠবেরালি ধরা দেয়নি । পোষ-পার্বণের দিন বাদামতলি দিয়ে আসতে-আসতে এক চাষা এই কাঠবেরালিকে টোকা চাপা দিয়ে হঠাৎ কেমন করে পাকড়াও করে ঘরে এনে একটা বিলিতি হুঁদুরের খাঁচায় বন্ধ করলে । পাড়ার লোক—ছেলে-বুড়ো, এই আশ্চর্য কাঠবেরালি দেখতে দলে-দলে ছুটে এল । এক ডোম তার জন্যে এক চমৎকার খাঁচা-কল তৈরি করে এনে দিলে । খাঁচার মধ্যে শোবার খাট, দোলবার দোলনা, দুধের বাটি, খাবার খৈ রাখবার ঝাঁপি, বসবার চৌকি—এমনি সব ঘর-কন্নার ছোট ছোট সামগ্রী দিয়ে সাজানো । সবাই ভাবলে, এমন খাঁচায় কাঠবেরালি সুখে থাকবে—খেলে বেড়াবে সারাদিন, দোলনায় দুলবে আর খই-দুধ খেয়ে মোটা হবে! কিন্তু কাঠবেরালি-বৌ চুপটি করে মুখ লুকিয়ে খাঁচার কোণে বসে রইল আর থেকে-থেকে কিচ-কিচ করে কাঁদতে থাকল । সারাদিন সে কিছু মুখে দিলে না, দোলনাতেও দুললে না, চৌকিতেও বসল না, খাটেও গুল না; কেবলি ছটফট করতে লাগল আর কাঁদতে থাকল ।

সুরেশ্বরের পূজা দেবার জন্যে চাষার বৌ সেদিন মালপো ভাজছিল আর সব পাড়ার মেয়েরা পিঠে-পার্বণের পিঠে গড়ছিল । রান্নাঘরে ভারি ধুম লেগে গেছে! উনুন জ্বলছে; ছেলেমেয়েরা পিঠে ভাজার ছ্যাকছ্যাক শব্দ পেয়ে সেদিকে দৌড়েছে । চাষার বৌ ঠাকুরের ভোগ মালপোগুলো কেবলি পুড়ে যাচ্ছে কেন, সেই ভাবনাতেই রয়েছে । ওদিকে উঠানের বাইরে বেড়ার গায়ে কাঠবেরালির খাঁচাটার দিকে কী হচ্ছে, কেউ দেখছে না । চাষার দিদিমা বুড়ি, সে আর নড়তে পারে না, দাওয়ায় মাদুর পেতে বসে সেই কেবল দেখছে—রান্নাঘরের আলো গিয়ে ঠিক কাঠবেরালির খাঁচার কাছটিতে পড়েছে, আর সারা-সন্ধে কাঠবেরালিটা খাঁচার মধ্যে খুটখাট ছটফট করে বেড়াচ্ছে । এই খাঁচার পাশেই গোয়াল, তার কাছেই সদর দরজা—খোলা । বুড়ি পষ্ট দেখলে বুড়ো-আঙুলের মতো একটি মানুষ উঠানে ঢুকল । যক্ দেখলে ধনদৌলত বাড়ে, বুড়ি সেটা জানে, কাজেই বুড়ো-আংলাকে দেখে সে একটুও ভয় পেল না । বুড়ো-আংলা বাড়িতে ঢুকেই কাঠবেরালির খাঁচাটার দিকে ছুটে গেল; কিন্তু খাঁচাটা উঁচুতে বুলছে; কাছে একটা পাঁকাটি ছিল, বুড়ো-আংলা সেইটে টেনে খাঁচায় লাগিয়ে সিঁড়ির মতো সোজা কাটি-বেয়ে খাঁচায় চড়ে খাঁচার দরজা ধরে খোলবার চেষ্টা করতে লাগল । বুড়ি জানে খাঁচার তালা বন্ধ, সে কাউকে না ডেকে চুপ করে দেখতে লাগল—কী হয়! কাঠবেরালি বুড়ো-আংলার কানের কাছে মুখ নিয়ে ফিসফিস করে কী যেন বললে; তারপর বুড়ো-আংলা কাটি-বেয়ে নিচে নেমে চোঁচা দৌড় দিলে বনের দিকে । বুড়ি ভাবছে যক্ আর আসে কি না, এমন সময় দেখলে বুড়ো-আংলা ছুটতে-ছুটতে আবার

খাঁচার কাছে দৌড়ে গেল—হাতে তার দুটো কী রয়েছে। বুড়ি তা দেখতে পেলে না, কিন্তু এটুকু সে পষ্ট দেখলে যে বুড়ো-আংলা একটা পোঁটলা মাটিতে রেখে আর-একটা নিয়ে খাঁচার কাছে উঠল; তারপর এক হাতে খাঁচায় কাটি ফাঁক করে জিনিসটা খাঁচার মধ্যে গলিয়ে দিয়ে, মাটি থেকে অন্য জিনিসটা নিয়ে আবার তেমনি করে খাঁচায় দিয়ে দৌড়ে বেরিয়ে গেল।

বুড়িআর চুপ করে বসে থাকতে পারল না, সে ভাবলে যক্ বোধ হয় তার জন্যে সাত-রাজার ধন মানিক-জোড় রেখে পালাল। খাঁচাটা খুঁজে দেখতে বুড়ি উঠল। বুড়ির কালো-বেড়ালও এতক্ষণ খাঁচার দিকে নজর দিচ্ছিল, সেও উঠে অন্ধকারে গা-ঢাকা হয়ে দাঁড়াল কী হয় দেখতে। বুড়ি পৌষমাসের হিমে উঠোন দিয়ে চলেছে, এমন সময় আবার পায়ের শব্দ, আবার বুড়ো-আংলা হাতে দুটো কী নিয়ে। এবারে বুড়ো-আংলার হাতের জিনিস কিচ-কিচ করে ডেকে উঠল। বুড়ি বুঝলে যক্ কঠাবেরালির ছানাগুলিকে দিতে এসেছে—তাদের মায়ের কাছে। দিদিমা উঠানে দাঁড়িয়ে দেখলেন, যক্ আগের মতো খাঁচার কাছে গেল, কিন্তু বেড়ালের চোখ অন্ধকারে জ্বলছে দেখে, সে যেখানকার সেইখানেই দাঁড়িয়ে চারিদিক দেখতে লাগল ছানাদুটি বুকে নিয়ে। উঠোনে বুড়িকে দেখে ছুটে এসে তার হাতে একটি ছানা দিয়ে বুড়ো-আংলা আগের মতো কাটি-বেয়ে একটির পর একটি ছানাকে খাঁচায় পুরে দিয়ে বুড়িকে পেন্নাম করে চলে গেল।

বুড়ি ঘরে এসে সবার কাছে এই গল্প করলে, কিন্তু কেউ সেটা বিশ্বাস করতে চাইলে না—দিদিমা স্বপন দেখেছে বলে উড়িয়ে দিলে। কিন্তু বুড়ি বলতে লাগল—“ওরে তোরা দেখে আয় না!”

সকালে সত্যি দেখা গেল চারটে ছানাকে নিয়ে কাঠবেরালি দুধ খাওয়াচ্ছে। এমন ঘটনা কেউ দেখেনি। সুরেশ্বরের মোহন্ত পর্যন্ত এই আশ্চর্য ঘটনা দেখতে হাতি চড়ে চাষার বাড়ি উপস্থিত। ওদিকে চাষার বৌ যত পিঠে সিদ্ধ করে, সবই পুড়ে ছাই হয়ে যায়, সুরেশ্বরের মালপো-ভোগও হয় না, তখন মোহন্ত পরামর্শ দিলেন—“ওই কাঠবেরালি নিশ্চয় সুরেশ্বরী, নয় আর-কোনো দেবী, ওকে ছোনা-পোনা সুদ্ব বন্ধ করেছে, হয়তো সুরেশ্বর তাই রাগ করেছেন। না হলে মালপো-ভোগ পিঠে-ভোগ হঠাৎ পুড়েই বা যায় কেন? যাও, এখনি ওঁদের যেখানে বাসা, সেইখানে দিয়ে এসো। না হলে আরো বিপদ ঘটতে পারে!”

চাষা তো ভয়ে অস্থির! গ্রামসুদ্ব কেউ আর খাঁচায় হাত দিতে সাহস পায় না। তখন সবাই মিলে দিদিমাকে সেই খাঁচা নিয়ে বনে কাঠবেরালির বাসায় পাঠিয়ে দিলে। বুড়ি যেখানকার জিনিস সেখানে রেখে, আসবার সময় রাস্তার মাঝে একটা মোহর পেয়ে গেল। ‘যতো ধর্ম স্ততো জয়’ বলে খবরের কাগজের সম্পাদক খবরটা শেষ করলেন। এই বুড়ো-আংলাটি কিনি—লোকে তাই নিয়ে মাথা ঘামাতে লাগল সুরেশ্বরে, বাগবাজারে, ফরিদপুরে, যশোহরে, ময়মনসিংহে, আগরতলায়, আসামে, কাছাড়ের!

এই ঘটনার দুদিন পরে আর-এক কাণ্ড! গঙ্গা আর ব্রহ্মপুত্র যেখানে এক হয়েছে, সেইখানে আড়ালিয়ার চর। বুনো-হাঁসের সঙ্গে রিদয়কে নিয়ে খোঁড়া-হাঁস সেই চরে চরতে নামল! চরটা কেবল বালি, মাঝে-মাঝে ছোট-ছোট ঝাঁট, আর এখানে-ওখানে

শুকনো ঘাস। চরের একদিকে আড়ালিয়া গ্রাম। হাঁসরা চরছে, এমন সময় চরের উপরে কতকগুলো জেলের ছেলে খেলতে এল। মানুষ দেখেই চকা হাঁক দিলে, আর অমনি সব বুনো-হাঁস ডানা-মেলে উড়ে পড়ল। কিন্তু খোঁড়া-হাঁস ছেলে দেখে একটুও ভয় পেলো না; বরং গলা চড়িয়ে বুনো-হাঁসদের বললে—“ছেলে দেখে ভয় কী?”

রিদয় হাঁসের পিঠ থেকে নেমে একটা ঝাউতলায় বসে ঝাউফুল কুড়িয়ে মার্বেল খেলছে, ছেলেগুলো কাছে আসতেই সে একবার শিস দিয়ে খোঁড়াকে সাবধান করে একটা ঘাস-বনে লুকিয়ে পড়ল। কিন্তু খোঁড়ার আজ কী যে হল, সে যেমন চরছিল তেমনি চরে বেড়াতে লাগল। ছেলে-দুটো একটা বালির টিপি ঘুরে একেবারে দুদিক থেকে হাঁসকে তাড়া করলে! কেমন করে যে তারা এত কাছে হঠাৎ এসে পড়ল, ভেবে না পেয়ে খোঁড়া একেবারে হতভম্ব! উড়তে যে জানে তা মনেই এল না। সে ক্রমাগত দৌড়ে পালাবার চেষ্টা করতে লাগল। তারপর একটা ডোবার কাছে গিয়ে খোঁড়া ধরা পড়ে গেল।

রিদয়ের প্রথমে মনে এল যে ছুটে গিয়ে ছেলে-দুটোকে খাবড়া মেরে হাঁসটা কেড়ে নেয়, কিন্তু তখন মনে পড়ল, সে ছোট হয়ে গেছে! তখন সে রেগে বসে-বসে কেবলি বালি খুঁড়তে লাগল। এদিকে খোঁড়া ডাকছে—‘বুড়ো-আংলা ভাই, এসো লক্ষ্মীটি, আমায় বাঁচাও।’

“ধরা পড়ে এখন বাঁচাও!”—বলে রিদয় ছেলে-দুটোর সঙ্গে দৌড়ল। ছেলে-দুটো হাঁস নিয়ে একটা নালা পেরিয়ে চর ছেড়ে গ্রামে ঢুকল।

রিদয় আর তাদের দেখতে পেলো না। নালায় অনেক জল। রিদয় অনেকটা ঘুরে তবে একটা শুকনো-গাছের ডাল বেয়ে ওপারে উঠে হাঁসকে খুঁজতে মাটির উপর ছেলেদের পায়ের চিহ্ন ধরে এগিয়ে চলল। একটা চৌমাথায় দেখা গেল, ছেলে-দুটো দুদিকে গেছে। কোন পথে যাওয়া যায় রিদয় ভাবছে, এমন সময় বাঁকের রাস্তায় একটা হাঁসের পালক রয়েছে দেখে রিদয় বুঝলে, হাঁস এই পথে গেছে—পালক ফেলতে-ফেলতে, যাতে সে সন্ধান পায় সেইজন্যে।

রিদয় পালকের চিহ্ন ধরে দুটো মাঠ পেরিয়ে গ্রামের একটা সরু গলি পেলো। গলির মোড়ে একটা মন্দির। হাঁস কোথায় দেখা নেই, মন্দিরের খিলানের উপরে লেখা—“হংসেশ্বরী!” আর তারি উপরে মাটির গড়া এক হাঁস। রিদয় রাস্তার মাঝে দাঁড়িয়ে সেই দিকে চেয়ে আছে, এদিকে পিছনে প্রায় একশো লোক জমা হয়েছে—নাকে তিলক, কপালে ফোঁটা, নেড়া-মাথা বৈরিগীর দল! রিদয় যেমনি ফিরেছে অমনি সবাই মাটিতে দণ্ডবৎ হয়ে প্রণাম করে বললে—“জয় প্রভু বামনদেব, ঠাকুর কৃপা করো!”

বামন কে, রিদয় তা জানত না, কিন্তু প্রণামের ঘটনা দেখে সে বুঝলে, সবাই তাকে দেবতা ভেবেছে। রিদয় অমনি গম্ভীর হয়ে বললে—“তোমরা আমার হাঁস চুরি করেছ, এখন এনে দাও। না হলে হংসেশ্বরীর কোপে পড়ে যাবে।”

সবাই মুখ চাওয়া-চাওয়ি করতে লাগল। তখন হংসেশ্বরীর পাণ্ডা গল-বস্তুর হয়ে বললে—“ঠাকুর, হাঁস কোথায় আছে বলে দিন, এখন এনে দিচ্ছি!”

রিদয় রেগে বলে উঠল—“কোথায় জানলে কি তোমাদের আনতে বলি? এই গ্রামের দুটো ছেলে তাকে নিয়ে এসেছে—এই দিকে।”

এই কথা হচ্ছে এমন সময় মন্দিরের পিছন দিকে হাঁসের ডাক শোনা গেল। বেচারা প্রাণপণে চোঁচাচ্ছে! রিদয় দৌড়ে সেদিকে গিয়ে দেখে একটা ঘরের উঠোনে এক বুড়ি খোঁড়া-হাঁসকে দুই হাঁটুতে চেপে ধরে ডানা কেটে দেবার উদ্যোগ করছে—দুটো পালক কেটেছে, আর দুটো মুঠিয়ে ধরে কাটবার চেষ্টায় আছে। হঠাৎ বুড়ো-আংলা-রিদয়কে দেখে বুড়ি একেবারে হাঁ হয়ে গেল! সেই সময়ে যত নেড়ানেড়ির দল ছুটে এসে হৈ-হৈ করে বুড়ির হাত থেকে খোঁড়া-হাঁস ছাড়িয়ে নিলে। রিদয় হাঁসের উপরে চড়ে বসল আর অমনি রাজহাঁস তাকে নিয়ে আকাশে মিলিয়ে গেল।

বৈরিগীর দল সেই হাঁসের পালক হংসেশ্বরীর পরমহংস-বাবাজীর কাছে হাজির করে দিলে। তিনি পালক-কটি একটা হাঁড়িতে রেখে খবরের কাগজে বিজ্ঞাপন দিলেন—“অভূতপূর্ব ঘটনা! হংসেশ্বরীর রাজহংস স্বশরীরে বামনদেবকে নিয়ে উপস্থিত হয়ে দুটি পালক রক্ষা করে গেছেন। সেজন্যে একটি সোনার কৌটার প্রয়োজন। হিন্দুমাত্রেরই এই বিষয়ে মুক্তহস্ত হওয়া উচিত। চাঁদা আমার কাছে মঃ অঃ করিয়া পাঠাইবেন। ইতি সুরেশ্বরের পরমহংস বাবাজী।”

মানুষদের মধ্যে যেমন খবরের কাগজ, পাখিদের মধ্যে তেমন খবর রটাবার জন্য পাখি আছে। কোথাও কিছু নতুন কাণ্ড হলেই সেই জায়গাটার উপরে প্রথমে কাক-চিল জড়ো হয়, তারপর তাদের মুখে এ-পাখি, এ-পাখির মুখে ও-পাখি—এমনি এ-বন, সে-বন, এ-দেশ, সে-দেশে দেখতে-দেখতে খবর রটে যায়।

কাঠবেরালির কথা আর খোঁড়া-হাঁস উদ্ধারের কথা রিদয় ফিরে আসার পূর্বে হাঁসের দলে, বনে-জঙ্গলে, জলে-স্থলে কোনো জানোয়ারের জানতে আর বাকি রইল না। গাছে-গাছে তাল-চড়াই, গাং-শালিক—এরা সুরে-তালে রিদয়ের কীর্তি-কথা টেঁড়া-পিটিয়ে বলে বেড়াতে লাগল :

শুন এবে অবধান পশুপক্ষিগণ ।
 বুড়ো-আংলা মহাকাব্য করি বিবরণ ॥
 কাঠবেরালি রামদাস তাহারে উদ্ধারি ।
 বীরদাপে চলে যথা রাজ হংসেশ্বরী ॥
 হাঁসের পালক দুটা কেটে নিল বুড়ি ।
 যাহে লেখা যায় মহাকাব্য বুড়ি-বুড়ি ॥
 হাঁসের দুর্দশা দেখি আংলা বুড়ো ধায় ।
 হংসেশ্বরী ছাড়ি বুড়ি পালায় ঢাকায় ॥
 মোহন্ত তুলিয়া নিল হংসের কলম ।
 সোনা চাহি বলি তাহে লেখে বিজ্ঞাপন ॥
 তালচটক তাল ধরে গাংশালিকে কয় ।
 সুবচনী হাঁস নিয়ে চলিল রিদয় ॥
 খোঁড়া-হাঁসেরে লইয়া, খোঁড়া-হাঁসেরে লইয়া
 রচিলাম মহাকাব্য যতন করিয়া ।
 আংলা বিজয় নামে কাব্য চমৎকার ।

গোটা দুই শ্লোক তারি দিনু উপহার ॥

সকলে শুনহ আর শুনহ অন্যকে ।

ক্ষীর হতে নীর পিয়ে ধন্য হোক লোকে ॥

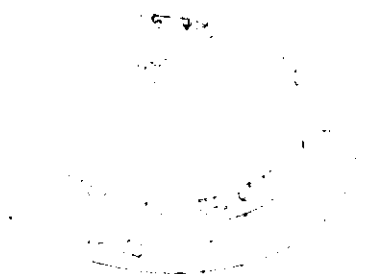
ইতি আংলা বিজয় মহাকাব্যে প্রথম সর্গঃ ।

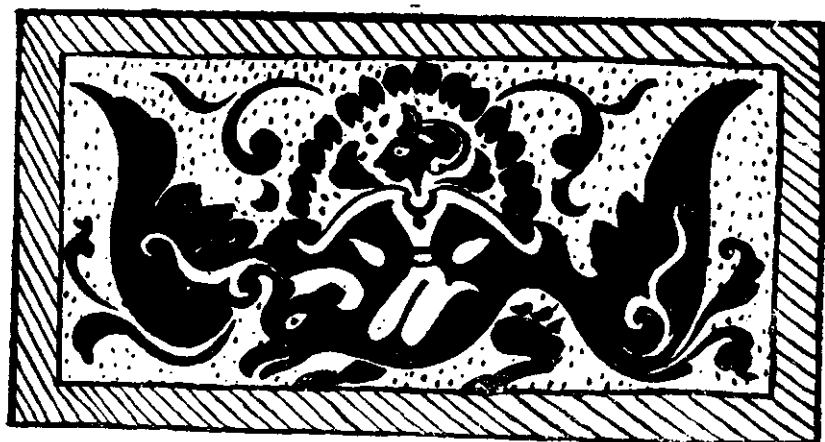
আজ চকা-নিকোবর ভারি খুশি । সে রিদয়কে কুর্নিশ করে বললে—“একবার নয়, বারবার তিনবার তুমি দেখিয়েছ যে পশু-পাখিদের তুমি পরম বন্ধু! প্রথমে শেয়ালের মুখ থেকে বুনো-হাঁস ‘লুসাইকে’ উদ্ধার, তার পরে কাঠবেরালির উপকার, সব-শেষে পোষা-হাঁসকে বাঁচানো । তোমার ভালোবাসায় আমরা কেনা হয়ে রইলেম । আর তোমায় আমরা ফেরাতে চাইনে । তোমার যদি মানুষ হতে ইচ্ছে হয় তো বলো আমি নিজে গণেশ-ঠাকুরকে তোমার জন্যে ‘রেকমেন্ডেসন’ পাঠিয়ে দিচ্ছি ।”

রিদয়ের আর মেটেই মানুষ হতে ইচ্ছে ছিল না । হাঁসেদের সঙ্গে দেশ-বিদেশ দেখতে-দেখতে বড় মজাতেই সে দিন কাটাচ্ছে, তবু মানুষ-হবার রেকমেন্ডেসনখানা না নিলে চকা পাছে কিছু মনে করে, সেই ভয়ে বললে—“মানুষ হবার সময় হলে আমি তোমাকে জানাব । এখন কিছুদিন তোমাদের সঙ্গে থাকতে আমি ইচ্ছে করেছি ।”

চকা ঘাড় নেড়ে বললে—“সেই ভালো ; যখন ইচ্ছে হবে বোলো, আমি সত্টিফিকিট দিয়ে তোমাকে গণেশের কাছে পাঠাব । এখন হাঁসের দলে হংসপাল হয়ে থাকো ।” বলে চকা রিদয়ের মাথাটা ঠোট দিয়ে চুলকে দিলে! অমনি চারিদিকে বুনো-হাঁস রিদয়ের নতুন উপাধি ফুকরে উঠল—“হংপাল! হংপাল!”

বনের পাখিরা প্রতিধ্বনি করলে—“হি-রি-দ-য় হংসপাল!”





টু-সোনাটা-ঘুম

সুরেশ্বর ছেড়ে বৃষ্টি আরম্ভ হল। এতদিন রোদে কাঠ ফাটছিল। সকালে যখন হাঁসের দল যাত্রা করে বার হল তখন আকাশ যেন পরিষ্কার কিন্তু ব্রহ্মপুত্র নদের রাস্তা ধরে যতই তারা উত্তর-মুখে এগিয়ে চলল, ততই মেঘ আর কুয়াশা আর সঙ্গে-সঙ্গে বৃষ্টি দেখা দিলে! হাঁসের ডানায় পাহাড়ের হাওয়া লেগেছে, তারা মেঘ কাটিয়ে হু-হু করে চলেছে; মাটির পাখিদের সঙ্গে রঙতামাশা করে বকতে-বকতে চলবার আর সময় নেই, তারা কেবলি টানা সুরে ডেকে চলেছে—“কোথায়, হেথায়, কোথায়, হেথায়।”

হাঁসের দলের সাড়া পেয়ে ব্রহ্মপুত্রের দুপারের কুঁকড়ো ঘাঁটিতে-ঘাঁটিতে জানান দিতে শুরু করলে। পূব পারের কুঁকড়ো হাঁকলে—“সাতনল, চন্দনপুর, কোমিল্লা, আগরতলার রাজবাড়ি, টিপারা, হীলটিপারা!” পশ্চিম পারের কুঁকড়ো ডাকলে—“মীরকদম, নারায়ণগঞ্জ, ঢাকার নবাববাড়ি, মুড়াপাড়া।” পূবে ডাকলে—“ভেংচার চর,” পশ্চিমে ডাকলে—“চর ভিন-দোর।”

হাঁসেরা তেজে চলেছে, এবার ছোট-ছোট গ্রাম, নদীর আর নাম শোনা যাচ্ছে না, বড়-বড় জায়গার কুঁকড়ো ডাকছে—“পাবনা, রামপুর-বোয়ালিয়া, বোগরা, রাজসাহি, দিনাজপুর, রংপুর, কুচবেহার, জলপাইগুড়ি, শিলিগুড়ি!” পূবের কুঁকড়ো অমনি ডেকে বললে—“খাসিয়া-পাহাড়, গারো-পাহাড়, জৈতিয়া-পর্বত, কামরূপ।”

বুনো-হাঁসের দল পাহাড়-পর্বত অনেক দেখেছে, শিলিগুড়ি থেকে হিমালয় ডিঙিয়ে মানস-সরোবরে চট করে গিয়ে পড়া গেলেও তারা শিলিগুড়ি থেকে ডাইনে ফিরে, ফুলচারি, হাড়গিলের-চর, ধুবড়ি, শিলং গৌহাটি, দিব্রুগড়, কামরূপ হয়ে যাবার

মতলবই করলে, কেননা, দার্জিলিঙ হয়ে যাওয়া মানে ঝড়-ঝাপটা, বরফের উপর দিয়ে যাওয়া, আর কামরূপের পথে গেলে ব্রহ্মপুত্র-নদের দুধারে নগরে গ্রামে চরে জিরিয়ে যাওয়া চলে।

রিদয় কিন্তু বৈকে বসল, এত কাছে এসে দার্জিলিঙ যদি দেখা না হল তো হল কী? খোঁড়া-হাঁসের যদিও পায়ে বাত তবু রিদয়ের কথাতেই সে সায় দিয়ে বসল! ঠিক এই সময় শিলিগুড়ি থেকে ছোট রেল বাঁশি দিয়ে পাহাড়ে উঠতে আরম্ভ করলে, রিদয় আকাশের উপর থেকে দেখলে, যেন শাদা-কালো একটি গুটিপোকা ঐকৈবৈকে পাহাড়ের গা বেয়ে চলেছে—হাঁসে চড়া রিদয়ের অভ্যেস, রেল এত টিমে চলেছে দেখে ভেবেছিল, গুগুলির মতো কত বছরই লাগবে ওটার দার্জিলিঙ পৌছতে!

রিদয় চকাকে শুধালে, “ওটা কতদিনে দার্জিলিঙ পৌছবে?”

চকা উত্তর দিলে—“এই সকাল আটটায় ছাড়ল, বেলা তিনটে-চারটেতে পৌছে যাবে!”

“আর আমরা কতক্ষণে সেখানে যেতে পারি?”—রিদয় শুধালে।

চকা উত্তর করলে—“যদি রাস্তায় কুয়াশা, হিম না পাই, তবে বড় জোর এক-ঘণ্টায় ‘ঘুম-লেকে’ গিয়ে নামতে পারি, সেখান থেকে কিছু খেয়ে নিয়ে সিঞ্চল, কালিম্পং, লিবং সন্দকফু থেকে কাঞ্চনজঙ্ঘা দেখে কার্শিয়া টুং-সোনাদা হয়ে আবার ঘুমেতে নেমে একটু জল খেয়ে একচোট ঘুমিয়ে নিয়ে বেলা সাড়ে এগারোটা নাগাদ দার্জিলিঙ-ক্যালকাটা রোডের ধারে আলুবাড়ির গুফার কাছটায় তোমায় নামিয়ে দিতে পারি। আমরা তিব্বতের হাঁস, তার ওদিকে আর আমাদের যাবার যো নেই—গেলেই গোরারা গুলি চালাবে।”

এত সহজে দার্জিলিঙ দেখা যাবে জেনে খোঁড়া-হাঁস পর্যন্ত নেচে উঠল। চকা তখন বললে—“এতবড় দল নিয়ে তো পাহাড়ে চলা দায়, ছোট রেলের মতো আমাদেরও দল ছোট করে ফেলা যাক। বড়-দলটা নিয়ে আগুমানি কামরূপে হাড়গিলে-চরে গিয়ে অপেক্ষা করুক; আর আমি, খোঁড়া, হংপাল, কাটচাল, নানাকৌড়ি, চলো দার্জিলিঙ দেখে আসি।”

শিলিগুড়ি থেকে হাঁসের দল দুই ভাগ হয়ে চলল, ঠিক সেই সময় গুঁড়ি-গুঁড়ি বৃষ্টি নামল। কাঠফাটা রোদের পরে নতুন বৃষ্টি পেয়ে মাটি ভিজে উঠেছে, পাতা গজিয়ে উঠেছে, বনের পাখিরা আনন্দে উলু উলু দিয়ে কেবলি বলতে লেগেছে, বৃষ্টির গান :

বিষ্টি পড়ে টাপুর-টাপুর
বাজছে বাদল গামুর-গুমুর
ডাল-চাল আর মক্কা-মসুর
ফোঁটায়-ফোঁটায় নামে—
আকাশ থেকে নামে—
জলের সাথে নামে—
ঘরে-ঘরে নামে—
টাপুর-টাপুর গামুর-গুমুর
গামুর-গুমুর টাপুর-টাপুর।

‘তিষ্ঠা’ নদীর কাছে এসে হাঁসেরা গুনলে, নদীর দুপারে সবাই বলছে :

মেঘ লেগেছে কালা-ধলা
বইছে বাতাস জলা-জলা
বরফ-গলা পাগলা-ঝোড়া
গুননা ধুয়ে আসে
তিষ্ঠা নদীর পাশে—
ঝাপুর-ঝাপুর ছাপুর-ছুপুর
ছুপুর-ছুপুর-ঝাপুর-ঝাপুর।

নতুন জল-বাতাস পেয়ে পৃথিবী জুড়ে সবাই রোল তুলেছে, আকাশের হাঁসেরাই বা চুপ করে থাকে কেমন করে, তারা পাহাড়ের গায়ে সিঁড়ির মতো ধাপে-ধাপে আলু, পেঁয়াজ, শাক, সবজি ক্ষেতগুলোর ধার দিয়ে ডাকতে-ডাকতে চলল—“রসা জমি ধসে পোড়ো না, বসে থেকো না, ফসল ধরাও, ফল ধরাও, নতুন বীজে ফল ধরাও।”

পাগলা-ঝোড়ার কাছ বরাবর এসে একখানা প্রকাণ্ড মেঘ হাঁসদের সঙ্গে নিয়ে উত্তর-মুখে উড়ে চলল। কলকাতার এক বাবু পাহাড়ে রাস্তায় রবারের জুতো রবারের ওয়াটারপ্রুফ পরে বিষ্টির ভয়ে নাকে-কানে গলাবন্ধ জড়িয়ে মোটা এক চুরুট টানতে-টানতে ছাতা খুলে হাঁপাতে-হাঁপাতে চড়াই ভেঙে তাড়াতাড়ি বাড়ি-মুখো হয়েছেন দেখে হাঁসেরা রঙ্গ জুড়লে :

জল চাও না, চাও কিন্তু খাসা পাঁউরুটি
হয় না তো সিটি!
জলের ভয়ে তাড়াতাড়ি খুললে কেন ছাতা!
জল না হলে গাছে-গাছে ফলে পেঁপে আতা?
জল না পেলে কোথায় পেতে আলু পটোল চা!
হত নাকো রবার-গাছ কিসে ঢাকতে পা?
বিষ্টি নইলে ছিষ্টি নষ্ট, সেটা মনে রেখো—
মেঘ দেখলে নাক তোলো তো উপোস করে থেকো!
সকালে পাবে না চা দুপুরেতে ভাত—
বিকলে পাবে না ফল, রাতে জলবে আঁত
না পাবে নদীতে মাছ ক্ষেতেতে ফসল—
ফোঁটা-ফোঁটা ঝরবে তখন তোমার চোখে জল।

বাবু একবার ছাতার মধ্যে থেকে আকাশে চেয়ে দেখলেন, রিদয় টুপ করে তার নাকের উপর একটা শিল ফেলে হাততালি দিতে-দিতে হাঁসের পিঠে উড়ে চলল। মেঘখানা শিল বর্ষাতে-বর্ষাতে হাঁসের দলের পিছনে-পিছনে আসছে, আর হাঁসেরা সারি দিয়ে আগে-আগে যেন মেঘখানাকে টেনে নিয়ে চলেছে—আকাশ দিয়ে পুষ্পকরথের মতো! তিন-দরিয়ার অনেক উপরে দুই পাহাড়ের দেয়াল যেন কেল্লার বুরুজের মতো সোজা আকাশ ঠেলে উঠেছে একেবারে মেঘের কাছে, তারি গায়ে পাগলা-ঝোড়া ঝরনা শাদা পৈতের মতো পাহাড়ের গা বেয়ে গাছপালার মধ্যে দিয়ে

ঝুলে পড়েছে—এই পাহাড়ের দেওয়াল ডিঙিয়ে হাঁসেরা কার্শিয়ংয়ের মুখে চলল—
পাংখাবাড়ি থেকে কার্শিয়ং দুধারে ঝরনা আর চা-বাগান সবজিক্ষেত, থাকে-থাকে
পাহাড়ের গায়ে পাহাড়ি বস্তি, সাহেবদের কুঠি, কার্শিয়ং শহরটা যেন আর-একটা
ঝরনার মতো দেখা যাচ্ছে—পাহাড়ি গোলাপ গঁদা গাছ-আগাছায় কুঁড়ি ধরেছে।

বাঁ-ধারে দূরে কালো-কালো পাহাড়ের শিখরে বরফের পাহাড় যেন দুধের ফেনার
মতো উথলে পড়েছে। এদল বাঙালী বৌ ছেলে-পুলে নিয়ে কার্শিয়ংয়ের ইন্সটিশনের
উপরের রাস্তায় হাওয়া খেতে বেরিয়েছে—গিনি সবুজ অসুখ থেকে উঠেছেন, তিনি
ছাতি মাথায় দাণ্ডি চেপে চলেছেন, কর্তা লাঠি ধরে সঙ্গে, পিছনে চার মেয়ে, ছোট-বড়
তিন ছেলে, এক বৌ, দুই জামাই, একপাল নাতি-পুতি হাসি-খুশি লুটো-পাটি করে
চলেছে! কেউ পাহাড় থেকে ফুল তুলছে, কেউ রাস্তা থেকে নুড়ি কুড়োচ্ছে, একটা
ছেলের হাতে প্রজাপতির কুড়োজাল দেখে রিদয় চৈঁচিয়ে বললে—“ধোরো না ধোরো
না, যক্ হবে!”

হাঁসেরা বলে চলল—“ফুল যত চাও তোলা, গোলাপ ফুটল বলে, গাঁদা ওই ফুটেছে,
চেরিফুলে রঙ ধরেছে, আমরা এনেছি, নাও কলাইশুটি নাও, ফুলকপি নাও, আপেল নাও,
নাসপাতি যত পারো খাও নাও দাও থোও, প্রজাপতি ধরা ছেড়ে দাও, ছেড়ে দাও!”

দেখতে-দেখতে মেয়ে কার্শিয়ং ঢেকে গেল, ছেলে-বুড়ো ঘর-বাড়ি বাজার-ইন্সটিশন
মায় ছোট রেল গিঁদা পাহাড় ডাউনহিল সব কুয়াশায় চাপা পড়ল, দূরে সিঞ্চল মেঘের
উপরে মাথা তুলে দেখা দিল। এইবার রিদয়ের শীত আরম্ভ হল। খোঁড়াহাঁস ডানা
ছড়িয়ে উড়ে চলেছে, পালকের মধ্যে ঢোকবার যো নেই, জলে-শীতে থরথর করে
বেচারি কাঁপতে লাগল, খোঁড়াও বাঙলাদেশের মানুষ, পাহাড়ের শীতে তারও ডানার
পালকগুলো কাঁটা দিয়ে উঠল, সে ডাক দিলে—“শীত-শীত হংপাল শীতে গেল।”

চকা হাঁকলে—“নেমে পড়ো কার্শিয়ং!”

হাঁসরা অমনি মেঘের মধ্যে দিয়ে নামতে শুরু করলে। রিদয় দেখলে মেঘের
মধ্যেটায় খোলা আকাশের চেয়ে কম ঠাণ্ডা, যেন পাতালা তুলোর বালাপোষ গায়ে
দিয়েছে। হাঁসেরা নামতে-নামতে একটা বাড়ির ছাতে এসে বসল। বাড়ির বাইরে
কেউ নেই, কুয়াশার ভয়ে সবাই ঘরে কাঁচ বন্ধ করে বসেছে, বাইরে কেবল গালফুলো
একটুখানি একটা পাহাড়ি ছোঁড়া আগুন জেলে কচি ছেলের একজোড়া পশমের মোজা
তাতিয়ে নিচ্ছে, আর সেইসঙ্গে নিজের হাত-পাগুলোও একটু সঁকে নিচ্ছে, এমন সময়
ঘর থেকে বাড়ির গিনি ডাক দিলেন—“টুকনী!”

ছেলেটা তাড়াতাড়ি হাতের মোজাজোড়া মাটিতে ফেলে দৌড় দিলে, চকা অমনি
ছোঁ দিয়ে মোজাটা নিয়ে রিদয়কে দিয়ে বললে—“পরে ফ্যালো উলের জামা।” রিদয়
মোজাটা মাথায় গলিয়ে ছোঁড়া মোজার তিনটে ছোঁড়া দিয়ে হাত আর মাথা বার করে
ফিট হয়ে যেন সোয়েটার পরে দাঁড়াল।

হাঁসের দল তাকে পিঠে নিয়ে আকাশে উঠল—টুকনী ছোঁড়াটা নিচে দাঁড়িয়ে
চোঁচাতে লাগল—“আরে-আরে হাঁস মোজা লেকে ভাগা!”

রিদয় শুনলে গিনি চোঁচাচ্ছেন—“হাঁসে কখনো মোজা নেয়? নিশ্চয় মোজাটা পুড়িয়ে

রেখে মিছে কথা বলছে! ফের ঝুটবাত বোলতা!”

টুকনীর মোজা-পোড়ানোর মামলার শেষ কী হল দেখবার আর সময় হল না! মেঘ তখন মুশলধারায় জল ঢাকতে আরম্ভ করেছে, হাঁসেরা তাড়াতাড়ি মেঘ ছাড়িয়ে উঠতে চেষ্টা করতে লাগল আর বন-জঙ্গলকে ডেকে বলতে লাগল—“কত জল আর চাই বলো, তেঁটা যে মেটে না দেখি, মেটে না দেখি!” কিন্তু দেখতে-দেখতে আকাশ নীল মেঘে ছেয়ে গেল, সূর্য কোথায় কোনদিকে তার ঠিক নেই, হাঁসদের ডানার উপরে বিষ্টি ক্রমাগত চাবুকের মতো পড়ছে, ডানার পালক ভিজে তাদের বুকের পালকে পর্যন্ত জল সঁধিয়েছে, পাহাড়-পর্বত চড়াই-নাবাই গাছপালা ঘন কুরাশায় ঝাপসা হয়ে মিলিয়ে গেছে—দু’হাত অগে নজর চলে না। পাখিদের গান থেমে গেছে। হাঁসেরা চলেছে, ধীরে-ধীরে পথ খুঁজে-খুঁজে; রিদয় শীতে কাঁপছে আর ভাবছে, চুরি করার এই শাস্তি।

এই মেঘ আর কুয়াশার মধ্য দিয়ে চকা-নিকোবর যখন তাদের কটিকে নিয়ে সিংচল পাহাড়ের সিংএ একটা ঝাউতলায় এসে বসল, তখন যেন রিদয় হাঁফ ছেড়ে বাঁচল! পাহাড়ের চূড়ায় কেবল সোনালি ঘাসের বন আর এক-একটা ছাতের মতো প্রকাণ্ড-প্রকাণ্ড পাথর বরফ পড়ে শাদা হয়ে রয়েছে—কোথাও-কোথাও নালা দিয়ে বরফ-জল বয়ে চলেছে, পাতায়-পাতায় টিপটিপ করে বিষ্টি লাগছে, কিন্তু শীত হলেও হাওয়া এখানে এমন পরিষ্কার যে রিদয় আনন্দে এদিকে-ওদিকে ছুটে বেড়াতে লাগল! বুনো টেপারি সোনালি পাতা রূপোলি পাতা সোনা-ঘাস রূপো-ঘাস তুলে-তুলে রিদয় বোঝা বাঁধছে দেখে চকা হেসে বললে—“ওগুলো হবে কী?”

রিদয় অমনি বলে উঠল—“দেশে গিয়ে দেখাব!”

খোঁড়া-হাঁস ভয় পেয়ে বললে—“ওই মস্ত বোঝা নিয়ে ওড়া আমার কর্ম নয়, তুমি তবে রেলে করে বাড়ি যাও!”

চকা রিদয়কে ডেকে বললে—“খুব-কাজের জিনিস ছাড়া একটি বাজে জিনিস সঙ্গে নেওয়া আমাদের নিয়ম নয়, পেট ভরে টেপারি খাও তাতে আপত্তি নেই, ঘাস দু’কানে দুটো গুঁজতে পারো তার বেশি নয়!”

রিদয় দু’কানে দুটো ঘাস গুঁজে টেপারি খেয়ে বেড়াচ্ছে এমন সময় ভালুকের সঙ্গে দেখা! রিদয় ভালুক-নাচ অনেক দেখেছে কিন্তু এতবড় এমন রোঁয়াওয়ালা কালো মিস ভালুক সে কোনোদনি দেখেনি, ভালুক তাকে দেখে দু’পা তুলে থপথপ করে এগিয়ে এসে বললে—“এখানে মানুষ হয়ে কী করতে এসেছ? পালাও, না হলে শীতে মরে যাবে, বড় খারাপ জায়গা। গোরাগুলো পর্যন্ত এখানে টিকতে পারেনি, কত লোক যে এখানে ঠাণ্ডা আর রাতের বেলায় ভূতের ভয়ে কেঁপে মরেছে তার ঠিক নেই। এখানে এককালে গোরা-বারিক ছিল, কাণ্ডেল জাঁদরেল সব এখানে থাকত, এখন আর কেউ নেই! কোথায় গেছে তাদের বাগ-বাগিচা বাজার-শহর, কেবল দ্যাখো চারিদিকে আগুন-জ্বালাবার চুলোগুলো পড়ে আছে, শীতে সব গোরা ভূত বেরিয়ে এইসব ভাঙাচুলির ধারে বসে আগুন পোহায় আর মদ খায়, হুকা-হুয়া গান গায়।”

ঠিক এই সময়ে শেয়াল-ডাকের মতো গান শোনা গেল, আর মেম সঙ্গে একটা

গোরা বোতল হাতে টলতে-টলতে আসছে দেখা গেল! ভালুকদের দূর থেকে দেখেই গোরা যেমন বন্দুক উঁচিয়েছে, অমনি ভালুক চট করে গাছের তলায় অন্ধকারে কালোয়-কালো মিশিয়ে গেছে! রিদয়ের গায়ে টকটকে মোজা—মেম তাকে ভাবলে কার পোষা ছোট বাঁদর, সে অমনি “মাংকি-মাংকি” বলে রিদয়কে ধরতে ছুটল। রিদয় তাড়াতাড়ি যেমন পালাতে যাবে অমনি পাহাড় থেকে গড়াতে-গড়াতে একেবারে কার্ট রোডে মাল-বোবাই ছোট রেলের ছাতে এসে চিৎপাৎ!

রেলটা ঝরনা থেকে হাঁস-ফাঁস করে খানিক জল ইঞ্জিনে ভরে নিয়ে ঘুম জোড়বাংলার দিকে এগিয়ে চলল ভকভক করে বকতে-বকতে। এদিকে ভালুকের কাছে খবর পেয়ে হাঁসেরা উড়েছে ঠিক রেলের সঙ্গে সঙ্গে—তারা দেখছে, রিদয় মালগাড়ির উপরটায় যেন একটি লাল নিশেনের মেতা লটপট করছে। ঘুম বস্তিতে এসে রেল থামল। হাঁসেরা অমনি হাঁক দিলে—“ঘুম লেক যাও তো নেমে পড়ো!” কিন্তু তখন গাড়ির ঝাঁকানিতে রিদয়ের ঘুম এসেছে, সে হাত নেড়ে জানালে—“দার্জিলিঙ যাব!” এই সময় গাড়ির মধ্যে থেকে একপাল ছেলে চোঁচিয়ে উঠল—“টুং সোনাদা ঘুম!” রিদয় চমকে উঠে দেখলে গাড়ি ছেড়েছে।

ঘুমের পরেই ‘বাতাসীয়া’ নতুন লাইন খুলেছে—এক-একটা পাহাড় কেটে সেগুলো কেল্লার বুরুজের মতো পাথরের টালি দিয়ে পাহাড়ি মিশ্রি সব গাঁথে তুলেছে। রিদয়ের মনে হল, ঠিক যেন কেল্লার মধ্যে ঢুকেছি! ঠিক সেই সময় হাঁসের দল ডাক দিল—“বাতাসীয়া বাতাস-জোর, ধরে বোসো!” কিন্তু গুছিয়ে বসবার আগেই রিদয় বাতাসে লাল ছাতার মতো উড়ে একেবারে পথের মাঝে এসে বসল। সোঁ-সোঁ করে বাঁশি দিয়ে রেল দার্জিলিঙের দিকে বেরিয়ে গেল।

পাহাড়ের মোড়টা সুনসান, লোক নেই, দূর থেকে একটা মোষের গাড়ি আসছে। রিদয় আস্তে-আস্তে সেই মোষের গাড়ি ধরে ঝুলতে-ঝুলতে দার্জিলিঙের বাজারে হাজির। হাঁসেরা মাথার উপরে ডাক দিয়ে গেল—“আলুবাড়ি গুফা মনে রেখো, সেখানে আমরা রইব।” রিদয় আলুবাড়ি-আলুবাড়ি নাম মুখস্থ করতে-করতে বাজার দেখতে চলল। তখন সন্ধ্যা হয়ে এসেছে—অন্ধকারে রিদয় ভিড়ের মধ্যে মিশে চলেছে। বাজারের ওধারে কাঞ্চনজঙ্ঘা পাহাড়ে বরফের উপর সন্ধ্যার আলো যেন সোনার মতো ঝলক দিয়ে উঠল। তারপর গোলাপি, গোলাপি থেকে বেগুনি হয়ে আবার যে-শাদা সেই শাদা বরফ দেখা দিলে। সেই সময় চৌরাস্তায় গোরার বাদি গুরু হল, আর দলে-দলে লোক সেইদিকে ছুটল। রাস্তার দুধারে জুতো, খাবার, বাসন, গহনার দোকান—এখানে-ওখানে ভুটিয়া লামারা মড়ার মাথার খুলি নিয়ে ঘণ্টা-ডমরু বাজিয়ে নন্দি-ভঙ্গির মতো ঘুরে বেড়াচ্ছে। পাহাড়ের রাস্তা কখনো রিদয় ভাঙেনি, দু-এক চড়াই উঠেই বেচারি হাঁপিয়ে পড়ল; কোথায় বসে জিরায় ভাবছে, এমন সময় একটা খেলনার দোকানে নজর পড়ল, সেখানে লাল উলের মোজা পরানো ঠিক তারি মতো অনেকগুলো পুতুল সার্সির গায়ে কাগজের বাস্ত্রোতে দাঁড় করানো রয়েছে! রিদয় চুপি-চুপি দোকানে ঢুকে একটা খালি বাস্ত্র দেখে তারি মধ্যে শুয়ে রইল।

সার্সিমোড়া দোকানোর মধ্যে বেশ গরম, এক খোঁটা বাবু বসে বিড়ি টানছেন আর

একটা ভুটিয়া মেয়ে দরজা ধরে দাঁড়িয়ে আছে। দোকানের মধ্যে ফুটবল পোস্টাকার্ড নানা পুতুল লজঙ্কুস মার্বেল এমনি সব সাজানো, দরজার উপরটায় একটা বিভীষণের মুখোশ হাঁ করে চোখ পাকিয়ে চেয়ে রয়েছে! রিদয় মুখোশটার দিকে অবাক হয়ে চেয়ে আছে এমন সময় এক বাবু দোকানে ঢুকেই বলে উঠলেন—“ওহে মার্কণ্ড, ছোটখাটো দুটো পুতুল দাও দেখি, টুনু আর সুরুপার জন্যে!”

মার্কণ্ড তাড়াতাড়ি রিদয় যে-বাক্সে ছিল সেই বাক্সে আর-একটা বিবি-পুতুল দিয়ে কাগজে মুড়ে বাবুর হাতে দিলে। বাবু সেটাকে আলখাল্লার পকেটে ফেলে চুরুট ধরিয়ে পাহাড়ে রাস্তায় ঠকঠক লাঠি ঠুকতে-ঠুকতে বাড়ি-মুখো হলেন। পকেটের মধ্যে গরম পেয়ে রিদয় বিবি-পুতুলটির পাশে ঘুমিয়ে পড়ল, আবার যখন চোখ মেলে চাইলে তখন দেখলে বাস্কর ডালাটা খুলে গেছে। একটা কাঁচ-মোড়া বারাণ্ডায় গোটাকতক তুলি, এক বাস্কর রঙ, একটা গদি-মোড়া চৌকি, তারি উপরে একটা এতটুকু কালো কুকুর বাস্কর থেকে তাকে টানাটানি করে খেলবার চেষ্টা করছে! কুকুরটা যদি কামড়ে দেয়—! রিদয় ভাবছে, এমন সময় ওঘর থেকে ডাক এল “টমা-টমা-টমাসে!” কুকুরটা দৌড়ে ওঘরে গেল সেই ফাঁকে রিদয় বাস্কর থেকে চৌচা দৌড়।

বাড়ির বাইরে থেকে সারিসিতে মুখ লাগিয়ে দেখলে একটা লাল কঞ্চল-পাতা খাতে ছেলেমেয়ে একদল বসে তাদের বড় ভাইটির কাছে গল্প শুনছে আর একটা ছোট ছেলে লাল ভুটিয়ার কাপড় পরে যে গল্প বলছে তার গলা জড়িয়ে ডাকছে—“পাখম দাদা, পাখম দাদা।”

শীতের রাতে আগুন জ্বালা ঘরখানি—এই ছেলের দল, এই হাসি-খুশি গল্প দেখে রিদয়ের চোখে জল আসতে লাগল। তারও ঘর আছে তারও দাদা আছে, দিদি আছে, অথচ সব থেকেও নেই! কোথায় রইল তাদের আমতলি, কোথায় সেই মাটির দেওয়াল-দেওয়া ঘরগুলি! রিদয়ের প্রাণ চাইছে এই ছেলেদের সঙ্গে একসঙ্গে খেলে, কিন্তু হায়, সে বুড়ো-আংলা যক্ হয়ে গেছে আর কি মানুষের ঘরে তার স্থান হবে। বুড়ো-আংলা জানলার বাইরে শীতে বসে অঝোরে কাঁদতে লাগল। সেই সময় বাবু ওধারে হুকুম দিলেন—“এ রবতেন কাল আলুবাড়ি জানে হোগা, ডাঙি রাখ যাও!”

রবতেন ডাঙিখানা জানলার ধারে বারাণ্ডায় রেখে চলে গেল। রিদয় সে-রাত ডাঙির ছোট্টর মধ্যে কাটিয়ে বাবুর সঙ্গে লুকিয়ে যেমন এসেছিল, তেমনি ডাঙিতে লুকিয়ে রওনা হল। পুতুলের মধ্যে টুনুর পুতুলটাই পাওয়া গেল, সুরুপার পুতুলটা নিশ্চয় টমা মুখে করে কোথায় ফেলেচে বলে অনেক খোঁজাখুঁজি করেও তার সন্ধান হল না! সুরুপা টমার পিঠে দুই খাবড়া বসিয়ে পাহাড়ের উপর পা ছড়িয়ে কাঁদতে লাগল।

আলুবাড়ি থেকে রিদয়কে পিঠে নিয়ে জলা-পাহাড় কাট-পাহাড় পেরিয়ে হাঁসেরা এমন মেঘ আর শিলা-বৃষ্টি পেলে যে কাঞ্চনজঙ্ঘার দিকেই এগোতে পারল না, তাড়াতাড়ি ঘুরে ঝুপ-ঝাপ ঘুম-লেকে গিয়ে পড়ল। ভয়ঙ্কর শিল পড়েছে, লেকের জলের উপরে বরফের সর পড়ে গেছে, পাহাড়ের গা বরফে শাদা হয়ে গেছে, খোঁড়া-হাঁসের পায়ের বাত কটকট করে উঠল। সে বললে—“কাজ নেই বাপু এখানে থেকে, ফিরে চলো, আর-একবার আসা যাবে।” কিন্তু চলো বললেই চলা যায় না—পাহাড়

দেশে মেঘ, ভালো হাওয়ার গতিক বুঝে তবে চলাচল করতে হয়। কোনোরকমে পাঁপড়া নানকৌড়ি ঘুম-রকে চড়ে আকাশের ভাবটা জেনে আসতে চলল; অমনি রিদয় বললে—“আমি যাব ঘুম-রকে।” খোঁড়া বললে—“আমিও।” অমনি সবাই একসঙ্গে “আমিও-আমিও” বলতে-বলতে উড়ে গিয়ে রকের উপরে বসল।

মানুষের বাড়িতে যেমন কোনো জায়গা রাঁধবার, কোনোটা বৈঠকখানা, কোনোটা বা শোবার খাবার জায়গা, হিমালয়েতেও তেমনি এক-একটা জায়গা এক-এক কাজের জন্য আছে। মানুষের বাড়িতে যেমন দালান থাকে বারান্দা থাকে রক থাকে, হিমালয়েতেও তাই। ঘুম-রকটা হল ঘুম দেবার স্থান, জলাপাহাড় হল জল খাবার কিম্বা জলো হাওয়া খাবার জায়গা, রংটং হল ধোবখানা, কাপড় রঙাবার জায়গা, টুং হল ঘড়ির ঘর—এমনি সব নানা রক নানা দালান চাতাল গুহা এক-এক কাজের জন্যে রয়েছে।

ঘুম-রকে দিনে বড় কেউ আসে না, দু'চার পখিক পাখি কি জানোয়ার কখনো-কখনো জিরোতে বসে, না হলে জায়গাটা সারাদিন ফাঁকা থাকে দেখে বড়ো রামছাগল মাস্টার এখানে ছানা পড়াবার জন্যে একটা ইস্কুল খুলেছেন। পাখির-ছানা শেয়াল-ছানা শূয়ার-ছানা ভালুক-ছানারা ঘুম-রকে বড়-বড় পাথরের বেঞ্চিতে কেউ পা বুলিয়ে কেউবা বেঞ্চিতে দাঁড়িয়ে সারাদিন ঝিমোচ্ছে আর রামছাগল শিঙের খোঁচায় তাদের জাগিয়ে দিয়ে কেবলি পড়াচ্ছেন, ক, খ, গ, ঐ বো স্যে! একে ঘুম-রক তাতে আজ বড় বাদলা, শিঙের খোঁচা খেয়েও চুনে-চুনে পড়ছে দেখে রামছাগলও কব্বল মুড়ি দিয়ে ঘুমের যোগাড় করছেন এমন সময় রিদয়কে নিয়ে হাঁসেরা উপস্থিত। অচেনা লোক দেখে মাস্টারমশায় তাড়াতাড়ি গা ঝাড়া দিয়ে মস্ত ম্যাপ আঁকা প্রকাণ্ড কালো সেলেটখানায় শিং বুলিয়ে-বুলিয়ে ছেলেদের জিওগ্রাফির লেকচার শুরু করলেন :

জলের জন্তুরা চোখ ফুটেই দেখে জল আকাশ, ডাঙার জীব তারা দেখে বন-জঙ্গল মাঠ, আর পাহাড়ের ছেলেমেয়ে তারা দেখে আকাশের উপরে বরফে ঢাকা ওই হিমালয়ের চূড়ো ক'টা। হিম-আলয় সন্ধি করে হয়েছে হিমালয়, অর্থাৎ কিনা হিমালয় মানে হিমের বাড়ি, পাহাড়ি ভাষায় বলে হিমালয়, সমস্কৃতোতে বলবে হিমাচলম্, ইংরেজ তারা ভালোরকম উচ্চারণ করতেই পারে না, ‘র’ বলতে ‘ল’ বলে ফেলে—তারা হিমালয়কে বলে ইমালোইয়াস্! হিমালয়ের মতো উঁচু আর বড় পর্বত জগতে নেই। সব দেশের সব পর্বত আমাদের এই হিমালয়ের চূড়োর কাছে হার মেনেছে।

ধলা চামড়া জানোয়ারেরা ধরাকে সরা জ্ঞান করে, আমাদের বলে কালো, কিন্তু তাদের সবচেয়ে বড় পাহাড় মোটে ষোলো হাজার ফুট আর আমাদের এই বাড়ির চূড়োগুলো কত উঁচু তা জানো? এর চল্লিশটা শিখর হচ্ছে চব্বিশ হাজার ফিট করে এক-একটি। ঐ কাঞ্চনজঙ্ঘা যেটা সকালে-সন্ধ্যায় সোনা আর দিনে রাতে দেখায় রূপো, গুটা হচ্ছে আটশ হাজার ফুট, ওরও আরো হাজার ফুট উপরে ধবলাগিরির সব উঁচু চূড়ো উনত্রিশ হাজার ফুট। এর পাশে ধলা চামড়াদের জেতো পাহাড়—ফুঃ, রাজহস্তীর পাশে খরগোশ! মানুষের কথা দূরে থাক পাখিরাও এই হিমালয়ের চূড়ায় চড়তে পারে না, এখানে না ঘাস না গাছ! মেঘ পর্যন্ত ভয় পায় সেখানে উঠতে, শুধু ধপধপ করছে আছোঁয়া শাদা বরফ।

এই হিমালয়ের চূড়া থেকে বরফ গলে বারোটা মহানদী ছিষ্টি হয়ে পূব-পশ্চিমে দুই মহাসাগরে গিয়ে পড়েছে, কত দেশ কত বনের মধ্যে দিয়ে তার ঠিক নেই! এ-সব নদীর ধারে কত নগর কত গ্রাম কত মাঠ-ঘাট জমি-জমা রাজ্য পেতে কত রকমের মানুষেরা রয়েছে তা গোনা যায় না।

এই হিমের বাড়ির চূড়াটা থেকে ধাপে-ধাপে পৃথিবীর দিকে নেমে গেছে প্রকাণ্ড-প্রকাণ্ড পর্বত-প্রমাণ সিঁড়ি, এক-এক ধাপে রকম-রকম গাছ-পালা পশু-পাখি! এ-রকে সে রকে পাথরের কাজল এমন চওড়া যে সেখানে কতকালের পুরোনো পাথরের মেঝেতে বড়-বড় গাছের বন হয়ে রয়েছে, ঝরনা দিয়ে বর্ষার জল বরফের জল সব গড়িয়ে চলেছে। কোনো রকের উপর দিয়ে মানুষেরা রেল চালিয়ে দিয়েছে, বড়-বড় শহর বসিয়ে বাজার বসিয়ে রাজত্ব করছে।

জীব-জন্তুর অগম্য স্থান ধবলাগিরি, সেখানে কেবলি বরফ। এই সিঁড়ির রক, যাতে আমরা বাস করছি, এরি সব উপরের রকে শুধু বরফ আর শেওলা, একমাত্র চমরী গাই পাহাড়ি ছাগল আর ভেড়া, তার পরের ধাপে মানুষ-সমান ঘাস আর দেবদারু বন, সেখানে শেয়াল ভালুক হুঁড়েল এরাই যেতে পারে, তার পরের রকে নানা ফুল ফলের বাগান, সেখানে প্রজাপতি পাখি খরগোশ কুকুর বেড়াল ভোঁদড় ভাম বাঁদর হনুমান এরাই থাকে, সবশেষের ধাপে বেতবন বাঁশবন অন্ধকার ঘন জঙ্গল, সেখানে হরিণ মোষ বাঘ সাপ ব্যাঙ, তার পরে চাটালো জমি যার উপর দিয়ে সহস্রধারা নদী সব বয়ে চলেছে, এরি পরে অগাধ সমুদ্র, নীল জল, শেষ দেখা যায় না, এই সমুদ্রের ওপারে যে কী, তা কেউ জানে না।

চকা অমনি বলে উঠল—“আমি জানি। নীল সমুদ্রের মাঝে পাহাড় আছে, টাপু আছে, তার পরে পৃথিবীর শেষ বরফের দেশ, সেখানে বারোমাস বরফ, জমি যেন শাদা চাদরে ঢাকা আর সেখানে ছ’মাস রাত্রি ছ’মাস দিন; সেখানে পেঙ্গু পাখিরা বরফের বাসায় ডিম পাড়ে, ধলা ভালুক আছে, ধলা শেয়াল সিন্ধুঘোটক আছে, সব সেখানে শাদা, কালো কিছু নেই, দিন রাত সমান আলো, ঘুটঘুটে আঁধার মোটেই নেই, আমি সেইখানে পাঁচবার গেছি!”

চকার কথায় রামছাগল শিং বেঁকিয়ে বললে—“এত বুড়ো হলেম এমন আজগুবি কথা তো শুনি নি।”

রিদয় এবার এগিয়ে এসে বললে—“যে-হিমালয়ের চূড়া এখান থেকে দেখতে পাওয়া যাচ্ছে বরফে ঢাকা, ঐ হিমের বাড়ি গড়া নিয়ে কী কাণ্ড হয়ে গেছে এককালে, তার খবর চকা তো জানে না, রামছাগলও জানে না, মানুষেরা ধ্যান করে জেনেছে ওই নিচের তলাকার বনে বসে। ওই ধবলাগিরির উপরের খবর যা শাস্ত্রে লিখে গেছে—তাই বলচি, শোনো। বড় চমৎকার কথা!”

সবাই অমনি রিদয়কে ঘিরে বসল কথা শুনতে, মেঘলা দিন ভিজ়ে স্যাৎস্যাৎ করছে, ভালুকের গা ঘেঁষে ছাগল, ছাগলের গা ঘেঁষে হাঁস, হাঁসের গা ঘেঁষে শেয়াল।

রিদয় বসে গল্প শুরু করলে :

হিমালয় কেমন, তা শুনলে! হিমালয়ের উপরে কী নিচে কী সমুদ্রের এপারে কী

ওপারে কী সবই তো শুনলে, কিন্তু এগুলো তৈরি করলে কে, তার খবর রাখ? প্রথমে সেইটে বলি, শোনো—একদিন বিশ্বকর্মা গোলার মতো একতাল কাদা পাকিয়ে নতুন পৃথিবী গড়তে বসলেন। চন্দ্র সূর্য গড়া হয়েছে এইবার সসাগরা আমাদের এই ধরা তিনি গড়তে আরম্ভ করলেন। সেদিনটাও এমনি আঁধার-আঁধার ছিল। বিশ্বকর্মার আর কাজে মনই যাচ্ছে না, তিনি কাদা নিয়ে কেবল পৃথিবীটার উপরে বুড়া আঙুলের টিপ দিয়ে এদেশ-সেদেশ গড়ে চললেন, সব দেশ মিলিয়ে দেশ-বিদেশগুলোর চেহারাটা হল ঠিক যেন হাড়িসার—এখানে-ওখানে মাটি-ঝরা শির-বারকরা বাঁকা-চোরা টোল-খাওয়া দোমড়ানো চোপসানো গরু, ঘাড় ঝুঁকিয়ে সমুদ্রের জল খাচ্ছে আর ঠিক তারি সামনে একটা গরুড় পক্ষীর ছানা সেও যেন গো-ডিম থেকে সবে বার হয়ে মাছ ধরবার জন্যে সমুদ্রের দিকে গলা বাড়িয়েছে।

বিশ্বকর্মার পাশে বিশ্বামিত্র বসেছিলেন; তাঁর বিশ্বাস, বিশ্বকর্মার চেয়ে গড়ন-পিটন করতে তিনি পাকা। বিশ্বকর্মার সঙ্গে বাজি রেখে প্রায়ই বিশ্বামিত্র এটা-ওটা গড়তেন, প্রত্যেকবারে বাজিও হারতেন কিন্তু তবু তাঁর বিশ্বাস গেল না যে বিশ্বকর্মার চেয়ে তিনি পাকা কারিগর! বিশ্বকর্মার ছিষ্টি মিষ্টি আতা খেয়ে বিশ্বামিত্র এক আতা গড়লেন, দেখতে বিশ্বকর্মার আতার চেয়েও ভালো কিন্তু সমুদ্রের জল দিয়ে গড়বার কাদা ছানার দরুন বিশ্বামিত্রের আতা এমনি নোনা হয়ে গেল যে মুখে দেবার যো নেই। ডিম ফুটে পাখি বেরোচ্ছে বিশ্বকর্মা ছিষ্টি করলেন, পাখিদের মা-বাপ—তাদের ডিম, ডিমের মধ্যে বাচ্চা—বিশ্বামিত্র বললেন, ‘ও কী হল? এ কি আবার একটা ছিষ্টি! আমি গাছে পাখি ফলাব।’ বিশ্বামিত্র অনেক মাথা ঘামিয়ে অনেক আঁক-জোক কষে স্থির করলেন—ডিমে তা দেওয়া চাই কিন্তু পাখি তা দিলে তো চলবে না—তিনি এমন নারকোল গাছ সুপরি গাছ তালগাছ ছিষ্টি করলেন যাতে দিনভোর রোদ পায়, কিন্তু বেশি রোদ পেলে ডিম একেবারে সিদ্ধ হয়ে যাবে, আবার রাতে হিম পেলেও নষ্ট হবে, জল পেলে পচে যাবে। সব ভেবে-চিন্তে বিশ্বামিত্র বড়-বড় পাখির পালকের মতো পাতা গাছের আগায় বেঁধে দিয়ে সেই পাতার গোড়ায় দশটা বারোটা কুড়িটা পঁচিশটা করে ছোট বড় নানারকম ডিম বুলিয়ে অপেক্ষা করতে লাগলেন কখন পাখি বার হয়, কিন্তু পাছে কাগে চিলে ঠুকরে ডিমগুলো ডেঙে দেয় সেজন্যে বিশ্বামিত্র ডিমের খোলাগুলো এমনি শক্ত করে বানিয়েছেন যে বাচ্চা পাখি সেই পুরু নারকোল মালা নারকোল ছোবড়া তালের খোলা সুপরি ছাল ভেঙে বার হতেই পারলে না। কোনোটা রোদে পক্ক কোনোটা অর্ধপক্ক কোনোটা অপক্কই রয়ে গেল। ডিম হল, তার শাঁস জল হল, তা দেওয়া হল, সবই হল, কিন্তু তা থেকে পাখি হল না।

এতেও বিশ্বামিত্রের চৈতন্য হল না! বিশ্বকর্মাকে গোন্ধুপা পৃথিবী গড়তে দেখে তাঁরও গড়বার সাধ হল। তখন বিশ্বকর্মা গোন্ধুপা পৃথিবীর বাঁটের মতো এই ভারতবর্ষটি অতি যত্ন করে গড়েছেন, সব তখনো গড়া হয়নি কিন্তু এতেই মনে হচ্ছে এই দেশটি হবে চমৎকার, একবারে কামধেনুর বাঁটের মতো দেশটি—যা চাই যত চাই এখানে পাওয়া যাবে। বিশ্বামিত্র তাড়াতাড়ি একটু কাদা নিয়ে বসে বললেন, ‘দাদা তুমি খানিক এই দেশটার গড়ে, আমিও খানিক গড়ি—দেখা যাক কার ভালো হয়।’

বিশ্বকর্মা ভারতবর্ষের আদড়াটা প্রায় শেষ করেছিলেন কাজেই বিশ্বামিত্র খারাপ করে দিলেও দেশটা একেবারে মাটি হয়ে যাবে না জেনে দেশটার উপরে বিশ্বামিত্রকে গড়াপেটা করতে দিতে বিশ্বকর্মা আপত্তি করলেন না! তাঁকে সমস্ত উত্তরদিকটা গড়তে ছেড়ে দিয়ে নিজে বাঙলাদেশটা গড়তে বসে গেলেন। বাঙলাদেশটা সুন্দর করে নদী গ্রাম ধানক্ষেত সুন্দর বন আম কাঁঠালের বাগান খড়ের চাল দেওয়া ছোট-ছোট কুঁড়েঘর দিয়ে চমৎকার করে সাজিয়ে তুলতে বিশ্বকর্মার বেশি দেরি লাগল না, বুড়ো আঙুলের দু'চার টিপ দিয়ে মাঠগুলো আর আঙুলের দাগ দিয়ে নদী-নালা বানিয়ে তিনি কাজ শেষ করে বসে বিশ্বামিত্রের দিকে চাইলেন। বিশ্বামিত্র অমনি বলে উঠলেন—‘আমার কাজ অনেকক্ষণ শেষ হয়েছে, দেখবে এসো!’

বিশ্বকর্মার ছিটি বাঙলাদেশ দেখে বিশ্বামিত্র এবারে নিন্দা করতে পারলেন না, চমৎকার! সুজলা সুফলা—বীজ ছড়ালেই ফসল, কোথাও উঁচু-নিচু এবড়ো-খেবড়ো পাহাড় পর্বত নেই বললেই হয়, যতদূর চোখ চলে সবুজ ক্ষেত আর জলা। বিশ্বামিত্র দাড়ি নেড়ে বললেন—‘হ্যাঁ, এবারে ছিটিটা হয়েছে মন্দ নয়, কিন্তু আমার দেশটা আরো ভালো হয়েছে দেখসে’ বলে বিশ্বামিত্র বিশ্বকর্মাকে উত্তর-ভারতবর্ষটা কেমন হয়েছে দেখতে বললেন।

বিশ্বকর্মার আদড়া উল্টে-পাল্টে বিশ্বামিত্র গড়েছেন। পাঞ্জাবে টেনেছেন পাঁচটা নদীর খাত কিন্তু সেখানকার জমিতে সার মাটি না দিয়ে তিনি দিয়েছেন বালি আর কাঁকর, ধানও হবে না, চালও হবে না; মানুষগুলো কেবল যেন জল খেয়েই থাকবে। তারপর পাহাড় অঞ্চলে দুজনে উপস্থিত—বিশ্বকর্মা বিশ্বামিত্রের কীর্তি দেখে অবাক! সেখানে যা পেরেছেন পাথর সবগুলো জড়ো করে এক হিমালয় পাহাড়ের ছিটি করে বসেছেন বিশ্বামিত্র। তাঁর চিরকাল মাথায় আছে সূর্যের তাপ—গাছপালা মানুষ গরু সব জিনিসের পক্ষে ভালো, কাজেই তাঁর ছিটি-করা পাহাড় দেশ তিনি যতটা পারেন সূর্যের কাছে ঠেলে তুলেছেন আর সেইসব পাথরের গায়ে এখানে-ওখানে দু-চার মুঠো মাটি ছড়িয়ে দু-একটা ঘাসের চাপড়া লাগিয়ে দিয়ে হাত গুটিয়ে বসেছেন!

বিশ্বামিত্র একগাল হেসে যেমন বলেছেন, ‘কেমন দাদা, ভালো হয়নি?’ অমনি ঝুপঝুপ করে এক পশলা বিষ্টি নামল আর পাহাড়ের সব মাটি ঘাস ধুয়ে গিয়ে খালি পাথর আর নুড়ি বেরিয়ে পড়ল। এদিকে পাহাড়ের এখানে-ওখানে উপরে নিচের এত বিষ্টির জল জমা হল যে তাতে সারা পৃথিবীর নদীতে জল দেওয়া চলে!

বিশ্বকর্মা বলে উঠলেন—‘করেছ কী, সব উল্টো-পালটা! যেখানে মাটি চাই, সেখানে দিয়েছ কাঁকর, যেখানে জল দরকার সেখানে দিয়েছ বালি, আর যেখানে জল মোটেই দরকার নেই সেখানে জমা করেছ রাজ্যের জলাশয়, তোমার মতলব তো কিছু বোঝা গেল না!’

বিশ্বামিত্র দাড়ি মোচড়াতে-মোচড়াতে বললেন—‘শীতে যাতে লোক কষ্ট না পায় তাই যতটা পারি সূর্যের কাছে দিয়েছি, এতে দোষটা হল কী!’

বিশ্বকর্মা বললেন—‘উঁচু জমিতে দিনে যেমন গরম রাতে তেমনি ঠাণ্ডা, এটা তো তোমার মনে রাখা উচিত ছিল, এত উঁচুতে তো কিছু গাছপালা গজানো শক্ত, গরমে

জ্বলে যাবে বরফে সব জমে যাবে। এত পরিশ্রম তোমার সব মাটি হল, দেখছি!’

বিশ্বামিত্র মাথা চুলকে বললেন—‘আমি সব এখানকার উপযুক্ত মানুষ ছিষ্টি করে দিই। তারা দেখবে এই পাহাড়কে ভূস্বর্গ করে তুলবে!’

বিশ্বকর্মা বললেন—‘আর তোমার ছিষ্টি করে কাজ নেই, মানুষ গড়তে শেষে বাঁদর গড়ে বসবে!’

‘কোনো ভয় নেই, এবার আমি খুব সাবধানে গড়ছি। দেখো এবারে ঠিক হবে’—বলে বিশ্বামিত্র একরাশ প্রজাপতির ডানা গড়ে রেখে বিশ্বকর্মাকে ডেকে বললেন—‘দেখসে মজা!’

বিশ্বকর্মা ভেবেই পান না, এত ডানা নিয়ে বিশ্বামিত্র কী করবেন! তিনি শুধোলেন—‘এগুলো কী হবে ভাই?’

বিশ্বামিত্র খানিক কপালে আঙুল বুলিয়ে চিন্তা করে বললেন—‘পাহাড়দের সব ডানা দিয়ে দিতে চাই, তারা যেখানে খুশি—শীতের সময় গরমদেশে, গরমের সময় শীতদেশে, উড়ে-উড়ে বিচরণ করতে পারবে, তা হলে এখানে যারা বাস করবে তাদের আর কোনো অসুবিধে হবে না!’

বিশ্বকর্মা ভয় পেয়ে বলে উঠলেন—‘সর্বনাশ, পাহাড় যেখানে-সেখানে উড়ে বসতে আরম্ভ করলে যে-সব দেশে পাহাড়-পর্বত গিয়ে পড়বে, সে-সব দেশের দশা হবে কী? লোকগুলো-সুদূর সারা-দেশ যে গুঁড়িয়ে ধুলো হয়ে যাবে!’

বিশ্বামিত্র বলে উঠলেন—‘তা কেন! লোকেরা সব ধন-দৌলত খাবার-দাবার নিয়ে পাহাড়ে চড়ে বসবে, তা হলেই কোনো গোল নেই!’ বিশ্বকর্মা বললেন—‘সবাই পাহাড়ে চড়ে ঘুরে বেড়ালে আমার জমিতে হাল দেয় কে, রাজত্বই বা করে কে, ঘর-বাড়িই বা বেঁধে থাকে কে!’

‘তা আমি কী জানি’—বলে বিশ্বামিত্র হিমালয়ে ডানা দিতে যান, এমন সময়ে বিশ্বকর্মা তাঁর হাত চেপে ধরে বললেন—‘আগে হিমালয়ের বাচ্চা এই ছোট-খাটো মন্দর পর্বতটাকে ডানা দিয়ে দ্যাখো, কী কাণ্ড হয়, পরে বড়টাকে নিয়ে পরীক্ষা কোরো।’

বিশ্বামিত্র মন্দর পর্বতে ডানা দিয়ে যেমন ছেড়ে দেওয়া, সে অমনি উড়তে-উড়তে বাঙলাদেশের দক্ষিণ ধারে যে-সব দেশ গড়া হয়েছিল, সেইখানে উড়ে বসল! যেমন বসা অমনি সারাদেশ রসাতলে তলিয়ে গেল; মাটি যেখানে ছিল সেখানে একটা উপসাগর হয়ে গেছে দেখা গেল। মানুষ যারা ছিল তাদের চিহ্ন রইল না, কেবল মাছগুলো জলে কিলবিল করতে লাগল, আর মন্দর পর্বতটা সমুদ্র তোলপাড় করে এমনি সাঁতার কাটতে আরম্ভ করলে যে, জল-প্রাবনে বিশ্বকর্মার ছিষ্টি মাটি ধুয়ে যাবার যোগাড়!

বিশ্বকর্মা তাড়াতাড়ি সমুদ্রের ধারে-ধারে বালির বাঁধ দিয়ে জল ঠেকিয়ে কপালের ঘাম মুছে বললেন—‘আমার হাতের কাজে তোমায় আর হাত দিতে দিচ্ছি নে। এই পৃথিবীর উত্তর শির আর দক্ষিণ শিরে কিছু নেই, কিছু সৃষ্টি করতে হয় সেই দু’জায়গায় করগে। যে-ভুলগুলো করেছ সেগুলো আমাকে শুধরে দিতে দাও এখন!’ বিশ্বামিত্রের হাত থেকে বিশ্বকর্মা গড়বার যন্তর-যন্তর কেড়ে নিয়ে পাহাড়ে যত জল জমা হয়েছিল, সমস্ত নালা কেটে ঝরনা দিয়ে সমুদ্রের দিকে বইয়ে দিলেন। বিশ্বকর্মার

ছিষ্টিতে কিছু বাজে থাকবার যো নেই, নষ্ট হবার যো নেই—পাহাড়ের জল সমুদ্রে পড়ে, সেখান থেকে সূর্যের তাপে মেঘ হয়ে আকাশ দিয়ে দেশ-বিদেশে বিষ্টি দিয়ে ক্ষেতে-ক্ষেতে ফসল গজাতে চলল!

বিশ্বকর্মা ইন্দ্রকে বললেন—‘বাজ দিয়ে মন্দর পর্বতের ডানা কেটে দাও!’ ডানা কাটা গেল, মন্দর সমুদ্রেই ডুবে রইল আর তার ডানার কুচিগুলো এখানে-ওখানে সমুদ্রের মাঝে টাপুর মতো ভাসতে লাগল। বিশ্বকর্মা সেগুলোর উপরে মাটি ছড়িয়ে দিলেন, বসতি বসিয়ে দিলেন। তারপর বিশ্বামিত্র যত ডানা গড়ে রেখেছিলেন সেগুলো দিয়ে বিশ্বকর্মা প্রজাপতি ভোমরা মৌমাছি সব গড়ে ছেড়ে দিলেন। তারা দেশ-বিদেশ থেকে ফুলের রেণ ফুলের মধু এনে পাহাড়ে-পাহাড়ে বাগান বসাতে শুরু করে দিলে। দেখতে-দেখতে পাথরের গায়ে সব ফুল গজাল ফল ফলল। সব ঠিক করে বিশ্বকর্মা প্রকাণ্ড দুই ডানা দিয়ে দক্ষ প্রজাপতি ছিষ্টি করে হাত-পা ধুয়ে ভাত খেতে গেলেন। শাস্ত্রের ছিষ্টিতত্ত্ব তো এই হল, তারপর দক্ষ প্রজাপতির কথা পুরাণে লিখেছে যেমন, বলি শোনো—

বিধির মানস সূত দক্ষমুনি মজবুত
প্রসূতি তাহার ধর্ম-জায়া।
তার গর্ভে সতী নাম অশেষ মঙ্গলধাম
জনম লভিল মহামায়া।
নারদ ঘটক হয়ে নানামতে বলে কয়ে
শিবের বিবাহ দিল সতী।

নারদ তো ঘটকালি নিয়ে সরে পড়লেন, এদিকে শিব ষাঁড়ে চড়ে ভূটিয়ার দলের সঙ্গে ডমরু বাজিয়ে জটায় সাপ জড়িয়ে হাড়মালা গলায় বুলিয়ে নাচতে নাচতে হাজির।
দক্ষ প্রজাপতি ররের চেহারা দেখেই চটে লাল—

শিবের বিকট সাজ
দেখি দক্ষ ঋষিরাজ
বামদেবে হৈল বাম-মতি।

সেই থেকে জামাই স্বশুরের মুখ দেখেন না। দক্ষ প্রজাপতিও শিব-নিন্দে না করে জল খান না। এই সময়ে দক্ষ শিবহীন যজ্ঞ করলেন; সব দেবতা নেমস্তন্ন পেলেন। সতীর বোনেরা গয়নাগাটি পরে পালকি চড়ে শিবের বাড়ির সামনে দিয়ে ঝমর-ঝমর করতে-করতে বাপের বাড়ি মাছের মুড়ো খেতে চলল দেখে সতীর চোখে জল এল। দুঃখী বলে বাবা তাঁদের নেমস্তন্ন পাঠাননি!

সতী বোনেদের পালকির কাছে দিদির গলা ধরে কেঁদে-কেঁদে বললেন :

অশ্বিনীদিদি! আমারে দুখিনী দেখিয়া পিতে
অবজ্ঞা করিয়া যজ্ঞে আজ্ঞা না করিলেন যেতে,
নিজ বাপ নহে অন্য শুনে হৃদে এই ক্ষুণ্ণ
আমা ভিন্ন নেমস্তন্ন করেছেন এই ত্রিজগতে।

অস্থিনীদিদি আঁচলে সতীর চোখের জল মুছিয়ে বললেন—‘তুই চল না। বাপের বাড়ি যাবি তার আবার নেমতন্ন কিসের? আয় আমার এই পালকিতে।’

সতী ঘাড় নেড়ে বললেন—‘না ভাই—তিনি রাগ করবেন!’

‘তবে তুই তাঁকে বুঝিয়ে-সুঝিয়ে পরে আয়’—বলে সতীর দিদিরা—

চতুর্দোলে সবে চড়ি চলিলেন হরষে
হেথায় শঙ্করী ধেয়ে করপুটে দাঙাইয়ে
চরণে প্রণতি হয়ে কহিলেন গিরিশে
আমি বাপের বাড়ি যাব।

শিব বললেন—

সতী তুমি যেতে চাচ্ছ বটে,
পাঠাইতে না হয় ইচ্ছা দক্ষের নিকটে।

আমাদের শ্বশুর জামায়ে কেমন ভাব শোনো—

আমাদের ভাব কেমন জামাই শ্বশুরে, যেমন দেবতা আর অসুরে,
যেমন রাবণ আর রামে, যেমন কংস আর শ্যামে,
যেমন স্রোতে আর বাঁধে, যেমন রাহু আর চাঁদে,
যেমন জল আর আগুনে, যেমন তেল আর বেগুনে,
যেমন পক্ষী আর সাতনলা, যেমন আদা আর কাঁচকলা,
যেমন ঋষি আর জপে, যেমন নেউল আর সাপে,
যেমন ব্যাঘ্র আর নরে, যেমন গোমস্তা আর চোরে,
যেমন কাক আর পেচক, যেমন ভীম আর কীচক।

‘দক্ষ যখন অমান্য করে বারণ করেছেন নিমন্ত্রণ, কেমন করে সেখানে তোমার যাওয়া হয়!’

সতী কিন্তু শোনেন না শিবের কথা, তিনি সেজেগুজে নন্দীকে সঙ্গে নিয়ে মহাদেবের ঘাঁড়ে চড়ে বাপের বাড়ি চললেন দুগ্ধিনী বেশে। কুবের দেখে বাস্ক-ভরা এ-কালের সে-কালের গহনা এনে বললে—‘মা, এমন বেশে কি যেতে আছে! বাপের বাড়ির লোকে বলবে কী—ওমা, একখানা গয়নাও দেয়নি জামাই!’ সতী কুবেরের দেওয়া গহনা পরে সাজলেন, কিন্তু দক্ষ প্রজাপতির কন্যা সতী এমন সুন্দরী যে সোনা হীরে তাঁর সোনার অঙ্গের আলোর কাছে টিম-টিম করতে লাগল। ‘দূর ছাই’ বলে সতী সেগুলো ফেলে দিয়ে পাহাড়ি ফুলের সাজে সেজে বার হলেন। ত্রিলোক সতীর চমৎকার বেশ দেখে ধন্য-ধন্য করতে-করতে সঙ্গে চলল।

এদিকে ছোট মেয়ে সতী এল না, কাজের বাড়ি শূন্য ঠেকছে, সতীর মা কেবলি আঁচলে চোখ মুচছেন এমন সময় দাসীরা এসে প্রসূতিকে খবর দিলে—‘ওমা তোর সতী এল ঐ!’ এই শুনে—

রানী উন্মাদিনী-প্রায়
কৈ সতী বলিয়া অতি বেগে তথা ধায় ।
অধিকারে দৃষ্টি করি বাহিরেতে এসে
আয় মা বলে লইয়া কোলে
নয়ন জলে ভাসে ।

সতী মায়ের কাছে বসে একটু দুধ সন্দেশ খেয়ে সভা দেখতে চললেন । ইন্দ্র চন্দ্র
সব বসেছেন, বিশ্বামিত্র বশিষ্ঠ সব বসেছেন দক্ষ প্রজাপতিকে ঘিরে, আর কালোয়াত
সব গান-বাজনা করছে---

ধিরু কটু কুট তানা নানা তাদিম তা, তা দিয়ানা ঝেন্না ঝেন্না
নাদেরে দানি তাদেরে দানি, ওদেরে তানা দেরে তানা
তা দিম তারয়ে তারয়ে দানি ।
দেতারে তারে দানি ধেতেনে দেতেনে নারে দানি ।

বেশ গান-বাজনা চলেছে—এমন সময় সভাতে সতীকে আসতে দেখেই দক্ষ শিব-
নিন্দে শুরু করলেন । দক্ষ প্রজাপতি :

কেবল এ গ্রহ আনি নারুদে ঘটালে,
কনিষ্ঠা কন্যাটা আমি দিলাম জলে ফেলে;
বজ্রবিনা বাঘছাল করে পরিধান,
দেবের মধ্যে দুঃখী নাই শিবের সমান ।
ভূত সঙ্গে শূশানে-মশানে করে বাস,
মাথার খুলি বাবাজীর জল খাবার গেলাস!
যায় বলদে বসে গলদেশে মালাগুলো সব অস্থি,
সিদ্ধি ঘোঁটার সদাই ঘটা বুদ্ধি সেটার নাস্তি;
অদ্ভুত সঙ্গেতে ভূত গলায় সাপের পৈতে,
তারে আনিলে ডেকে হাসিবে লোকে—তাই হবে কি সইতে!
পাগলে সম্ভাষা করা কোন প্রয়োজন,
সাগরে ফেলেছি কন্যা বলে বুঝাই মন ।

দক্ষের শিব-নিন্দা শুনে সতী আর সইতে পারলেন না ।

পাতি-নিন্দা শুনি সতী জীবনে নৈরাশ,
ঘন-ঘন চক্ষে ধারা সঘনে নিশ্বাস;
পিতারে কুপিতা হইয়া অঙ্গ অবসান,
ধরা শয্যা করি 'তারা' ত্যেজিলেন প্রাণ!

সতী শিব-নিন্দা শুনে প্রাণত্যাগ করলেন, চারদিকে হাহাকার উঠল । সতীর সাতাশ
বোন আকাশের তারা সব কাঁদতে লাগল, নন্দী কাঁদতে লাগল, ভূঙ্গী কাঁদতে লাগল,

দেবতারা কাঁদতে লাগলেন, মানুষেরা কাঁদতে লাগল—

ফিরে চাও মা বাঁচাও পরাগী,
ধুলাতে পতিত কেন পতিত-পাবনী;
দুটি নয়ন-তারা মুদিয়া তারা—
অধরা কেন ধরাসনে!

নন্দী গিয়ে কৈলাসে মহাদেবকে খবর দিলে—‘মা আর নেই।’ তখন শিব ক্রোধে
হুঙ্কার ছাড়লেন, অমনি শিবদাস সব দক্ষযজ্ঞ নাশ করতে আশ্রয়ান হল। মহাদেব
যুদ্ধে চললেন, পৃথিবী কাঁপতে থাকল, মেঘ সব গর্জন করে উঠল, আকাশে বিদ্যুৎ বাজ
ছুটোছুটি করতে থাকল কড়মড় করে, শিব ত্রিশূল হাতে সাজলেন—

মহারুদ্র রূপে মহাদেব সাজে,
ভবধ্বম ভবধ্বম সিঙ্গা ঘোর বাজে;
ফণাফণ ফণাফণ ফণী ফল্ল গাজে
মহারুদ্র রূপে মহাদেব সাজে;
ধকধক ধকধক জ্বলে বহি ভালে,
ববধ্বম ববধ্বম মহাশব্দ গালে;
ধিয়াতা ধিয়াতা ধিয়া ভূত নাচে
উলঙ্গী উলঙ্গে পিশাচী পিশাচে।
চলে ভৈরবা ভৈরবী নন্দী ভঙ্গী
মহাকাল বেতাল তাল ত্রিশঙ্গী,
চলে ডাকিনী যোগিনী ঘোর বেশে
চলে শাখিনী পতিনী মুক্ত কেশে।

ভূত-প্রেত নিয়ে শিব এসে উপস্থিত। ভয়ে কারু মুখে কথা নেই, মহাদেব হুকুম
দিলেন ভূতিয়া ফৌজকে—যজ্ঞনাশ করো। অমনি—

রুদ্রদূত ধায় ভূত নন্দী ভঙ্গী সঙ্গিয়া
ঘোরবেশ মুক্ত কেশ যুদ্ধ রঙ্গ রঙ্গিয়া,
যক্ষ রক্ষ লক্ষ লক্ষ অট্ট অট্ট হাসিছে
যজ্ঞগেহ ভাঙ্গি কেহ হব্যগব্য খাইছে,
প্রেতভাগ সানুরাগ ঝম্প ঝম্প ঝাঁপিছে,
ঘোররোল গগণোল চৌদ্দলোক কাঁপিছে;
ভূত ভাগ পায় লাগ লাগি কিল মারিছে
বিপ্র সর্ব দেখি খর্ব ভোজ্য বস্ত্র সারিছে
ভার্গবের সৌষ্ঠবের দাড়ি গৌফ ছিঙিল
পুশ্ণের ভূষণে দস্ত পাঁতি পড়িল,
ছাড়ি মন্ত্র ফেলি তন্ত্র মুক্ত কেশ ধায় রে,
হায় হায় প্রাণ যায় পাপ দক্ষ দায় রে!

নৈবিদ্যের থালা ফেলে বিশ্বামিত্র দৌড়—বশিষ্ঠ চম্পট, সবার দাড়ি গৌফ ছিড়ে
কিলিয়ে দাঁত ভেঙে ভূতেরা লক্ষ-বম্প করতে লাগল—

মৌনী তুণ হেঁট মুণ দক্ষ মৃত্যু জানিছে
মৈল দক্ষ, ভূত যক্ষ সিংহনাদ ছাড়িছে।

দক্ষ-নিপাত দেখে সতীর মা কেঁদে শিবকে বললেন—

সতীর জননী আমি, শাশুড়ী তোমার,
তথাপি বিধবা দশা হইল আমার?
প্রসূতির বাক্যে শিব সলজ্জ হইল,
রাজাসহ দক্ষরাজে বাঁচাইয়া দিল।
ধড়ে মুণ নাহি দক্ষ দেখিতে না পায়,
উঠে পড়ে ফিরে ঘুরে কবন্ধের প্রায়—

কন্দ-কাটা দক্ষের দুর্গতি দেখে ভূতেরা সব হাসতে লাগল, তখন শিবের হাতের
কাছে ছিল পাহাড়ি একটা রামছাগল দড়ি দিয়ে হাড়-কাঠে বাঁধা। তিনি সেইটে নন্দীকে
দেখিয়ে দিলেন। নন্দী তার মুড়োটা কেটে দক্ষের কাঁধে জুড়ে দিয়ে দক্ষ প্রজাপতির
ডানাদুটো কেটে নিয়ে চলে গেল, শিব সতীদেহ নিয়ে কাঁদতে-কাঁদতে কৈলাসে
গেলেন! এর পরে আরও কথা আছে, কিন্তু এইখানেই দক্ষযজ্ঞ শেষ—হরি হরি বলো
সবে পালা হৈল সার— বলে রিদয় চুপ করলে।

রামছাগল ফ্যালফ্যাল করে তাকালে, খানিক চেয়ে থেকে বললে—“ফুঃ, এমন
আজগুবি কথা তো কখনো শুনিনি। বুড়ো হয়ে শিং ক্ষয়ে গেল, এমন কথা তো
কোনোদিন শুনলেম না যে প্রজাপতির মাথা হয় রামছাগলের মতো আর পাহাড়গুলোর
গজায় ডানা!”

রামছাগল ছেলেদের বললেন :

ওসব বাজে কথায় বিশ্বাস কোরো না, বড় হয়ে মধুর সন্ধানে পেটের দায়ে তোমরা
জানি দেশ-বিদেশে যাবে, এমন অনেক বাজে গল্পও তোমাদের এই দেশের পাহাড়-
পর্বত নদ-নদীর নামে শুনতে পাবে। কেউ বলবে তোমার দেশ মন্দ, কেউ বলবে মন্দ
নয়, কিন্তু মনে রেখো, এই হিমালয়ের জলে বাতাসে তোমরা মানুষ, ভগবান
তোমাদের জন্যে সবচেয়ে ভালো, সবচেয়ে উঁচু, সবচেয়ে চমৎকার বাড়ি দিয়েছেন।
এই কথাটি সর্বদা মনে রেখো, কোনোদিন ভুলো না যে পৃথিবীর সেরা হচ্ছে এই
হিমালয়, আর সেইটে ভগবান দিয়েছেন তাঁর কালো ছেলেদের। এই পাথরের সিঁড়ি
এতকালের পুরোনো যে তার ঠিক-ঠিকানা নেই। আগে এটা, তারপর গাছপালা, জন্তু-
জানোয়ার সৃষ্টি হয়েছে। পাখির ছানাগুলো জন্মাবার আগে যেমন তাদের বাসা তৈরি
হয়ে থাকে, মানুষদের, জানোয়ারদের জন্মাবার আগে তেমনি জগৎমাতা আর
বিশ্বপিতা তাদের জন্যে এই চমৎকার হিমালয় আর সমুদ্র পর্যন্ত গেছে যে পাঁচ ধাপ
পাথরের সিঁড়ি তা প্রস্তুত করিয়েছিলেন। জীব-জন্তুরা জন্ম যাতে আরামে থাকে, কষ্ট

না পায় সেইজন্যে চমৎকার করে পাথর দিয়ে দালান রক এমনি সব নানা ঘর নানা বাড়ি তাঁরা সুন্দর করে বাঁধিয়ে দিলেন!

কিন্তু কত কালের এই বাড়ি, একে পরিষ্কার রাখা, মেরামত রাখা, যারা জন্মাতে লাগল তাদের তো সাধ্য হল না, এককালের নতুন বাড়ি পাথরের সিঁড়ি সব ভেঙে ফেটে পড়তে লাগল, বর্ষায় এখানে-ওখানে সোঁতা লাগল, শেওলা গজাল, হাওয়াতে ধুলো-মাটি এসে ধাপগুলোতে জমা হতে থাকল, ঝড়ে ভূমিকম্পে বড়-বড় পাথর খসে-খসে এখানে-ওখানে পড়ল, এখানটা ধসে গেল, সেখানটা বসে গেল, ওটা ভেঙে পড়ল, সেটা বোঁকে রইল, এইভাবে কালে-কালে ধাপগুলোর উপরের তলার মাটি তাকে ধুয়ে নিচের তলায় নামতে লাগল; আর ধাপে-ধাপে সেখানে যেমন মাটি পেলে নানা জাতের গাছপালা বন-জঙ্গল দেখা দিলে। উপর-তলার মাটি ধুয়ে গেছে সেখানে কাঁকর আর নুড়িই বেশি, তার পরের ধাপে অল্প মাটি আছে সেখানে অল্পসল্প চাষবাস চলেছে দ্যাখো, খুব ছোট-ছোট ক্ষেত, ছোট গ্রাম। মাঝের ধাপে অনেকটা মাটি জমা হয়েছে। সেখানে দ্যাখো দার্জিলিং শহর বাড়ি-ঘর বাজার চা-বাগান। কোম্পানির বাগান সব বসে গেছে, উপরতলার মতো অতটা ঠাণ্ডাও নয়, কাজেই সেখানে নানা গাছ ঝাউ বাদাম আখরোট পিচ পদম সব তেজ করেছে। নানা ফুলও সেখানে।

কিন্তু হিমালয়ের সব নিচের ধাপে যত কিছু ভালো মাটি এসে জমা হয়েছে জলে ধুয়ে একেবারে সমুদ্রের ধার পর্যন্ত, সেখানে ফল-ফুলের বাগান ক্ষেতের আর অন্ত নেই, মাটিতে সেখানে এত তেজ যে, যা দাও ফলবে, আর সেখানে শীতও বেশি নয় বরফও পড়ে না, সেখানে গাছ এক-একটা যেন একখানা গ্রাম জুড়ে রয়েছে, আর চারদিকে আম-কাঁঠালের বন।

পাহাড়ে বরফ পড়লে আমি ইস্কুল বন্ধ করে সেখানে চরতে যাই, নিজের চোখে দেখে এসেছি যা, তাই বলছি। ঋষিদের মতো চোখ বুজে ধ্যান করে গল্প বলবার জন্যে আমি ইস্কুল-মাস্টারি করতে আসিনি। ছাত্রগণ! চোখ দিয়ে দেখাই হল আসল দেখা, ঠিক দেখা, আর চোখ বুজে ধ্যান করে দেখবার মানে খেয়াল দেখা বা স্বপন দেখা। খেয়ালিদের বিশ্বাস কোরো না, তা তাঁরা ঋষিই হন, কবিই হন, যা দুই চোখে দেখছি তাই সত্যি, তা ছাড়া সব মিছা, সব কল্পনা, গল্পকথা, খেয়াল!

রামছাগল দাড়ি নেড়ে শিং বেঁকিয়ে কটমট করে তাদের দিকে তাকাচ্ছে দেখে সুবচনীরা খোঁড়া-হাঁস হেলতে-দুলতে এগিয়ে এসে বললে—“ছাত্রগণ, তোমাদের মাস্টার যা বললেন ঠিক, চোখে না দেখলে কোনো জিনিসে বিশ্বাস করা শক্ত। কিন্তু এই পাহাড় পর্বত কুয়াশায় যখন দেখা যায় না, তখন কি বলতে হবে কুয়াশার মধ্যে কিছু নেই? না বলতে হবে, সূর্য চন্দ্র আকাশ ছেড়ে পালিয়েছেন। ঠিক জিনিস সব সময়ে চোখে পড়ে না, সেইজন্য এই দুই চোখের উপরে নির্ভর করে থাকি বলে আমরা কোনোদিন মানুষের সমান হতে পারব না। মানুষের মধ্যে যাঁরা ঋষি, যাঁরা কবি, তাঁরা শুধু দুই চোখে দেখলেন না, তাঁরা ধ্যানের চোখে যা দেখতে পেয়েছেন সেইগুলো ধ্যান করে কেতাবে লিখেছেন, তা পড়লে তোমরা জানতে পারবে—এই হিমালয় প্রথমে সমুদ্রের তলায় ছিল। হঠাৎ একসময় পৃথিবীর মধ্যকার তেজ মহাবেগে জল ঠেলে

আকাশের দিকে ছুটে বার হল আর তাতেই হল সব পর্বত। যে-সময় পাহাড় হয়েছিল সে-সময় কেউ দেখেনি কেমন করে কী হল, কিন্তু মানুষ ধ্যান করে অনুসন্ধান করে এই পাহাড়ের জন্য যেন চোখে দেখে কেতাব লিখেছে।”

“মাষ্টার মহাশয়ের কথায় কি কেতাবগুলো অবিশ্বাস করবে!” বলে খোঁড়া একটি সমুদ্রের শাঁখ পাহাড়ের উপর থেকে তুলে নিয়ে রামছাগলকে দেখিয়ে বললে—“হিমালয় তো এককালে সমুদ্রের গর্ভে ছিল, এই শাঁখই তার প্রমাণ!”

রামছাগল ঘাড় নেড়ে বললে—“ওকথা আমি বিশ্বাসই করিনে। নিশ্চয় কোনো পাখিতে এনে ওটাকে ফেলেছে।”

খোঁড়া বললে—“তা হয় না। সমুদ্রের একেবারে নিচের থাকে এই শামুক, পাখি সেখানে যেতে পারে না।”

রামছাগল তর্ক তুললে—“তবে মাছে খেয়েছে, সেই মাছ মরে ভেসে এসেছে সমুদ্রের ধারে, সেখানে পাখি তাকে খেয়ে শাঁখটা মুখে নিয়ে হিমালয়ে এনে ফেলেছে!”

খোঁড়া ঘাড় নেড়ে বললে—“তাও হয় না। সমুদ্রে যেখানে এই শাঁখ থাকত, সেখানে মাছ কেন, মানুষ পর্যন্ত যেতে পারা শক্ত!”

রামছাগল অমনি দাড়ি চুমড়ে বললে—“তবে মানুষ জানল কেমন করে এ-শাঁখ সমুদ্রের তলাকার, পাহাড়ের উপরকার নয়।”

সুবচনী পাছে তর্কে হেরে যায় রিদয় তাই তাড়াতাড়ি বলে উঠল—“জানো না, মানুষ ডুবুরি নামিয়ে মুক্তা তোলবার সময় এইসব শাঁখ কুড়িয়ে এনেছিল বুড়ি-বুড়ি!”

রামছাগল শিং নেড়ে বললে—“বুড়ি থেকে তারি গোটাকতক শাঁখ হয়তো মাটিতে পড়ে গিয়েছিল।” হঠাৎ সুবচনী বললে—“তা নয়”—সুবচনী আরো কী বলতে যাচ্ছে অমনি ছাগল রেগে বললে—“তা যদি নয় তো নিশ্চয় আগে শাঁখের সব ডানা ছিল, উড়ে এসেছে হাঁসেদের মতো এই পাহাড়ে।”

রিদয় অমনি বলে উঠল—“শাঁখের যদি ডানা থাকতে পারে তবে পাহাড়গুলোরও ডানা ছিল একথাই বা কেন বিশ্বাস করবে না?”

সুবচনী অমনি বলে উঠল—“আর প্রজাপতির মাথায় রামছাগলের মুখই বা না হবে কেন, তা বলা!”

ভালুকে-শোয়ালে হাঁসে-ছাগলে তর্ক বেধে গেল, দেশের জানোয়ার সেই তর্কে যোগ দিয়ে চঁচামেচি হট্টগোল বাধিয়ে দিলে।

শিকরা বহরী বাসা বাজা তুরমুতি
কাহা কুহী লগড় ঝগড় জোড়াখুতি
ঠেটি ভেটি ভাটা হরিতাল গুড়গুড়
নানাজাতি কাক পঁচা বাবুই বাবুড়।

সবাই মিলে তর্ক লাগিয়েছে—“যাও-যাও হুঁদি খাও!” এমন সময় গগুগোল শুনে পাহাড়ের গুহা থেকে বুড়ো লামা-ছাগল বেরিয়ে এলেন—

অতিদীর্ঘকক্ষ লোম পড়ে উরু পর
নাভি ঢাকে দাড়ি গোঁফে বিশদ চামর ।

ববম-বম ববম-বম বলতে-বলতে লামাকে আসতে দেখে সবাই তটস্থ,
ভালোমানুষ হয়ে বসল । লামা বললেন—“তোমরা সব কী বৃথা তর্ক করছ? দ্যাখো
তর্ক কী ভয়ানক ব্যাপার, কোথায় তোমরা পড়া পড়বে, না, হাতাহাতি বাধিয়েছ
ভায়ে-ভায়ে—”

অভেদ হইল ভেদ এ বড় বিরোধ
কী জানি কাহারে আজি কার হয় ক্রোধ!
ভ্রান্তজীব অন্ত না বুঝিয়ে করো হৃদ্য,
কারো কিছু ঠিক নাই কেবল কহ মন্দ;
উভয়ের মন তোরে মন্ত্রণা আমি কই,
তর্কে নাহি মেলে কিছু গুণগোল বই;
শুন বাক্য গুরুবাক্য করেছে প্রামাণ্য;
একে পঞ্চ পঞ্চ এক, নাই কিছু অন্য!

লামা-ছাগল লেকচার শেষ করলেন অমনি বোকা ছাগলের দল জাতীয় সঙ্গীত শুরু
করে দিলে—

জটজালিনী ক্ষুরশালিনী,
শিংঅধারিণীগো—
ঘনঘোষিণি ঘাস-খাদিনি,
গৃহ-পোষিণি গো ।
চোঁ ভোঁ পোঁ পোঁ ।

সেই সময় ভূমিকম্পে পাহাড় টলমল করে উঠল, অমনি হাঁসেরা রিদয়কে নিয়ে
আকাশে উড়ে পড়ল । সব জানোয়ার ভয়ে লেজ গুটিয়ে চুপ হয়ে রইল! লামা-ছাগল
মাঝে দাঁড়িয়ে দুলতে থাকলেন আর বলতে থাকলেন, “একি দোলায় যে, এঁয় কী
ভয়ানক বিয়াপার!”

রামছাগল লামার গা ঘেঁষে দাঁড়িয়ে বললেন—“পর্বতটা পার্বতী-পাঠশালা-সমেত
উড়বে নাকি—এঁয়ঃ!”



যোগী-গোফা

রূপো নদীটি খুব বড় নদীও নয় ম্যাপেতেও তার নাম ওঠেনি। ঘুম আর বাতাসিয়া দুই পাহাড়ের বাকের মধ্যে ছোট একটি ঝরনা থেকে বেরিয়ে নদীটি পাহাড়েরা গা বেয়ে দু-ধারের বনের মাঝ দিয়ে নুড়ি-পাথর ঠেলে আস্তে-আস্তে তরাইয়ের জঙ্গলে নেমে গেছে, নদীর দু-পার করঞ্চা টেপারি তেলাকুচো বৈচী ডুমুর জাম এমনি সব নানা ফল নানা ফুলগাছে একেবারে হাওয়া করা, মাথার উপরে আকাশ সবুজ পাতার ছাউনিতে ঢাকা, তলায় সরু নদীটি ঝির-ঝির করে বয়ে চলেছে! এই পাখির গানে ভোমরার গুনগুনে ফুল-ফলের গন্ধে জলের কুলকুল শব্দে ভরা অজানা এই নদীর গলিপথ দিয়ে হাঁসেরা নেমে চলেছে আবার শিলিগুড়ির দিকে। উপরে মেঘ করেছে, বনের তলা অন্ধকার। শেওলা জড়ানো একটা গাছের ডাল একথোকা লাল ফুল নিয়ে একেবারে নদীর জলে ঝুঁকে পড়েছে, তারি উপরে লাল টুপি নীল গলাবন্ধ সবুজ কোর্তা পরে-পরে মাছরাঙা নদীতে মাছ ধরতে বসেছে বাদলার দিনে। নদীর মাঝে একরাশ পাথর ছড়ানো; তারি কাছাকাছি এসে চকা হাঁক দিলে—‘জিরওবো, জিরওবো।’ অমনি মাছরাঙা সাড়া দিলে—‘জিরোও-জিরোও।’ আস্তে-আস্তে হাঁসের দল ঝরনার স্রোতে পিছল পাথরগুলোর উপর একে-একে উড়ে বসল। এমনি জায়গায়-জায়গায় জিরিয়ে-জিরিয়ে চলতে-চলতে সন্ধ্যা হয়ে এল, নিচের অন্ধকার পাহাড়ের চূড়োর দিকে আস্তে-আস্তে উঠতে আরম্ভ করলে, মনে হচ্ছে কে যেন বেগুনি কব্বলের ঘেরাটোপ দিয়ে একটার পর একটা পর্বত মুড়ে রাখছে, দেখতে-দেখতে আকাশ কালো হয়ে গেল, তারি মাঝে গোলাপি এক-টুকরো ধোঁয়ার মতো দূরের বরফের চূড়া রাত্রের রঙের সঙ্গে ক্রমে মিলিয়ে গেল।

পাহাড়ের গলিতে অন্ধকার যে কী ভয়ানক কালো রিদয় আজ টের পেলে, নিজেকে নিজে দেখা যায় না, কোনদিক উপর কোনদিক নিচে চেনা যায় না, কিন্তু অন্ধকারেও

ঘাঁটিতে-ঘাঁটিতে রাতের পাখিরা পাহারা দিচ্ছে। এ-পাহাড়ে এক পাখি হাঁকলে—“হুহ বাতাস হুহ”, ও-পাহাড়ের পাখি তারি প্রতিধ্বনি দিয়ে বলে উঠল—“ঘুটঘুট আঁধার ঘুটঘুট।” দুই পাখি থামল, আবার খানিক পরে দুই পাখি আরম্ভ করলে—“জল পিটপিট তারা মিটমিট।” বোঝা গেল এখনো বিষ্টি পড়ছে, দু-একটি তারা কেবল দেখা দিয়েছে। ভালুক-ভালুকী ঝরনার পথে জল খেতে নেমেছে, তাদের চেহারা দেখা যাচ্ছে না, কেবল বলাবলি করছে শোনা যাচ্ছে—“সেঁৎ-সেঁৎ।” একটা হরিণ কিম্বা কী বোঝা গেল না হঠাৎ বলে উঠল—“পিছল।” তারপরেই পাহাড়ের গা দিয়ে একরাশ নুড়ি গড়িয়ে পড়ল।

রাতে যে এত জানোয়ার চারদিকে ঘোরাঘুরি হাঁকাহাঁকি করে বেড়ায়, তা রিদয়ের জানা ছিল না। আঁধারের মধ্যে কত কী উসখুস করছে, খুসখুস করছে, চলছে, বলছে—কত সুরে কত রকম গলায় তার ঠিক নেই। রিদয়ের মনে হল বাতাসটা পর্যন্ত যেন বনের সঙ্গে ফুসফাস করে এক-একবার বলাবলি করে যাচ্ছে। তখন রাত গভীর। ঝিঝি পোকা বলে চলেছে ঝিম ঝিম, ঝরনা বলছে ঘুম-ঘুম, রিদয়ের চোখ ঢুলে আসতে লাগল। সেই সময় দূরে শোনা গেল—“ইয়া-হু ইয়া-হু” তারপর একেবারে রিদয়ের যেন কানের কাছেই ডেকে উঠল বিকট গলায় কী এক জানোয়ার—“তোফা-হুয়া তোফা-হুয়া।”

রিদয় চমকে উঠে শুনলে, কখনো এ-পাহাড়ে কখনো ও-পাহাড়ে দূরে-কাছে আগে-পাছে উপরে-নিচে যেন দলে-দলে কারা চীৎকার লাগিয়েছে—“ইয়া-হু ইয়া-হু তোফা-হুয়া তোফা-হুয়া।” ভয়ে রিদয়ের গায়ে কাঁটা দিয়ে উঠল। সে চকার গা ঘেষে শুধোলে—“এ কী ব্যাপার?”

চকা অমনি বললে—“চুপ-চুপ কথা কয়ো না, ডালকুত্তা শিকারে বেরিয়েছে”—বলতে-বলতে ছায়ার মতো একটা হরিণ ওপার দিয়ে দৌড়ে জলের ধারে এসে থরথর করে কাঁপতে লাগল! ঠিক সেই সময় নদীর দুই পারে শব্দ উঠল—যেন একশো কুত্তা একসঙ্গে ডাকছে—“হুয়া-হু হুয়া-হু হুয়া-হু!” ঝপাং করে জলে একটা ছায়া লাফিয়ে পড়ল, তারপর পিছল পাথরের উপর খুরের আঁচড় বসিয়ে ভিজে গায়ে হরিণ এসে রিদয়ের পাশে দাঁড়িয়ে জোরে-জোরে শ্বাস টানতে-টানতে কেবলি ঘাড় ফিরিয়ে চারদিকে চাইতে লাগল। চকা হরিণের ভয় দেখে বললে—“ডালকুত্তা রইল কোন পাহাড়ে তুমি এখানে ভয়ে কাঁপছ দেখি!”

রিদয় বললে—“সে কী এই পাহাড়েই তো এখনি ডাকছিল কুকুরগুলো।”

চকা হেসে বললে—“কুকুরগুলো নয়, একটা কুকুর ডাকছিল, তাও খুব দূরে। ডালকুত্তার ডাকের মজাই এই, একটা ডাকলে মনে হবে যেন দশটা ডাকছে—দূরে কাছে চারদিকে—ভয়ে কোনদিকে যাব ভেবে পাওয়া যায় না, বুদ্ধি লোপ পেয়ে যায়। ডালকুত্তার ডাক শুনে ভয় পেয়ে ছুটছুটি করেছ কি মরেছ। ঠিক পায়ের শব্দ শুনে কুত্তা এসে তোমায় ধরেছে, যেখানে আছ সেইখানেই বসে থাকো চুপটি করে, তোমার সন্ধানও পাবে না ডালকুত্তা।”

হরিণ চকার কথায় কতকটা সাহস পেলে বটে কিন্তু তখনো ভয়ে তার কান দুটো

কেঁপে-কেঁপে উঠছে, এমন সময় পিছনে অন্ধকারে খেকশেয়াল খেক করে হেসে উঠল, হরিণছানাটা একলাফ দিয়ে একেবারে নদী টপকে উপরের পাহাড়ে দৌড় দিলে। চকা বলে উঠল—“কে ও খেকশেয়াল নাকি?”

এই পাহাড়ে যে চাঁদপুরের শেয়াল এসে উপস্থিত হবে তা চকা ভাবেনি, আর খেকশেয়ালও মনে করেনি হাঁসদের দেখা পাবে সে এখানে। শেয়াল আনন্দে চীৎকার আরম্ভ করলে—“হ্যা-হ্যা হ্যা-উয়া বাহোয়া ওয়া-ওয়া!”

চকা শেয়ালকে ধমকে বললে—“চুপ অত গোল কোরো না, এখনি ডালকুত্তা এসে পড়বে, তখন তুমিও মরবে আমরাও মরব।”

শেয়াল একগাল হেসে বললে—“এবার আমি বাগে পেয়েছি, ডালকুত্তা লেলিয়ে দিয়ে তবে ছাড়ব। সেদিন বড় যে হাঁসবাজি দেখানো হয়েছিল, এইবার শেয়ালবাজিটা দেখে নাও।” বলেই শেয়াল ডাকতে লাগল—“হ্যা-উহা হ্যা-উহা—তোদের জন্য আমার আর দেশে মুখ দেখাবার যো নেই!”

চকা নরম হয়ে বললে—“অত চেঁচাও কেন, তুমি আগে আমাদের সঙ্গে লেগেছিলে। আমাদের দলের লুসাই আর বুড়ো-আংলা দুজনকে খেতে চেয়েছিল, তবে না আমরা তোমায় জন্ম করেছি, আমরা তো মিছিমিছি তোমার সঙ্গে লাগতে যাইনি।”

শেয়াল দাঁত কড়মড় করে বললে—“ওসব আমি বুঝিনে, বিচার আমার কাছে নেই। বুড়ো-আংলাটিকে আমার দু-পাটি দাঁতের মধ্যে যদি হাজির করে দাও তো এবার ছাড়া পাবে, না হলে ডালকুত্তা এল বলে!”

চকা মুখে সাহস দেখিয়ে বললে—“আসুক না কুত্তা, এই ঝরনার মধ্যে পাথরের উপরে আর আসতে হয় না—জলে নেমেছে কি কুটোর মতো কোথায় তলিয়ে যাবে তার ঠিক নেই। রিদয়কে আমরা কিছুতেই ছেড়ে দেব না শেয়ালের মুখে, মরি সেও ভালো।” চকা খুব তেজের সঙ্গে এই কথা বললে বটে কিন্তু রিদয় দেখলে ভয়ে তার লেজের ডগাটি পর্যন্ত কাঁপছে। চকা চুপিচুপি তাদের সবাইকে বললে—“সাবধান, বড় গোল এবারে, যে অন্ধকার উড়ে পড়বার যো নেই, ডালকুত্তা পাকা সাঁতার, বিষম জোরালো, ঝরনা মানবে না সাঁতরে উঠবে। সে জলের কুমির, ডাঙার বাঘ বললেই হয়। সব সাবধান, যে যার সামলে, দেখতে না পায় পাথরের সঙ্গে মিশিয়ে বসো!”

হাঁস অমনি ডানায় মুখ ঢেকে গুটিসুটি হয়ে এক-এক পাথরের মতো এখানে-সেখানে চেপে বসল, কালো বুনো-হাঁসের ডানার রঙে পাথরের রঙে এমন এক হয়ে গেল যে, দু-হাত তফাত থেকে চেনা যায় না, হাঁস কি পাথর। কিন্তু সুবচনীর হাঁস—তার শাদা রঙ অন্ধকারেও ঢাকা গেল না, সে রিদয়কে বুকুর কাছে নিয়ে বললে—“দ্যাখো ভাই এবার তোমার হাতে মরণ বাঁচন।”

রিদয় নিজের টেক থেকে নরুনের মতো পাতলা ছুরিটি বার করে বললে—‘দেখছ তো আমার অন্তর!’

হাঁস বললে—“অন্তরে ভালো করে শান দিয়ে রাখো।”

ঠিক সেই সময়ে উপর থেকে একবার ডাক এল—“ইয়াহ্!” তার পরেই ঝপাং করে জলে পড়ে ডালকুত্তা হাঁসের দিকে সাঁতরে আসছে দেখা গেল। শেয়ালটা

ঝোপের আড়াল থেকে চোঁচিয়ে উঠল—“হুয়া-হুয়া হত্যা হুয়া!”

শেয়াল দেখলে, কুত্তা জল থেকে একটা বাঁকা-নখওয়ালা লাল থাবা শাদা হাঁসটির দিকে বাড়িয়ে দিলে। হাঁসটা কখন কোঁক করে ওঠে শেয়াল ভাবছে ঠিক সেই সময়ে ডালকুত্তা “উঁয়াহুঃ” বলে ডিগবাজি খেয়ে জলে পড়ে হাবুডুবু খেতে-খেতে হাঁচড়ে-পাঁচড়ে ওপারে উঠল, আর ডানা ঝটপট করে হাঁসের দল অন্ধকার দিয়ে একদিকে উড়ে পালাল।

শেয়ালের ইচ্ছে হাঁসের পেছনে তাড়া করে চলে, কিন্তু ব্যাপারটা হল কী সেটা জানতে তার লোভ হচ্ছে, সে ওপর থেকে ডালকুত্তাকে ডাক দিয়ে শুধোলে—“ক্যায়া-হুয়া ক্যায়া-হুয়া?”

রিদয়ের নরুনের ঘায়ে তখন ডালকুত্তা অস্থির! সে রেগে বললে—“চোপরাও যাও-যাও!”

শেয়াল বললে—“কী দাদা, হাত ফসকে গেল নাকি?”

কুত্তা গা ঝাড়া দিয়ে বললে—“শাদা হাঁসটাকে টেনে নিয়েছিলুম আর কি, কী জানি সেই সময় টিকটিকির মতো একটা কী জানোয়ার হাতে এমন দাঁত বসিয়ে দিলে যে চোখে আমি সরষে-ফুল দেখলুম!” কুত্তা তার থাবা চাটতে বসে গেল।

শেয়াল “হাঃ-গিয়া হাঃ-গিয়া” বলে কাঁদতে-কাঁদতে হাঁসেদের সঙ্গে আবার দৌড়ল। হাঁসেরা রিদয়কে নিয়ে দুই পাহাড়ের গলির মধ্যে দিয়ে কেবল কুলকুল জলের শব্দটি ধরে একেবেঁকে উড়ে চলেছে অজানা জায়গায়, কোথায় গিয়ে বসে ঠিক পাচ্ছে না, এমন সময় মেঘ কেটে আকাশে চাঁদ উঠল, তখন আর চকাকে পায় কে, বকবাকে সঝ সাপের মতো নদীর ধারাটির উপরে চোখ রেখে চকা হাঁসের দলকে নিয়ে সোজা নিচ মুখে নেমে চলল। সিনিবালি চা-বাগানের উপরটায় এসে নদী একটা বড় পাথর ঘুরে ঝরনা দিয়ে একেবারে দুশো হাত নিচে পড়েছে, চাতালের মতো সেই পাথরে এসে চকা দলবল নিয়ে বাকি রাতটা কাটাতে বসল।

ঝরনার একদিকে ধাপে-ধাপে চা-বাগান পাহাড়ের চূড়ো পর্যন্ত সিঁড়ির মতো উঠে গেছে, আর একদিকে বনের ধারে চা-বাগানের মালিকের ঘর-বাড়ি সেখান থেকে পাকদণ্ডি নেমেছে ঝরনা পর্যন্ত। হাঁসেরা রাতে এখানে-ওখানে উড়ে হাঁপিয়ে পড়েছিল, সবাই তারা ঘুমিয়ে পড়ল, রিদয় কেবল জেগে পাহারা দিতে লাগল।

খানিক রাতে বনের মধ্যে একটা ঝটপট শব্দ শোনা গেল, তার পরই রিদয় দেখলে ডালকুত্তার সঙ্গে শেয়াল কী ফুসফাস করতে-করতে পাকদণ্ডি দিয়ে নামছে, অন্ধকারে দুজনের চোখ আগুনের মতো জ্বলছে। রিদয় তাগ করে একটা পাথর কুচি ছুড়ে শেয়ালটাকে মারতে যাবে ঠিক সেই সময় একটা পাহাড়ি সাপের গায়ে তার হাত পড়ল, ঠাণ্ডা যেন বরফ! রিদয় একেবারে হাঁসের পিঠে লাফিয়ে উঠে বললে—“পালাও-পালাও, শেয়ালটা এবারে আমাদের সাপে খাওয়ার মতলব করেছে।”

হাঁসেরা একেবারে ডানা মেলে আকাশে যেমন লাফিয়ে উঠল, ঠিক সেই সময় পাথরের হাতুড়ির মতো পাহাড়ি সাপের মাথাটা সোঁ করে তাদের পায়ের নিচ দিয়ে ছুটে এসে পাথরে ছোবল দিল। চকা শিয়ালের উপর ভারি চটেছে, নদীর উপর দিয়ে

গেলে শিয়ালটা সহজে তার সঙ্গ ছাড়বে না বুঝে চকা এবারে একেবারে উপর দিয়ে উড়ে চলল, সোজা শিলিগুড়ির স্টেশনের টিনের ছাদের দিকে।

দার্জিলিং মেল আসতে এখনো তিন ঘণ্টা। স্টেশনে লোকজন নেই, হোটেলগুলোর টিনের ছাত বিষ্টিতে ভিজে চাঁদের আলোয় ঝকঝক করছে। পাহাড়ের অন্ধকার ছেড়ে হঠাৎ ফাঁকায় পড়ে রিদয়ের ধাঁধা লেগে গেল। আকাশ থেকে সে টিনের ছাতগুলোকে দেখছে যেন ছোট-ছোট পাহাড়ের চূড়া শাদা বরফে ঢাকা! হাঁসেরা সেই দিকে নেমে চলল দেখে রিদয় চোঁচিয়ে বললে—“কর কী, ওখানে যে খালি বরফ, বসবার জায়গা কোথা!” কিন্তু হাঁসেরা তার কথায় কান না দিয়ে নেমেই চলল!

রিদয় দেখলে পাহাড়ের মধ্যে দাঁড়িয়ে আকাশে দুই হাত ছড়িয়ে একটা যেন দৈত্য লাল সবুজ দুটো চোখ নিয়ে কটমট করে তার দিকে চেয়ে রয়েছে! রিদয়ের আরো ভয় হল। সে দুই পা গুটিয়ে হাঁসের পিঠের পালকে লুকোবার চেষ্টা করছে এমন সময় হাঁসেরা রূপস্বাপ করে স্টেশনের টিনের ছাতে নেমে পড়ল। তখন রিদয়ের ভুল ভাঙল, সে দেখলে রাস্তার আলোগুলোকে ভেবেছিল সব স্তারা, টিনের ছাতগুলোকে পাহাড়ের চূড়া—আর লাল সবুজ লণ্ঠন দেওয়া সিগনেল পোস্টটাকে একটা দৈত্য।

রিদয় স্টেশন কখনো দেখিনি, টিনের ছাতে ছুটোছুটি করে এদিক-ওদিক দেখতে আরম্ভ করলে, স্টেশনের সব উঁচু চূড়ায় দুটো কাঁটা উত্তর দক্ষিণ কোন দিকে বাতাস বইছে দেখবার জন্য কেবলি ঘুরছে, তারি উপরে একটি গোলা, সেই গোলায় এক-পা রেখে আকাশে চিমটের মতো দুই ঠোঁট উঠিয়ে কঙ্ক-পাখি আরামে ঘুম দিচ্ছেন। রিদয়কে টিনের উপর ছুটোছুটি করতে শুনে কঙ্ক-পাখি গোলার উপর থেকে ধমকে উঠলেন—“গোল করে কে?”

রিদয়ের দুইটি গেছে কিন্তু ফস্টিনস্টি করবার বাতিক এখনো খুব আছে। সে অমনি বলে উঠল—“গোল আর করবে কে, গোলের মাঝে বসে আছ তুমি, তোমারি এ- কাজ!”

“ভালো রে ভালো বলেছিস” বলে কঙ্ক-পাখি চিমটের মতো ঠোঁটে গিরগিটির মতো রিদয়কে ধরে বারকতক আকাশে ছুড়ে দিয়ে আবার লুফে নিয়ে আদর করে বললে—“দ্যাখো ছোকরা, এত রাতে ছাতে খুটখাট করলে এখনি স্টেশন-মিস্ট্রেস মেমের ঘুম ভেঙে যাবে আর স্টেশন-মাস্টার এসে আমাদের উপর গুলি চালাবে। যদি স্টেশন দেখতে চাও তো ওই জলের পাইপটা ধরে নেমে যাও কিন্তু খবরদার স্টেশনের জল খেও না, তা হলেই ম্যালেরিয়া হয়ে যুধিষ্ঠিরের চার ভাই যেমন একবার মরেছিলেন তেমনি তুমিও মরবে।”

রিদয় বললে—“ও কেমন কথা?”

কঙ্ক বললেন—“শোনো তবে বলি!”

কথার নাম শুনেই চারদিক থেকে হাঁস পাখি যে-যেখানে ঘুমিয়ে ছিল চাঁদের আলোতে টিনের ছাতে বুড়ো কঙ্ক-পাখিকে ঘিরে বসল। চাঁদটাও যেন গল্প শুনতে কঙ্কের ঠিক পিঠের দিকে টিনের ছাতের কার্নিশে এসে বসল।

কঙ্ক গলা-খাঁকানি দিয়ে শুরু করলেন :

আমাদের কঙ্ক বংশের শেষ অঙ্কের যে আমি, আমার স্বর্গীয় প্রপিতামহ ছোট-কঙ্ক,

তার প্রসঙ্গীয় মধ্যম প্রপিতামহ মেঝো-কঙ্ক মহাশয়ের অতিবৃদ্ধ প্রপিতামহ ধর্মাভতার বড়-কঙ্ক—তিনি কাম্য বনে এক রম্য সরোবরে বাস করছেন, এদিকে একদিন হয়েছে কি, না ধর্মপুত্র যুদ্ধিষ্ঠিরের তৃষ্ণা পেয়েছে। বনের মধ্যে তেষ্ঠা পেয়েছে, খুঁজে-খুঁজে জল খেয়ে নিলেই হত, না হুকুম করলেন—“ওরে ভীম জল নিয়ে আয়।” ভীম চললেন—জল খুঁজে খুঁজে তাঁরও তেষ্ঠা পেয়ে গেল। সেই সময় আমাদের ধর্মাভতার বড়-কঙ্ক সে-পুকুরে পাহারা দিচ্ছিলেন, সেই কতকালের পানা পুকুরটার দিকে ভীমের নজর পড়ল, জল দেখে ভীমের তেষ্ঠা যুদ্ধিষ্ঠিরের চেয়ে দৃগুণ বেড়ে গেল। ভীম তাড়াতাড়ি পুকুরে নামলেন, অঞ্জলি ভরে বৃকোদর প্রায় পুকুরের অর্ধেক জল তুলে নিলেন দেখে আমার স্বর্গীয় প্রপিতামহের পিতামহের অতিবৃদ্ধ প্রপিতামহ বলে উঠলেন—“অঞ্জলি করিয়া জল না করিহ পান, সমস্যা পূরণ করি কর জলপান—নতুবা তোমার মৃত্যু।”

সমস্যা দিয়ে জল ফিলটার করে খাবার দেরি সইল না, বৃকোদর আমাদের ধর্মাভতারের পানা-পুকুরের পচাজল চকচক করে খেয়ে ফেললেন। যেমন খাওয়া, অমনি কম্পজ্বর, সঙ্গে-সঙ্গে মৃত্যু। তার পর অর্জুন এলেন, নকুল সহদেব এলেন, দ্রৌপদী এলেন, সবার সেই দশা, কেউ সমস্যা দিয়ে জল শোধন করে নিতে চাইলেন না। শেষে যুদ্ধিষ্ঠির এসে ধর্মাভতার কঙ্কের কথামতো চারবার সমস্যা দিয়ে জল শোধন করে তবে বেঁচে গেলেন; আর সেই শোধন করা শান্তি জল দিয়ে চার ভাই আর দ্রৌপদীকেও বাঁচিয়ে দিলেন।

রিদয় শুধোলে—“বারি শোধন করার সমস্যা কোথায় পাওয়া যায়, তার দাম কত?”

কঙ্ক হেসে বললেন—“সমস্যা কি জলের কুঁজো যে, বাজারে পাবে? সমস্কৃততে সমস্যা লেখা হয় মন্তুরের মতো, সেইটে পাঠ করে বাঁ-হাতের বুড়ো আঙুলে এক নাক টিপে নাকের মধ্যে জল টেনে নিতে হয়, আর বলতে হয়, আদি গঙ্গা সাত সমুদ্র তেরো নদী বাক্সিলাম, দশঘড়ায় বাক্সিলাম, জিহবার উপর বাক্সিলাম, সরস্বতী যমুনা বন্ধ, মাতা ভাগীরথী ফুঃ ফুঃ ফুঃ। মন্তুর যদি শিখতে চাও তো কামরূপ কামিখ্যে আমার হাড়গিলে দাদার কাছে যাও। সাপের মন্তুর বাঘের মন্তুর শেয়ালের মন্তুর সব মন্তুর তিনি জানেন, আর কোনো ভাবনা থাকবে না নির্ভয়ে যেখানে খুশি বেড়িয়ে বেড়াতে পারবে।”

চকা বলে উঠল—“এ-পরামর্শ মন্দ নয়! খেঁকশেয়ালটা যেরকম সঙ্গে লেগেছে তাতে একটা শেয়ালের মন্তুর রিদয়কে না শিখিয়ে নিলে তো আর চলছে না। সেই কৈলাস পর্যন্ত যেতে হবে, এর মধ্যে কত বিপদ-আপদ আছে—চলো কিছুদিন কামরূপে থেকে গোটাকতক মন্তুর নিয়ে যাওয়া যাক।”

কঙ্ক বললেন—“চলো, দাদার কাছে আমারও গোটাকতক মন্তুর নেবার আছে।” চকাকে কঙ্ক শুধোলেন—“তোমরা কোন পথে কামরূপ যেতে চাও? ব্রহ্মপুত্রের পথে গেলে অনেক ঘুরে যেতে হবে, আর আমার সঙ্গে যদি সিধে রাস্তায় যেতে চাও তো এখান থেকে তরসা নদী একবেলা, সেখান থেকে জলপাইগুড়ি বস্ত্রাও কুচবেহার হয়ে জয়িন্তী আর একবেলা, সেখানে রাত কাটিয়ে মোচু নদীতে জল খেয়ে গোয়ালপাড়া দশটার মধ্যে, সেখান থেকে বেলা পাঁচটায় মানস নদী, ছটা নাগাদ কামরূপ কামাখ্যার মন্দির—সেখানে ব্রহ্মপুত্রের মধ্যে হাড়গিলের চরে আমার দাদা থাকেন।”

চকা কঙ্ক-পাখির কথায় সায় দিয়ে তরসার পথেই বাঁয়ে হিমালয় পাহাড় রেখে সোজা পুরমুখী কামরূপে রওনা হল। খানিক উড়েই চকা বুঝলে কঙ্ক-পাখির সঙ্গে বেরিয়ে ভালো করেনি। তার নাম যেমন কঙ্ক চলাও তেমনি বঙ্ক, মোটেই সোজা নয়! সে শিলিগুড়ি ছেড়েই দক্ষিণ-মুখো চলল, মহানদীর ধার দিয়ে জলপাইগুড়ি স্টেশন হয়ে তিতলিয়া পর্যন্ত, সেখান থেকে উত্তরপুবে বেঁকে কুচবিহার ঘেঁষে বার্গিশ-ঘাট, তারপর তিস্তা নদীর উপর দিয়ে একতে-বেঁকতে উত্তরমুখে রামসাই হাট হয়ে বোগরা কুঠি, একেবারে পাহাড়তলিতে উপস্থিত, এখান থেকে সেখান থেকে পাহাড়ের বাক-বাক পুবে মাদারি পর্যন্ত। সেখান থেকে তরসা নদীর স্রোত ধরে দক্ষিণে এসে একেবারে কুচবেহার রাজাবাড়ির উপরে এসে পড়া, সেখান থেকে আবার উত্তরে আলিপুর বস্ত্রাও জয়ন্তী হয়ে একেবারে জলপাইগুড়ি পরগনার পুবে মোহড়ায় মোচু নদীতে হাজির। এর পরেই গোয়ালপাড়া আরম্ভ।

এইভাবে এদিক-ওদিক একোণ-ওকোণ এপাড়া-ওপাড়া যেন কী খুঁজতে-খুঁজতে কঙ্ক-পাখি তীরবেগে চলেছে। তার সঙ্গে উড়ে চলা হাঁসদের সম্ভব নয়, কাজেই চকা নিজের পথ দেখে হাঁক দিতে-দিতে চলল—“তরসা—তরসা।” ওদিকে যেমন কুঁকড়ো, এদিকে তেমনি উত্তর থেকে দক্ষিণমুখো যেসব নদী চলেছে, তারি ঘাটে-ঘাটে কাদাখোঁচা জলপীপী ঘাটিয়াল হাঁক দিচ্ছে—“তরসা পশ্চিমকূল মাদারি!” মাদারি হয়ে তরসার উপর দিয়ে হাঁসেরা পাড়ি দিতে লাগল, দূরে ডাইনে কুচবেহারের রাজবাড়ি, তরসার পুবেপারে রাজাদের জলকরে পানিকাক হাঁকলে—“বস্ত্রাও।” আরো দূরে জলপাইগুড়ির সীমানায় তিতিরে হাঁকলে—“জয়ন্তী।”

জলপাইগুড়ি ছাড়িয়ে গোয়ালপাড়ার মোচু নদীর কাছ বরাবর এসে হাঁসেরা আকাশ মেঘে অন্ধকার দেখলে, জোর বাতাস তাদের ক্রমেই উত্তরে পাহাড়ের গায়ে ঠেলে নিয়ে চলল। হাঁসেরা একেবেঁকে কখনো উত্তর ঘেঁষে একেবারে হিমালয়ের দেয়ালের ধার দিয়ে কখনো দক্ষিণে ফাঁকা মাঠের উপর দিয়ে উড়ে চলল সারাদিন!

গোয়ালপাড়া ছাড়িয়ে কামরূপ মানস নদীর কাছ বরাবর এসেছে, এমন সময় পশ্চিম দিকে বোঁ-বোঁ সোঁ-সোঁ শব্দ উঠল যেন হাজার-হাজার পাখি উড়ে আসছে। পায়ের তলায় মানস নদীর জল হঠাৎ কালো ঘোরালো হয়ে উঠল, দমকা হাওয়ার একটা ঝাপটা এসে হাঁসদের ডানার পালকগুলো উল্কাখুন্সো করে দিলে।

চকা ঝাপ করে ডানা বন্ধ করে পলকের মতো চমকে যেন আকাশে স্থির হয়ে দাঁড়াল, তারপরে তীরের মতো মানস নদীর দিকে চলল ডাক দিতে-দিতে—“সামাল জমি লাও জমি লাও।” কিন্তু জমি নেবার আগে ঝড় একেবারে ধুলোবালি শুকনো পাতা ছোট-ছোট পাখিদের ঠেলতে-ঠেলতে তরতর করে এসে পড়ল। বাতাসের জোরে মাঝ-দরিয়ার দিকে চকা নিকোবরের দলকে ঠেলে নিতে লাগল, জমি নেবার উপায় নেই। মানস নদীর পশ্চিমকূলে বিজলী-গাঁয়ের উপর দিয়ে ঠেলতে-ঠেলতে বাতাস হাঁসের দলকে দেখতে-দেখতে মাঝ-দরিয়ার নিয়ে আসছে, সামনে মানস নদীর ওপারের ভাঙন-জমি পাহাড়ের মতো উঁচু, সেখানে হাওয়া যদি আছড়ে ফেলে, তবে একটি হাঁসও বাঁচবে না। ঘোরবারও উপায় নেই, ওদিকে মাঝনদীতে তুফান উঠেছে, ঝড়ের মুখে উড়ে গিয়ে সামনের ভাঙনে

আছড়ে পড়লে মৃত্যু নিশ্চয়, তার চেয়ে জলে পড়ে বরং সাতারে বাঁচবার উপায় আছে স্থির করে সব হাঁস বুপবাপ নদীতে নেমে পড়ল, শাদা-শাদা ফেনা নিয়ে চারদিকে সাপের ফণার মতো ঢেউ উঠছে-পড়ছে, একটার পিছে তেড়ে আসছে আর একটা, মাথার উপর ঝড় ডাকছে, সোঁ-সোঁ, চারদিকে জল ডাকছে গোঁ-গোঁ, নদীতে একখানি নৌকা নেই, একটি ডিস্কিও নেই, কেবল মাঝনদীতে ঢেউয়ের উপরে-উপরে স্রোতের মুখে ভেসে চলেছে মোচার মতো হাঁস কটি।

জলে পড়ে হাঁসদের কোনো কষ্ট নেই। স্রোতে গা ভাসিয়ে একগাছ ছেঁড়া মালার মতো, ঢেউয়ের সঙ্গে উঠে পড়ে চলেছে। কেবল চকার ভয় হচ্ছে পাছে দলটা ছড়িভঙ্গ হয়ে পড়ে। তাই সে থেকে-থেকে ডাক দিচ্ছে—“কোথায়!” অমনি বাকি হাঁসেরা উত্তর দিচ্ছে—“হেথায়-হেথায়।” চকা একবার রিদয়কে ডাক দিচ্ছে—“হংপাল-হংপাল।” রিদয় অমনি উত্তর দিচ্ছে—‘ভাসান-ভাসান।’ আকাশ দিয়ে স্থলচর পাখিরা ঝড়ে লুটোপুটি হয়ে চলেছে। হাঁসেরা দিব্বি আছে দেখে তারা বলতে-বলতে উড়ে চলল—“সাঁতার-সাঁতার উ-উ-উ গেছি-গেছি-গেছি, মরি-মরি-মরি!” কিন্তু ঢেউয়ের উপর দিয়ে দড়ি-ছেঁড়া নৌকার মতো দুলতে-দুলতে চলাতেও বিপদ আছে। চকা দেখল হাঁসেরা ডানায় মুখ গুঁজে ঘুমিয়ে পড়বার যোগাড় করছে, সে অমনি সবাইকে সাবধান করতে লাগল—“ঘুমেসারা দলছাড়া, দলছাড়া, গেছ-মারা, চোখ খোলো চোখ মেলো।” চকা বলছে বটে চোখ খোলো কিন্তু নিজেরও তার চোখ ঢুলে এসেছে, অন্য হাঁসগুলো তো একঘুম ঘুমিয়েই নিচ্ছে।

ঠিক সেই সময় সামনের একটা ঢেউয়ের মাথায় পোড়া কাঠের মতো একটা কী ভেসে উঠল! চকার অমনি চটকা ভেঙে গেল—সে কুমির-কুমির বলেই দুই ডানার ঝাপটা মেরে সোজা আকাশে উড়ে পড়ল, খোঁড়া-হাঁস রিদয়কে নিয়ে যেমন জল ছেড়েছে আর কুমির জল থেকে ঝম্প দিতে তার খোঁড়াপায়ে একটা দাঁতের আঁচড় বসিয়ে ডুব মারলে। খোঁড়া ইস বলে এক লাফে আর পাঁচ হাত উপরে উড়ে পড়ল। কুমিরটা আর একবার জল থেকে নাটা-চোখ পাকিয়ে নাকটা তুলে এদিক-ওদিক করে ভুস করে ডুব মারলে।

হাঁসের দল উড়তে-উড়তে খানিক গিয়ে আবার জলে পড়ল, কিন্তু সেখানেও আবার কুমির, আবার ওড়া, আবার গিয়ে জলে পড়া—এইভাবে সারাদিন কাটল।

কত ছোট পাখি যে এই ঝড়ে মারা পড়ল, পথ হারিয়ে একদিকে যেতে আর একদিকে গিয়ে পড়ল, না খেয়ে জলে ভিজে নদীতে পড়ে পাহাড়ে আছাড় খেয়ে কত যে পাখি মরে ঝরে গেল তার ঠিক-ঠিকানা নেই।

চকার দল হাঁফিয়ে পড়েছে, এদিকে অজানা নদী, ওদিকে অচেনা ডাঙা। পাহাড় থেকে জল বরফের মতো ঠাণ্ডা হয়ে গড়িয়ে চলেছে—ঝড়ে ভাঙা বড়-বড় গাছের ডাল ভেসে চলেছে, চকা দলবল নিয়ে একবার গাছের ডালে ভর দিয়ে জিরোবার চেষ্টা করলে কিন্তু ভিজে ডাল একেই পিছল তার উপরে আবার স্রোতে গড়িয়ে-গড়িয়ে চলেছে। বাতাস ক্রমাগত তাদের জলে ঠেলে ফেলতে লাগল, ওদিকে সন্ধ্যার আঁধার ঘনিয়ে এল, জলে থাকা আর চলে না, হাঁসেরা উড়ে পড়ল।

আকাশে চাঁদ নেই, তারা নেই, কেবল কালো মেঘ আর বিদ্যুৎ, আর হু-হু বাতাস, থেকে-থেকে পাখিরা ভয়ে চীৎকার করে উঠছে, জলের ধারে ঝুপঝাপ পাড় ভেঙে নদীতে পড়ছে, বজ্রাঘাতে বড়-বড় গাছ মড়মড় করে মুচড়ে পড়ছে, এরি মাঝ দিয়ে চকা তার দল নিয়ে ডাঙায় আশ্রয় নিতে চলেছে। হঠাৎ একসময় সামনে একটা গুনগুন আওয়াজ শোনা গেল, তার পরেই রিদয় দেখল হাওয়ার মতো একটা পাহাড়ের দেওয়াল নদী থেকে আকাশে উঠেছে আর তারি তলায় নদীর জল তুফান তুলে ঝপাঝপ পড়ছে। চকা সোজা পাহাড়ের দিকে চলেছে! রিদয় ভাবলে—এইবার শেষ, আর রক্ষে নেই, সে বিষ্টিতে কুয়াশায় ঝাপসা পাহাড়ের দিকে চেয়ে রয়েছে এমন সময় চকা ডাক দিলে—“বাঁয়ে ঘেঁষে।” দেখতে-দেখতে পাহাড়ের গায়ে প্রকাণ্ড খিলেনের মতো একটা গুহা দেখা গেল, চকা হাঁসের দল নিয়ে তারি মধ্যে সোজা ঢুকে পড়ল—সেখানে বিষ্টি নেই, জল নেই, বাতাসও আস্তে-আস্তে আসছে সোঁ-সোঁ করে। ডাঙায় পা দিয়েই চকা দেখতে লাগল সেথো সবাই আছে কি না। সবাইকে পাওয়া গেল, কেবল কঙ্ক-পাখি, যে তাদের পথ দেখিয়ে আনছিল তার কোনো খোঁজই হল না!

গুহাটার মধ্যে শুকনো বালি কাঁকর আর ঘাস। হাঁসেরা তারি উপরে বসে ভিজে পালক ঝেড়ে-ঝুড়ে নিচ্ছে, চকা রিদয়কে নিয়ে গুহাটা তদারক করতে চলল। মস্ত গুহা, মুখের কাছটায় আলো পড়েছে, ভিতর দিকটা অন্ধকার, দু-ধারে দেওয়ালের গায় রেলগাড়ির বেক্সির মতো থাকে-থাকে পাথর সাজানো—একপাশে একটা ডোবা, তাতে পরিষ্কার বৃষ্টির জল ধরা রয়েছে। রিদয় বলে উঠল—“বাঃ ঠিক যেন ধর্মশালাটি।” অমনি গুহার ওধারে অন্ধকার থেকে কারা বলে উঠল—“ধর্মশালাই বটে!” রিদয় ভয়ে কাঠের পুতুলের মতো দাঁড়িয়ে গেল।

চকা এদিক-ওদিক ঘাড় ফিরিয়ে দেখলে অন্ধকারে এ-কোণে ও-কোণে জোড়া-জোড়া সবুজ চোখ পিটপিট করছে। “ওই রে বাঘ!” বলেই চকা রিদয়কে মুখে করে তুলে দৌড়! রিদয় চোঁচাচ্ছে—“বাঘ বাঘ!” সেই সময় অন্ধকার থেকে জবাব হল—“ভো-ভো ভেড়া!”

এবার রিদয়ের সাহস দেখে কে, সে বুক ফুলিয়ে ভেড়াদের সর্দার দুম্বার কাছে গিয়ে শুধালে—“এখানে যে তোমরা বড় এলে? এটা আমাদের ঘর, যাও!”

দুম্বা তার কানের দুপাশে গুলি পেঁচ দুই শিং পাথরে ঘষে বললে—“এখানে আমরা ইচ্ছেসুখে এসে ধরা পড়ে কামিখ্যের ভেড়া বনে গেছি, যাব কোথায়, যাবার স্থান নেই।”

রিদয় অবাক হয়ে বললে—“কী বলো এই কামরূপ কামিখ্যের মন্দির? এইখানে মানুষকে তারা ভেড়া ছাগল বানিয়ে রাখে!”

হাঁও বটে নাও বটে, এইভাবে ঘাড় নেড়ে দুম্বা বললে—“এটা কি গোয়াল না এটা আমাদের বাড়ি—এটা একটা যাদুঘর। এখানে যা দেখছ সব ইন্দ্রজাল, ভৌতিক ব্যাপার। এদিক দিয়ে পাখিরা পর্যন্ত উড়ে চলতে ভয় পায়, তোমরা কার পরামর্শে এখানে এলে শনি? মহাভারতের ধর্মাবতার কঙ্ক তার কোনো পুরুষের কেউ নয়, সেই বকধামিক কঙ্ক-পাখির সঙ্গে তোমাদের পথে দেখা হয়নি তো?”

কঙ্ক-পাখির পাল্লায় পড়েই তারা এদিকে এসেছে শুনে দুম্বা হা-হুতাশ করে

বললে—“এমন কাজও করে, বকধার্মিকের কাজই হচ্ছে নানা ছলে লোককে ভুলিয়ে এই কামরূপে এনে মানুষকে ভেড়া, ভেড়াকে ছাগল বানিয়ে দেওয়া, এটা বুঝলে না—কী আপসোস!”

রিদয় ভয় পেয়ে বলে উঠল—“এখন উপায়!”

দুশা খানিক ভেবে বললে—“উপায় আর কী, এক উপায় যদি বকধার্মিক এই ঝড়ে রাস্তা ভুলে অন্যদিকে গিয়ে পড়ে থাকে তবেই তোমরা এবারের মতো বেঁচে গেলে।”

চকা শুধালে—“আর সে যদি এসে পড়ে তো কী হবে?”

দুশা উত্তর করলে—“সে এসে ঠোট দিয়ে তোমাদের মাথা ফুটো করে যা-কিছু বুদ্ধি আছে মগজের সঙ্গে সবটুকু বার করে নেবে; আর তোমরা কেউ বোকা ছাগল, কেউ মেড়া, কেউ ভেড়া হয়ে আ-আ করে তাকেই তোমাদের ভেড়া বানিয়ে দেবার জন্যে বাহবা ধন্যবাদ দিতে থাকবে।”

রিদয় রেগে বলে উঠল—“মাথা ফুটো করতে দিলে তবে তো? যেমন দেখব সে আসছে, অমনি আমরা সরে পড়ব না?”

দুশা শিং নেড়ে বলল—“তা হবার যো নেই, সে ধুলোপড়া দিয়ে সবার চোখে ধুলো দিয়ে কখন যে কাজ উদ্ধার করে যাবে তোমরা টেরও পাবে না। মনে হবে, কে তোমাদের মাথা চুলকে দিচ্ছে, তোমরা ঘুমিয়ে পড়বে আরামে। তারপর চোখ খুলে দেখবে ভেড়া হয়ে গেছে।’

চকা এগিয়ে এসে শুধালে—“এত বোকা ছাগল বোকা মেড়ায় তার কী দরকার বলতে পার?” দুশা খানিক চোখ বুজে বললে—“ঠিক জানিনে, তবে শুনেছি নাকি”—বলেই দুশা হঠাৎ চুপ করে এদিক-ওদিক চাইতে লাগল।

রিদয় ব্যস্ত হয়ে শুধালে—“কী শুনেছ বলেই ফ্যালো না।”

দুশা আরো ব্যস্ত হয়ে বলল—“চুপ-চুপ অত চেষ্টাও না, কাজ কী বাবু ওসব কথায়, শেষে কি ফ্যাসাদে পড়ব? কে কোন দিকে শুনবে, শেষে আমাকে নিয়ে টানাটানি। যাক ওকথা, কুবরী-কুবরী”—বলে দুশা চোখ বুজল।

রিদয় অনেক পেড়াপীড়ি করেও কুবরী ছাড়া আর একটা কথাও বোকাছাগলের মুখ দিয়ে বার করতে পারলে না। চকা চুপিচুপি রিদয়কে বললে—“তুমিও যেমন, বোকামেড়া ও, ওর কথার আবার মূল্য আছে? নিশ্চয় ওটার মাথার গোল আছে. এসো এখন খেয়ে-দেয়ে একটু বিশ্রাম করা যাক, সকালে উঠে নিজের পথ নিজে দেখা যাবে।” তারপর দুশার দিকে চেয়ে বললে—“মশায় যদি জানতেন আমরা আজ সারা রাস্তাটা কী কষ্টে কাটিয়ে এখানে এসেছি, তবে এই রাতে আমাদের মিছে ভয় দেখিয়ে তাড়াবার চেষ্টা না করে বরং কিছু অতিথি-সৎকারের বন্দোবস্ত করে দিতেন। আমরা নিতান্ত দায়ে পড়েই এখানটায় আশ্রয় নিয়েছি, এখন উচিত হয় আপনার আর কালবিলম্ব না করে আমাদের জন্যে জলযোগ এবং তারপরে সুন্দার ব্যবস্থা করে দেওয়া।”

এবারে দুশা অন্ধকার কোণ থেকে বেরিয়ে এসে বললে—“আপনারা আমার কথায় বিশ্বাস করছেন না, আচ্ছা আমি আপনাদের খাবার ব্যবস্থা করছি, দেখুন কী কাণ্ড হয়, তখন কিন্তু আমায় দোষ দিতে পারবেন না!”

চকা এবার সত্যিই ভয় পেলে, কোনদিক থেকে বিপদ আসে ভেবে চারদিকে চাইতে লাগল।

দুশা ডাকলে—“আসুন আহাৰ প্রস্তুত কিন্তু দেখবেন চটপট আহাৰ সেৱে উঠবেন, না হলে ব্যাঘাত হতে পারে। আপনারা আসন গ্রহণ করুন আমি এখানে দাঁড়িয়ে আসন-বন্ধন-মন্ত্রটি পাঠ করছি।” রিদয় আর হাঁসেরা খেতে বসে গেল। দুশা মন্ত্র পাঠ করতে লাগল—

মেঘ চর্মের আসন তোরে করিৱে পেন্‌নাম

আমার কাৰ্যে তুই হ রে সাবধান।

কামিখ্যার বৱে তোৱে কৱিলাম বন্ধন

এই কাৰ্যে যেন তুই না হোস লজ্জান ॥

হাঁসেদের অৰ্ধেক খাওয়া হয়েছে এমন সময় দূৰে ফেউ ডাকল। দুশা মন্তৱ জপতে-জপতে বললে—“ওই গুনেছেন তো এঁরা আসছেন, এৱি মধ্যে খবৰ হয়ে গেছে। ব্যাঘাত হল চটপট খেয়ে নিন’ বলেই দুশা তাড়াতাড়ি মন্তৱ পড়তে লাগল :

লাগ-লাগ ফেৰুপালের দন্তৱ কপাটি

কোনো ভূতে কৱিতে নাৱিবে আমার ক্ষতি

শীঘ্ৰি লাগ শীঘ্ৰি লাগ।

মন্তৱের চোটে কেউ ঘৰে ঢুকতে সাহস পেলে না বটে কিন্তু বাইরে চাৱদিকে ফেৰুপাল চিৎকাৰ কৱে কানে তালা ধৰিয়ে দিতে লাগল—“হুয়া-হুয়া, খাওয়া হুয়া, হুয়া খাওয়া, হুয়া খাওয়া।”

রিদয় বললে—“এত গোল কৱে কে?” রিদয়ের কথা তখন আৰ কে শোনে? তখন দুশা “ব্যোঘাৎ-ব্যোঘাৎ” বলে চেঁচাচ্ছে আৰ ঘৰের মাঝে ছুটোছুটি কৱে বেড়াচ্ছে, যেন সৰ্বনাশ হচ্ছে। রিদয় দুশাৰ ৱকম দেখে চেঁচিয়ে বললে—“আৱে মশায়, ব্যাপাটা কী খুলে বলুন না, অত বুক চাপড়ে ছুটোছুটি কৱচেন কেন?”

দুশাৰ তখন ভয়ে মাথা ঘুলিয়ে গেছে সে কাঁপতে কাঁপতে বললে—“সৰ্বনাশ হল, হায়-হায় কী উপায়, কী উপায়।”

রিদয় আৱো চটে বললে—“আৱে মশাই হয়েছে কী তাই বলুন না?”

দুশা তখন একটু স্থিৱ হয়ে বললে—“ওই খেঁকি-খেঁকি-খেঁকি খেঁকশেয়ালী ওই তিন ফেৰুপাল ওৱা যদি আমাদের দেওয়া মুড়ো কিম্বা ভেড়ার মাংস না খেতে চান তো কী হবে এখন!”

রিদয় হেসে বললে—“এইজন্যে এত ভয়, তা ওঁৱা যদি আপনাদের মুড়ো মাংস না খান তো আপনাদেরই তো লাভ, এতে আপনার দুঃখুই বা কী, ভয়ই বা কী?”

দুশা শিং নেড়ে বললে—“আহা আপনি বুঝবেন না, ওঁদের মুড়ো মাংস খাওয়ানো যে ভেড়াবংশের সনাতন প্রথা, সেটা বন্ধ হলে যে আমাদের জাত যাবে, আমরা একঘৰে হয়ে যাব, তাৱ কৱবেন কী?”

রিদয় গম্ভীর হয়ে বললে—“আগে আপনি কী করতে চান শুনি!”

দুষা কেঁদে বললে—“আমি এ প্রাণ আর রাখব না—আমি সমাজদ্রোহী, আমি নরকে যাব স্থির করেছি, আমি অতি হতভাগ্য।”

রিদয় দুষার শিংএ হাত বুলিয়ে বললে—“ওদের ঠাণ্ডা করবার কি আর কোনো উপায় নেই!”

দুষা ঘাড় নেড়ে বললে—“আর এক উপায়—তুমানেলে জ্বলে পুড়ে মরা, কিন্তু তার চেয়ে নরককুণ্ডে ঝাঁপিয়ে পড়াই সহজ।”

রিদয় বলে উঠল—“কাজ আরো সহজ হয় ওই তিনটে কুকুরকে নরকে পাঠিয়ে দেওয়া!”

দুষা দুই চোখ পাকল করে অবাক হয়ে বললে—“এ কি সম্ভব!”

রিদয় বললে—“দেখি তোমার শিং, খুব সম্ভব এক টুয়ে তিনটেকে একেবারে নরকে চালান করে দেওয়া যায় যদি তুমি তাল ঠুকে লাগ!”

দুষা বলল—“তাল ঠুকে টুঁ লাগাতে আমি মজবুত কিন্তু ওদের দেখলেই যে আমাদের বুদ্ধি লোপ পায়, তার কী?”

রিদয় দুষার পিঠ চাপড়ে বললে—“তোমরা চোখ বুজে থেকো—আমি যেমন বলব ‘শিং টিং চট্’ অমনি একসঙ্গে সবাই টুঁ বসিয়ে দিও, দেখি ওরা কী করে!”

এবারে অন্য-অন্য ভেড়া তুলাডু ঝাঁকাদু তারা এগিয়ে এসে বললে—“আমরা দু-একটা কথা বলতে চাই, আমরা টুঁসোতে রাজি কিন্তু তার আগে ভেবে দেখা কর্তব্য যে ফেরুপালদের সরিয়ে দিয়ে কি আমরা চলতে পারব? তাঁরা হলেন আমাদের ধোপা নাপিত এবং চরাবার কর্তা, ধরতে গেলে মেষবংশের মাথা। রাজদ্বারে শ্যাশানে চ ওঁরা আমাদের বান্ধব, আত্মীয়, কুটুম্ব বললেই হয়। ওঁরা মাঝে-মাঝে আমাদের চিরুণী দাঁতে টেনে, নখে আঁচড়ে, রোঁয়া ছেঁটে, চাম ছাড়িয়ে চেটে-পুটে সাফ না করে দিলে—কে মড়মড়ায় কে পড়পড়ায় কে ভাঙে খড়ি? আমাদের গা-শুদ্ধি হবারই যো নেই যদি না পাল-পার্বণে তাঁদের মাঝে-মাঝে মেষচর্মের আসনে বসিয়ে মেষমাংসে আমরা মুখশুদ্ধি করিয়ে দিতে পারি, এ ছাড়া আমরা খাঁড়া আর হাঁড়িকাট সামনে রেখে হাঁড়িপ-বাবা আর হাঁড়ি-ঝি মাতাজীর কাছে প্রতিজ্ঞা করেছি—তুমি খণ্ডা দ্বিখণ্ডা সুমুক্তি বাহার গরল ভাবহং মানুরিক্ত ঘুমাইয়া আছি স্মটিকের মুণ্ডি! আমাদের এ-মাথায় কোনো কাজ করতে গেলেই গুরুর কোপে পড়তে হবে, প্রতিজ্ঞাভঙ্গ পাপে লিপ্ত হয়ে নরকেও যেতে হবে, এর জবাব আপনি কী দেন?”

রিদয়কে আর কোনো জবাব দিতে হল না—খেকি-খেকি-খেক-খেকি খেক-খেকানি তিনটে হেঁড়েল হঠাৎ এসে তিন মেড়ার লেজ ধরে টেনে নিয়ে চলল, হাঁসেরা ডানা ঝটাপট করে গুহার মধ্যে অন্ধকারে উড়ে বেড়াতে লাগল, রিদয় তাড়াতাড়ি দুষার পিঠ চাপড়ে দুই হাতে তার ঘাড় বেঁকিয়ে ধরে হুকুম দিলে—“শিং টিং চট্, দে টুঁসিয়ে চটপট।” দুষা আর ভাবতে সময় পেনে না, অন্ধকারে সামনে আর ডাইনে-বাঁয়ে তিন টুঁ বসিয়ে দিলে। খটাশ-খটাশ করে তিনটে হাড়িমুখো হাড়িথেগো হেঁড়েলের মাথার খুলি ফেটে চৌচির হয়ে গেল; ঠিক সেই সময় বাইরে দুদাড় করে ঝড়বৃষ্টি নামল—

শিল পড়ে তড়বড় ঝড় বহে ঝড়ঝড়
 হড়মড় কড়মড় বাজে—ঘন-ঘন ঘন-ঘন গাজে!
 ঝঞ্ঝনার ঝঞ্ঝনী বিদ্যুৎ চকচকি
 হড়মড়ি মেঘের ভেকের মকমকি
 ঝড়ঝড়ি ঝড়ের জল ঝরঝরি
 তড়তড়ি শিলার জলের তরতরি
 ঘুটঘুট ধুরধার বজ্রের কড়মড়ি
 সাঁই-সাঁই বাতাস শীতের থরথরী।

ভেড়াগুলো কুবরী-কুবরী বলতে-বলতে এ ওর মুখের দিকে ফ্যালফ্যাল করে চেয়ে আছে, এমন সময় ঝড়ে একখানা পাথর খসে গুহার মুখটা একেবারে দরাজ হয়ে কত বড় হয়ে গেল তার ঠিক নেই। ঝড় থামলে সেই খোলা পথে সকালের আলো এসে গুহার মধ্যে সবাইকে জাগিয়ে দিলে! চকা সেই আলোতে ডানা মেলে রিদয় আর খোঁড়া আর কাটচাল আর নানকৌড়িকে নিয়ে হাড়গিলের চরে যেখানে আগুমানি লালসেরা হাঁসদের বড় দলটা নিয়ে অপেক্ষা করছে, সেই দিকে চলল।

ভেড়ার দল হঠাৎ কতকালের অন্ধকার গুহার মধ্যে দিনের আলো পেয়ে প্রথমটা অনেকক্ষণ ধরে হতভম্বের মতো আকাশের দিকে চেয়ে রইল, তারপর আশ্তে-আশ্তে পাহাড়ের উপর বুনো ভেড়ার দলে মিশে দিখি চরে বেড়াতে লাগল। রাতের কথা, রিদয়ের কথা, হাঁসদের কথা, কোনো কথাই তাদের মনে রইল না। তারা যেন চিরকালই বুনো ভেড়া এইভাবে সহজে খোলা আকাশের নিচে পাহাড়ের চাতালে-চাতালে ঘাস খেয়ে পাতা-লতা খেয়ে মনের সুখে দিন কাটাতে লাগল! ভেড়ার মধ্যে দুস্বাই কেবল মনে রাখতে পারলে রিদয় কেমন করে, তাদের নরককুণ্ডের মুখের কাছ থেকে পাহাড়ের উপরকার এই খোলা জায়গায় পৌঁছে দিয়ে গেছে, সেখানে স্বচ্ছন্দে চরে বেড়াতে কোনো বাধা নেই! দলের ভেড়ারা সন্ধেবেলায় অভোসমতো যখন তাদের পুরোনো ঘর গুহাটার দিকে চলল তখন দুস্বা তাদের এক-এক টুঁ মেরে বনের দিকে ফিরিয়ে দিলে।



আসামী বুরুঞ্জি

উত্তর থেকে বড় নদী যেখানে ব্রহ্মপুত্রের জলে এসে মিলেছে ঠিক সেই বাঁকের মুখেই কতকালের পুরোনো ডিমরুয়ার আসামী রাজা আড়িমাওয়ার নাটবাড়ি। নাটবাড়ের নিচেই নদী মজে গিয়ে মস্ত চর পড়েছে। এত কাল থেকে হাড়গিলে পাখিরা এই চর দখল করে আছে যে, ক্রমে চরটার নামই হয়ে গেছে হাড়গিলার চর। এই চরের ওপরেই দেওয়ানগিরি মস্ত একটা বুড়ো আঙুলের মতো আকাশের দিকে ঠেলে উঠেছে। এই দেওয়ানগিরি হল যত ফরিয়াদি পাখির আড্ডা। একপারে রইল আসামী মাছেদের রাজা আড়িমাওয়ার নাটবাড়ি আর এক পারে দেওয়ানী ফরিয়াদির আড্ডা দেওয়ানগিরি, মাঝখানে বসে রয়েছেন হাড়গিলে। আসামী ফরিয়াদিতে লড়াই মোকদ্দমা প্রায়ই হয়, তাতে দুই দলই মাঝে-মাঝে মারা পড়ে।

হাড়গিলের খান্ধাজং রাজা দুই দলের মধ্যে আরামে বসে দুই দলেরই হাড়-মাস খেয়ে সুখে আছেন, এমন সময় চর-মুখে খবর পৌঁছল বুড়ো-আংলা আসছেন। হাড়ডিলের রাজা খান্ধাজং লম্বা-লম্বা পা ফেলে জলের ধারে তাঁর কাশবাগিচায় বেড়িয়ে বেড়াচ্ছেন! ‘চুপিম-পা’ আর ‘চোরম-পা’ দুই সেনাপতি পায়ে-পায়ে হাড়গিলে রাজার কাছে হুকুম নিতে এলে—রিদয়-হংপালকে এ-পথে আসতে দেওয়া হবে কি না! খান্ধাজং হাড়গিলে অনেকক্ষণ আকাশের দিকে ঠোঁট উঁচিয়ে ভেবে বললেন—“আসতে দিতে পার।” হঠাৎ দেশের মধ্যে মানুষ আসতে দিতে হাড়গিলে চরের প্রজারা রাজি ছিল না। দুই সেনাপতি একটু ইতস্তত করছে দেখে খান্ধাজং সভাপণ্ডিত চুহুংমুংকে ডেকে বললেন—“দ্যাখো তো বুরুঞ্জি পুঁথিতে কলির কত হাজার বছরে এখানে মানুষের আগমন লিখছে?”

চুহুংমুং মুখ গম্ভীর করে বুরুঞ্জির পাতা উল্টেপাল্টে মাটিতে খানিক আঁকজোক কেটে বললেন—“আগামী ভূতচতুর্দশীতে এখানে সিদ্ধিদাতা গণেশের শাপত্রয় একজন

উপস্থিত হবেন, বারো বছর এগারো দিন এক দণ্ড তিন পল উনপঞ্চাশ বিপল বয়সে, বুরুঞ্জিতে লেখে—সুন্দরবনস্থ আমতলি গ্রামের কাশ্যপ গোত্রের অঙ্গুষ্ঠপ্রমাণ এই মহাপুরুষ, তাঁর আগমনে দেশে সুখ-সৌভাগ্য সঙ্গে-সঙ্গে মূষিক ও মশক বৃদ্ধি, হেঁড়েল বংশ ধ্বংস ও চুয়াদিগের নাটবাড়ি আক্রমণ এবং হাড়গিলা প্রভৃতি প্রচুর ভোগ-ঐশ্বর্য এবং সর্ব-সিদ্ধিযোগ। গণেশ চতুর্থীতে এই কলির বামন অবতার হংসরথে গৃহত্যাগ করবেন এবং ভূতচতুর্দশীতে উনপঞ্চাশ পবনে ভর দিয়ে কল্লাদ উনশত উনপঞ্চাশে সূর্যাস্তের দিক হতে উদয় হয়ে ক্রমে সূর্যোদয়ের দিকে অভ্যুত্থান করবেন। শ্যামবর্ণ সুন্দর বপুঃ বুড়োরষ্ঠ বৃষস্কন্ধ শালগ্রামং মহাভূজ” বলে চুহুংমুং বুরুঞ্জি বন্ধ করলেন।

সেইদিন থেকে হাড়িলের রাজা খাঙ্গাজং ভাঙাচোরা পুরোনো নাটবাড়ির চুড়োয় গিয়ে একপায়ে দাঁড়িয়ে পশ্চিমমুখে হয়ে ঘাড় তুলে রইলেন—হংপাল কখন আসেন দেখতে। ওদিকে কাকচিরাতে কাকদের রাজা যোম কাকের কাছে চাঁদপুরী শেয়াল খবর দিয়ে গেল—টিকটিকির মতো এক মানুষ এসে ভেড়াদের বিদ্রোহী করে তুলে হেঁড়ের বংশ ধ্বংস করলে, এবারে কাকের আর এঁটো-কাঁটা হাড়-গোড় কিছু পাবার উপায় থাকবে না। মাংসখোর সব মারা গেল, কেইবা আর ভেড়া মারবে, ছাগল ধরবে। কাকচিরাতে কাকের ঘোঁট বসে গেল, কী করলে মানুষটাকে সরানো যায় দেশ থেকে, আর ভেড়া গরু ছাগল এদের আরো বেশি করে উপযুক্ত শিক্ষা দিয়ে ছেড়ে দেওয়া যায়—যাতে কোনোদিন তারা ফেরপাল বা সনাতন স্বধর্মের ভুঁড়ো-শেয়ালদের বিরুদ্ধে শিং চালাতে না পারে।

নদী মাঠ আর জঙ্গল এই তোমাথার মধ্যে রয়েছে কাকচিরার না জঙ্গল, না মাঠ, না পাহাড়, না বালুচর—দূরে থেকে দেখলে বোধ হবে জমিটাতে ঘাসও যেমন গাছও তেমন, পাহাড়ও রয়েছে, নদীও বইছে, কিন্তু কাছে গিয়ে দ্যাখো কেবল চোরকাঁটা, শেওড়া আর বড়-বড় নোড়ানুড়ি, কাঁকর, বালি। তার মধ্যে এখানে-ওখানে কাদাজল নালা নর্দমা!

কোনোকালে ফেনচুগঞ্জের এক নীলকর সাহেব এখানে এক মস্ত কুঠি বানিয়েছিল। সেই বাংলা-ঘরখানা এখানে রয়েছে, কিন্তু মানুষ কেউ নেই। কুঠিবাড়ির বাগানে চোরকাঁটার সঙ্গে গোটাকতক দোপাটি ফুলের গাছ, ঘরের সমস্ত সার্সি দরজা বন্ধ, জিনিসপত্র যেখানকার সেখানে গোছানো, অথচ কেউ নেই এখানে। দরজায় চাবি দিয়ে বাড়িওয়ালা যেন দুদিনের মধ্যে আসবে বলে গেল, যেখানে সার্সিটা ভাঙা ছিল সেখানে কাগজ মেরে ঘরগুলি গুছিয়ে রেখে চোরের ভয়ে তালা বন্ধ করে সব ঠিকঠাক রেখে গেল, কিন্তু কোনো দিন এসে আর চাবি খুলে কেউ ঘরে ঢুকল না। বর্ষা এসে সার্সির ফাঁকে আঁটা পুরোনো খবরের কাগজটা গলিয়ে দিলে, বসক-চিরার একটা কাক কোন সময়ে একদিন ঠোটে করে সেই কাগজখানা ঠেলে ফেলে ঘরের ভিতরে যাবার আসবার একটা পথ করে রেখে দিলে। তারপর একদিন বোশেখ মাসে ডিম পাড়বার সময় দলে-দলে কাক এসে কাকচিরায় চিরকাল যেমন বাসা বেঁধে আসছে তেমনি ঘরকন্যা পেতে জায়গাটা দখল করে বসল। সকাল না হতে দূর-দূর গ্রামে তারা চরতে যায়, এঁটো-কাঁটার সন্ধানে। কিন্তু সন্ধ্যার আগেই দলে-দলে এই আপন রাজত্বে তারা ফিরে আসে, রাঙা আকাশ কালো করে।

আমাদের মধ্যে যেমন ডোম চাঁড়াল তেলি মালী যুগি কায়েত বামুন এমনি নানা জাত, কিন্তু দেখতে চেহারায মানুষ, তেমনি কাকেদের মধ্যেও দেখতে কাক কিন্তু জাত হরেক রকমের রয়েছে—যেমন ডোমকাক বা যোমকাক, ধাড়িকাক বা দাঁড়কাক বা দাঁড়াকাক, ধোড়াকাক, ঝোড়োকাক, টোড়াকাক, পাণিকাক বা পাতিকাক, শ্বেতকাক বা ছিটেকাক, ভূষোকাক বা ভূষুণ্ডেকাক। সব কাকেরই চালচলন এক ভাবা ভুল, এদের মধ্যে কোনো দল তারা ভদ্রর সভ্য-ভব্য কাক, ছোলাকলা চিংড়িমাছটা আঁসটা আর বামুনের মতো মরা জানোয়ারের শ্রদ্ধের ফলার খেয়ে দিন কাটায়, আর একদল কাক তারা যা তা খায় বাচবিচার নেই, পাখির ছানা খরগোশ ছানা খেয়েই এরা সুখ পায়। কোনো দলের পেশাই হল লুটতরাজ চুরিচামারি খুনখারাবি। এদের জ্বালায় পাখির বাসায় ডিম থাকবার যো নেই, বাইরে কিছু চকচকে জিনিস রাখবার উপায় নেই! আমসত্ত্ব শুকোতে দিলে এরা খেয়ে যায়, কাপড় শুকোতে দিলেও টেনে ছেঁড়ে, ছেলের হাতের মোয়া কেড়ে খায়, বুড়োর পাকা মাথায় ঠোকর বসায়, চালের খড় টেনে ফেলে, ভাতের থালায় হেঁ দেয়, এমনি নানা উৎপাত করে বেড়ানোই এদের কাজ।

কাকেদের ডাকনাম শুনলেই বোঝা যায় কোন দল কেমন—যেমন যোমকাকের বংশ তারা হল ডোমকাক, এদের সবাই ভয় করে। মরা জানোয়ার নিয়ে ছেঁড়াছেঁড়ি মারামারি এদের কাজ। তারপর ধাড়িকাক বা দাঁড়কাক—এরা পুরোনো চালের, কাক যখন কোকিলের মতো গাইতে পারত তখন লোকে এদের পুষে দাঁড়ে বসিয়ে বসিয়ে ছোলা খাওয়াত। সেই থেকে এরা নানা বিদ্যেতে কৌশলে কারিগরিতে মজবুদ বলে সব কাকই দায়ে পড়লে এদের পরামর্শমতো চলে। তারপর, ঝোড়োকাক—এরা এককালে সবচেয়ে সাহসী বড়ই নামজাদা রাজবংশ ছিল, এখন বিষ হারিয়ে টোড়াকাক হয়ে পড়েছে কাজেই চূপচাপ থাকে সন্ন্যাসীর মতো। পাতিকাক হল পাণিকাকের বংশ, এরা সব দলেই আছে কিন্তু কোনো দলই এদের পোঁছে না, পুকুরপাড়ে এরা গুগলি শামুক এঁটো-কাঁটা খেয়েই দিন চালায়। শ্বেতকাক—এরা আসলে দিশি কালো কাকেরই বংশ কিন্তু রঙ বদলে শাদা বিলিতি কাক হতে যাচ্ছে—এদের কারু গলা শাদা, কারু ডানা শাদা, কারু মাথা শাদা, এখনো দোরঙা আছে বলে এদের নাম ছিটেকাক হয়েছে।

পৃথিবীর আদি কাক হল ভূষুণ্ডিকাক, তারি বংশ ভূষুণ্ডে বা ভূষো, দেখতে কালিঝুলি, সত্য, ত্রেতা, দ্বাপর, কলি, এই কাকের বংশ চলে আসছে—এদেরই পূর্বপুরুষ রামের সঙ্গে লড়ায়ে একচোখ হারিয়েছিল, সেই থেকে এদের নাম ডাক ছড়িয়ে পড়েছে, এমনকি এদের নকল করে অনেক কাক একচোখো সেজে নিজেদের বলাতে চাচ্ছে এদেরই একজন, অসলে হয়তো সে পাতিকাক, কিন্তু লেখবার বেলায় লিখছে পাতি অব্ ভূষুণ্ডি! এইসব নানা ধরনের কাকেদের মধ্যে যখন যে দলপতি হয় তখন কাক-সমাজকে সে নিজের মতো ভালো-মন্দ নরম-গরম ভাবে চালায়, এই হল কাক-সমাজের নিয়ম।

যে-কাকটা নীলকর সাহেবের ঘরের সার্সিতে মস্ত ফাঁকটা আবিষ্কার করেছিল, সে বহুকালের পুরোনো রাজবংশী টোড়াকাক। যতদিন এই টোড়াকাক দলপতি ছিল ততদিন কাক-সমাজ ভদ্ররকম ছিল, কোনো পাখিই তাদের কোনো দোষ কোনো খুঁত

ধরতে পারেনি। কিন্তু কাক-সমাজে ক্রমে প্রজা বৃদ্ধি হয়ে নানারকম কাক তাতে এসে যখন সঁধোল তখন চাল-চোলও ক্রমে বদলাতে আরম্ভ করলে। শেষে একদিন সবাই মিলে টোড়াকাককে সিংহাসন থেকে তাড়িয়ে ডোমকাককে সর্দার করে এমন লুটতরাজ মারামারি আরম্ভ করে দিলে যে, পায়রা, সিকরে, গেরোবাজ এমনকি পেঁচারা পর্যন্ত অস্থির হয়ে কাকচিরে ছেড়ে পালাতে পথ পেল না।

পুরোনো দলপতি টোড়াকাক সিংহাসন ছেড়ে মনের দুঃখে ঝোড়োকাকের মতো হয়ে ডানা ঝুলিয়ে চুপচাপ শেওড়াগাছের ডালে দিন কাটায়, কেউ তাকে কোনো কথা শুধায় না, সবাই মিলে বলতে লাগল ওটা বিষ হারিয়ে টোড়া হয়েছে, বুড়ো হয়ে বুদ্ধি-সুদ্ধি লোপ পেয়েছে। নতুন দলপতি ডোমকাক তামাশা করে তার নাম রাখলে ডরা-কাক, দেশের লোক তাকে বললে টোড়াকাক! একেবারে কাজের বার ভেবে সবাই তাকে তুচ্ছ করছে দেখে টোড়াকাক মনে-মনে একটুখানি হেসে আপনার কোণটিতে চুপচাপ রইল। নতুন রাজা ডোম জাঁক দেখাবার জন্যে প্রায়ই টোড়াকে রাজবাড়িতে নিমন্ত্রণ দিত। কোনোদিন বা নিজের বীরত্ব আর বাহাদুরি দেখাতে শিকারের সময় প্রায়ই সঙ্গে নিত। টোড়া সব বুঝত কিন্তু বুঝেও বোবা হয়ে থাকত।

ফেনচুগঞ্জের নীলকর সাহেব যদিও অনেককাল হল কুঠিবাড়ি ছেড়ে গেছে, কিন্তু এখনো কোনো কাকের এমন সাহস হয় না যে সেদিকে যায়, কিন্তু ডরাকাক বলে ডোমকাকের দল যাকে তুচ্ছ করছে সেই কাকটি গিয়ে একদিন কুঠিবাড়ির মধ্যে যাবার একটি রাস্তা করে এল নিজের বুদ্ধি খাটিয়ে একলা গিয়ে, কিন্তু খবরটা সে কাউকে জানাননি! একে মানুষ তাতে গোরা, তার ঘরে সুড়ঙ্গ কাটা, বাঘের ঘরে ঘোগের বাসার চেয়েও অসমসাহসের কাজ, কোনো কাক এ-পর্যন্ত যা পারেনি টোড়া সেই কাজটা করেছে—অথচ মুখে তার কথাটি নেই, অন্য কাক হলে চীৎকারের চোটে কাকচিরে মাত করত! নতুন দলপতি ডোমকাকটা দিনের বেলায় এই বৃকে পাটকিলে ডোরা টানা টোড়াকাককে ভয় করে খাতির করে চলত, টোড়ার বৃকের লাল ডোরা দেখে তার মনে হত যেন কতকালের মহাযুদ্ধের রক্তের দাগ রাজটিকের মতো এখনো এর বৃকে দাগা রয়েছে। কিন্তু রাতে অন্ধকারে যখন লাল-কালো সব এক হয়ে গেছে তখন ডোমকাক ধোড়াকে জ্বালাতন করতে ছাড়ত না—একদিন প্রায় মেরেই ফেলেছিল। সেইদিন থেকে ধোড়া বা টোড়াকাক শেওড়াগাছে আর ঘুমোতে যেত না, সেই সার্সি দিয়ে চুপিচুপি ঘরের মধ্যে দেওয়ালের গায়ে বেলা আড়াইটা বেজে বন্ধ হওয়া একটা ঘড়ির পিছনে বসে রাত কাটাতে আরম্ভ করলে।

রিদয় যে-ঝড়ে পড়ে যোগী-গোফায় আশ্রয় নিয়েছিল সেই ঝড়ে কাকচিরার বহুকালের পুরোনো শেওড়াগাছটা গোড়াসুদ্ধ উপড়ে রাজ্যের ডোমকাকের বাসা ডিম ছানা-পোনা নিয়ে উল্টে পড়ল ঠিক বেলা আড়াইটাতে। বাসা গেল, ডিম ভাঙল, তাতে কাগেদের বড় একটা দুঃখ হল না, কিন্তু গাছের গোড়াটা যেখানে উল্টে পড়ে বড় একটা গর্ত দেখা দিয়েছে, সেই গর্তটায় কী আছে না আছে খুঁজে দেখাবার জন্যে দলে-দলে কাক আকাশের দিকে পা করা গাছের মোটা-মোটা শিকড়গুলো নিয়ে টানাটানি চেষ্টামেচি বাধিয়ে দিলে।

ডোমকাক, টোঁড়াকাক পাতিকাক দুজনকে নিয়ে একেবারে ডোবাটার মধ্যে উড়ে পড়ে এদিক-ওদিক তদারক করে ইঁট পাটকেল উল্টে-পাল্টে দেখতে লাগল! হঠাৎ এত বড় গর্তটা কেন এখানে আসে, ঠোঁকর দিয়ে সন্ধান করতে-করতে গর্তের একদিকে খানিক কাঁকর মাটি ঝরঝর করে খসে পড়ল, আর দেখা গেল ইঁটে-গাঁথা একটা চোর-কুঠুরি, তার মধ্যে তালা দেওয়া ছোট একটা পেন্টরার সামনে একটা মড়ার মাথা, কতকালের কলঙ্ক-ধরা একটা পিদুম আর গোথরো সাপের একটা খোলস! মড়ার মাথা সাপের খোলস দুটোই সব কাকের দেখা ছিল, পিদুম নিয়েও অনেকবার তারা পালিয়েছে, কিন্তু পেন্টরাটার মধ্যে কী আছে কোনো কাকই তা জানে না, কাজেই এদিকে-ওদিকে ঠোঁকর দিয়ে তালাটা ধরে নাড়া দিয়ে দেখছে, এমন সময় গর্তের উপর থেকে খেঁকশেয়াল আস্তে-আস্তে বললে—“হচ্ছে কী? ওটা নিয়ে নাড়াচাড়া করো না, ওতে সাত রাজার ধন আছে, যদি খুলতে চাও তো একজন যক্ ধরে আনো, যকের ধন যক্ না হলে কেউ খুলতে পারবে না।”

সাত রাজার ধন আছে শুনে কাকদের চক্ষু স্থির! চকচকে পয়সা মোহর ভালোবাসতে তাদের মতো দুটো নেই, ডোমকাক পাতিকাক ভূষোকাক ছিটেকাক দাঁড়কাক সব কাক এসে শেয়ালকে ঘিরে—ক্যা-ক্যা-ক্যা কও-কও-কও রব করে গগগোল বাধিয়ে দিলে! ডোমকাক সবাইকে ধমকে চুপ করিয়ে শেয়ালকে শুধোলে—“যক্ এখন কেমন করে পাওয়া যায়?”

শেয়াল ডাওর করে মাথা চুলকে নাক রগড়ে যেন কতই ভেবে বললে—“আমি জানি এক যকের সন্ধান, সে ছুঁলেই এই বাক্স খুলে যাবে!”

কাকেরা অমনি চিৎকার করে উঠল—“কই-কই”—বলে এগিয়ে গর্তের মধ্যে ঝাঁপিয়ে পড়ল। ডোমকাক তাড়াতাড়ি পেন্টরার উপরে চেপে বললে—“রও-রও”।

তারপর শেয়াল এগিয়ে এসে বললে—“আমি সেই যকের সন্ধান তোমাদের দিতে পারি, যদি তোমরা এই সিন্দুক খুলিয়ে নিয়ে যক্টিকে আমার পেট ভরাবার জন্যে দিতে রাজি হও।”

কাকেরা শেয়ালের কথায় রাজি হলে শেয়াল তাদের রিদয়ের খবর জানিয়ে দিলে। তিনকুড়ি কাক সঙ্গে ডোমরাজা টোঁড়াকাককে সঙ্গে নিয়ে যক্ ধরতে চলল পাহাড়-জঙ্গলের উপর দিয়ে।

হাড়গিলের রাজা খাম্বাজং যখন চৌষটিখানা নাটবাড়ির নহবতখানার চুড়োয় পশ্চিমমুখো হয়ে রিদয়ের আশায় রয়েছেন, আর কাকদের রাজা ডোম রিদয়কে ধরবার জন্যে বনে-জঙ্গলে সন্ধান করে বেড়াচ্ছে, সেই সময় গণেশের নেংটি ইঁদুরের সঙ্গে পাহাড়ি চুয়াদের যুদ্ধ বেধে গেল। ব্রহ্মপুত্র আর বড়-নদীর মোহনার পুরানো নাটবাড়িটা ইঁদুরের দখলে কতকাল থেকে আছে তার ঠিকানা নেই। দেওয়ানগিরির উপরে কেল্লার মতো আড়িমাও রাজাদের নাটবাড়ি, প্রকাণ্ড কারখানা, এতবড় নাটবাড়ি যে সেখানে রাজাদের আমলে যে-সব হাতি-ঘোড়া সেপাই-শাস্ত্রী থাকত সেগুলোকে দূর থেকে মনে হত যেন ছোট পুতুল চলে বেড়াচ্ছে। দশ-বারো হাত চওড়া এক-একখানা পাথরের ইঁটে-গাঁথা বাড়ির দেওয়ালগুলো, এক-একটা থাম যেন এক-একটা

তালগাছ! সাততলা বাড়ি কিন্তু তার নিচের পাঁচতলা নিরেট দেওয়াল ভরাট করা, তার মাঝে পাহাড়ের গহ্বরের মতো অন্ধকার একটা সিংগি দরজা, আশেপাশে বাস্ত্রের মতো চোরকুঠুরি। সেগুলোতে দেওয়ালই সব, থাকবার জায়গা অল্পই তাও আবার এখানে-ওখানে লোহার গরাদ দিয়ে বন্ধ, কত কালের অস্ত্র-শস্ত্র, রাজাদের আসবাব-পত্র, চাল-ডাল, ঘি-ময়দা, ধন-দৌলত দিয়ে ঠাসা! যেমন সোঁতা তেমনি অন্ধকার, সে-সব ঘরে একবার ঢুকলে রাস্তা হারিয়ে চিরকাল গোলকধাঁধার মতো ঘুরে বেড়াতে হয়, আর বাইরে আসবার উপায় নেই, এমনি প্যাঁচাও-রকমে সে-সব ঘর সাজানো। ছ-তলার উপরে রাজসভা, সেখানে কতকটা আলো-বাতাস আসবার জন্যে সারি-সারি জানলা-বারাণ্ডা, সাততলায় অন্দরমহল, সেখানে জানলা সব খাঁচার মতো পাথরের জাল দিয়ে বন্ধ, পোষা পাখির মতো রানীদের ধরে রাখার জন্যে ছোট-ছোট কুলুঙ্গি দেওয়া দরজায় শিকল-আঁটা সব শয়ন-মন্দির।

অন্ধকূপ এই নাটবাড়িতে আড়িমাও রাজাদের বংশ ভালো আলো-বাতাস না পেয়ে গুচ্চিসুদ্ধ লোকলঙ্কার সমেত অল্পদিনের মধ্যে মরে ভূত হয়ে গেল, রইল কেবল বাড়ির চুড়োয় মস্ত একটা পাথরের আলসের উপরে খড়-কুটো দিয়ে বাসা বানিয়ে একঠেঙে—সে হাড়গিলের রাজা খায়াজং। রানীর শয়নঘরের কুলুঙ্গিগুলোতে গোটাকতক লক্ষ্মী-পেঁচা, কালো-পেঁচা, ভূতুম-পেঁচা, রাজসভায় কার্নিশে-কার্নিশে ঝুলে দলে-দলে বাদুড়, রন্ধনশালায় একটা কালো বেরাল, আর ঘি-ময়দা চাল-ডাল শাল-দোশালা ধন-দৌলতে ঠাসা নিচেকার ভাঁড়ার ঘরগুলোতে গড়বন্দি পালে-পালে গণেশের নেংটি ইঁদুর। হাড়গিলে পেঁচা বেরাল এরা সবাই ইঁদুরের শত্রু হলেও গণেশের ইঁদুরকে তারা খাতির করে চলত, পৃথিবীর যেখানে যত গণেশ আছে, সবার জন্যে এই নাটবাড়ি থেকে ইঁদুর যায়, এদের কেউ কিছু বলবার যো নেই, কাজেই নেংটি ইঁদুরের দল দেশজুড়ে নানা উৎপাত আর রাজত্ব করছিল, এই সময় কোথা থেকে তাতারি-চুয়ো এসে হানা দিয়ে, যেখানে-সেখানে গণেশ উল্টে ফেলে নেংটি বংশ ধ্বংস করতে শুরু করে দিলে।

গোলাবাড়ি, ঠাকুরবাড়ি, গোয়ালঘর, রান্নাঘর, কাচারিঘর, হেঁসেলঘর, শোবারঘর, বসবারঘর, তোষখানা, বৈঠকখানা, দেশের সব জায়গা থেকে তাড়া খেয়ে নেংটি সরে পড়তে লাগল, লড়ায়ে হারতে থাকল, না খেয়ে মরতে লাগল : শেষে এমন হল যে, এক পুরোনো নাটবাড়ি ছাড়া গণেশের ইঁদুর আর কোথাও রইল না। গণেশের সিংহাসন টলমল করতে থাকল, মানুষে নেংটি ইঁদুর মারত বটে কিন্তু গণেশ তাতে টলেননি, কেননা এত ইঁদুর বাইরে-বাইরে জন্মাত যে মানুষ জন্ম-জন্ম মেরেও তাদের বংশ লোপ করতে পারত না। কিন্তু নেংটিরই বড় জাত যে চুয়ো, তারা যখন এসে হানা দিয়ে পড়ল, তখন গণেশ ভেবে অস্থির হলেন।

এই চুয়োর একেবারে চোয়াড়, যা-তা খায়, দেবতা-ব্রাহ্মণে ভক্তি মোটেই নেই, একেবারে গৌয়ার-গোবিন্দ, দুটি-একটি করে যেন ভালোমানুষের মতো প্রথমে নদীনালা ধারে-ধারে, নৌকোর খোলে এসে বাসা বাঁধলে, দেবতার মন্দিরে কিংবা মানুষের ভাঙা ঘরের উপরে, গ্রাম-নগরের দিকেই ঘেঁষত না—নেংটি ইঁদুরগুলো যেসব

পোড়ো-বাড়ি, পতিত জমি ছেড়ে গেছে সেই জায়গাগুলোয় এসে রইল, নেংটিদের ফেলে দেওয়া যা-কিছু কুড়িয়ে খেয়ে বড় হতে লাগল। ক্রমে তারা বড় হতে হতে শেষে নেংটিদের মাটির কেল্লাগুলো দখল করে জমিদারি ফাঁদলে, সেখান থেকে এ জমিদারী সে-জমিদারী, এ-পরগনা সে-পরগনা, এদেশ সেদেশ, করে সারা দেশ তারা দখল করলে। মাটির নিচেটা দখল করে মাটির উপরে চুয়োর দল লড়াই দিতে যখন বার হল, তখন নেংটিরা বুঝলে দাঁড়াবার স্থান গেছে, নিরুপায় হয়ে তারা যে-কটা পারে তাদের পুরোনো নাটবাড়ির কেল্লায় এসে ঢুকে প্রাণ বাঁচাবার চেষ্টা করতে লাগল। নাটবাড়ির দেওয়াল মোটা, কাজে কাজেই নেংটিরা কতকটা নির্ভয়ে রইল কিন্তু চুয়োরাও ছাড়বার পাত্র নয়; তারা বছরের পর বছর যুদ্ধ চালিয়ে শেষে একদিন নাটবাড়ির উঠোনটা দখল করতে বারোজন তাতারি সওয়ার পাঠিয়ে দিলে! যুদ্ধং দেহি বলে শত্রুদল চারদিক ঘিরে লেজ আপসে লাফালাফি শুরু করে দিয়েছে, চারদিকে সাজ রে সাজ রব পড়ে গেছে—

পায় দল কলবল ভূতল টলমল
সাজল দলবল অটল তাতারি।
দামিনি তক-তক জামকী ধক-ধক
ঝকমক চমকত খরতর বারি।
ধুধু-ধুধুধু নৌবত বাজে,
ঘন ভোরঙ্গ ভম্-ভম্, দামামা দদদম্
ঝননু-ঝম-ঝম ঝাঁজে—
ধা-ধা গুড়-গুড় বাজে।
নিশান ফরফর নিনাদ ধর-ধর
তাতারি গর-গর গাজে।
ধুধু ধম-ধম ঝাঁ-ঝাঁ ঝম-ঝম
দামামা দম-দম বাজে।
রণজয়ী ভেরী বাজে রে ঝাঁগড়-ঝাঁগড় ঝাঁ-ঝাঁ ঝাঁজে রে
মুচরিয়া গোঁফে চলে লাফে-লাফে
খেলে উড়ো পাকে থাকে-থাকে-থাকে ঝাঁপে রে
বাজে রণ ভেরী বাজে রে।
ভয় পেয়ে মরে নেংটি হাজার-হাজার
তল গেল মানমত্তা ইঁদুর রাজার
ঘাসের বোঝায় বসি ইন্দুরানী কাঁদে
ইন্দুরায় এতদিনে পড়িয়াছে ফাঁদে
কান্দি কহে ইন্দুরানী গণেশ গোঁসাই
এমন বিপাকে কতু আর ঠেকি নাই।

এইভাবে ইঁদুর-রানী কাঁদছেন, এদিকে একশো বছরের ইঁদুরের রাজা তাতারিদের ভয়ে থরথরি কম্পমান, রানীর আঁচল ধরে মন্ত্র পড়ছেন, খট ভৈরবী—দ্রুত ত্রিতালি—
আর কেঁদে বলছেন সুর করে :

চল-চল যাই নীলাচলে । (রে অরে যাই)

ঘটালে বিধি ভাগ্যফলে ॥

মহাপ্রভু জগন্নাথ সুভদ্রা বলাই সাথ

দেখিব অক্ষয় বটতলে,

খাইয়া প্রসাদ ভাত মাথায় মুছিব হাত

নাচি বেড়াই কুতূহলে

ভবসিঙ্ধু বিন্দু জানি পার হইনু হেন মানি

সাঁতার খেলিব সিন্ধুজলে ॥

নেংটির রাজা যখন কেব্লা ছেড়ে রানীকে নিয়ে পাছ-দুয়ার দিয়ে গঙ্গাসাগরের দিকে পলায়নের মতলব করছেন—লড়াই না দিয়ে, সেই সময় হাঁসের দল রিদয়কে নিয়ে দেওয়ানগিরির তলায় এসে উড়ে বসল । একদিকে নাটবাড়ির পাথরের পাঁচিল, আর একদিকে হাড়গিলের চর, এরি মাঝে জলের ধারে শুশনি কলমি শাক খেয়ে হাঁসের দল চরে বেড়াচ্ছে, এমন সময় আগুমানি হাঁসের সঙ্গে দেখা, ছোট দল বড় দল দুই দলে অমনি কথাবার্তা চলল, সাঁতার খেলা আরম্ভ হল ।

যোগীগোফাতে ভোড়াদের নিয়ে যে কাণ্ড হয়েছে শুনে আগুমানি বললে—“তা হলে শেয়াল লোভ সহজে ছাড়বে না, নিশ্চয়ই আমাদের পিছু নেবে, আর এখন দুদিন উড়ে কাজ নেই, এইখানেই থাকা যাক, আর ব্রহ্মপুত্রের বাঁক ধরে মানস সাগরেও গিয়ে কাজ নেই । এইখান থেকে বাঁহাতি মোড় নিয়ে একেবারে পাহাড়ের পাশ দিয়ে সোজা উত্তরে চলাই ভালো ।”

চকা বললে—“অজানা রাস্তা কেমন করে যাব ।”

আগুমানি অমনি জবাব দিলে—“অজানা নয়, উত্তর সমুদ্রের ধারে রুশ দেশে যেসব পাখিরা থাকে তারা পাহাড়ের এই গলিপথটা দিয়ে সোজা হিমালয়ের ওপারে চলে যায় । আজ ক’দিন ধরে দলে-দলে সারস বক কাদাখোঁচা জলপীপী এরা দেখি এই পথ দিয়ে যাওয়া-আসা করছে ।”

বুড়ো চকা ঘাড় নেড়ে বললে—“ওহে রাস্তা তো আছে জেনেছ, রাস্তার কোথায়, কেমন দানাপানির ব্যবস্থা তার খবর নিয়েছ কি?”

আগুমানি লালসেরা মাথা নেড়ে বললে—“সে-খবরও নিতে বাকি রাখিনি । এই দেওয়ানগিরি থেকে বড়নদীর রাস্তা বেয়ে সোজা উত্তরে গেলে তাস্গং, তাউয়াং, দুটো বড়-বড় বস্তি, তার পরই চুখাং-এর জলা । সেখানে এক রাস্তির কাটিয়ে তার পরদিন সন্ধ্যায় চোনা হুদ পাওয়া যাবে, তারপর একদিনে নারায়ুম হুদ, সেখান থেকে একবেলার পথ, ‘তিগুৎসো’ । সেখান থেকে পশ্চিমে গেলে পেমো চাং, বাসাং সো, চোলু, খাম্বাজং গৌসাইথান হয়ে ধবলাগিরি, আর উত্তর-পূবে গেলে যামদক্ষা নগরের ধারে প্রকাণ্ড পালতি হুদ, তার পরে ‘তামলং কঙ্কজং’ হয়ে আবার ব্রহ্মপুত্রের রাস্তায় পড়া যেতে পারে, অনেক পাখিই এই রাস্তা দিয়ে চলেছে, সেখোর অভাব হবে না । তা ছাড়া কঙ্কজং-এর রাজা কঙ্ক-পাখির সঙ্গে যখন তোমাদের পরিচয় আগেই হয়ে

গেছে, তখন সেখানেও কিছুদিন জিরিয়ে যাওয়া যেতে পারে।”

চকা ঘাড় নেড়ে বললে—“সেসব ভালো, কিন্তু ওদিকের আকাশটা যেন কেমন ঘোলাটে ঠেকছে, দেওয়ানগিরির উত্তর গা-টাতে মেঘের ছাওয়াটাও দেখতে পচ্ছি; হঠাৎ ওদিকে যাওয়া নয়, দু-একদিন দেখা যাক।”

হাঁসদের মধ্যে এইসব পরামর্শ চলেছে এদিকে রিদয় একটা ডোবায় পা ডুবিয়ে আড়িমাও রাজার পুরোনো নাটবাড়িটার পাঁচিলের দিকে চেয়ে রয়েছে, এমন সময় দেখলে সন্ধের অন্ধকারে পাঁচিলের ধারে রাশ-রাশ নুড়িগুলো যেন নড়তে-চড়তে আরম্ভ করলে, তারপর সার বেঁধে সব নুড়িগুলো কেল্লার দিকে এগোতে লাগল! রিদয় চোঁচিয়ে উঠল—“দ্যাখো-দ্যাখো!” অমনি সব হাঁস সেদিকে চেয়ে দেখলে দলে-দলে চুয়ো রাস্তা ঢেকে চলেছে।

রিদয় যখন বড় ছিল তখন একবার হাঁদুরের কামড় কেমন টের পেয়েছে, এখন এই বুড়ো-আংলা অবস্থায় হাঁদুরের পাল্লায় পড়লে যে কী হবে তাই ভেবে সে কাঠ হয়ে দাঁড়িয়ে রইল! হাঁসেরাও রিদয়ের মতো হাঁদুরের গন্ধ মোটেই সহ্যেতে পারত না, যতক্ষণ সেদিক দিয়ে হাঁদুরগুলো গেল ততক্ষণ সবাই চুপচাপ মুখ বন্ধ করে রইল। তারপর ‘ছি-ছি’ বলে যেন কেবলি ডানা ঝাড়া দিতে শুরু করে দিলে।

চুয়োর দল ছোট-বড় নুড়ির ঝরনার মতো গড়াতে-গড়াতে পাথরের পাঁচিলের গোড়া বেয়ে নাটবাড়ির সিংগি দরজার দিকে চলে গেল, ঠিক সেই সময় আকাশে দুই পা লটপট করতে-করতে হাড়গিলে-রাজ খান্নাজং ঝুপ করে হাঁসদের মধ্যে এসে পড়লেন। রিদয় এমনতরো পাখি কোনোদিন দেখেনি, এঁর মাথা, গলা, আর পিঠ শাদা রাজহাঁসের মতো, ডানা দুখানা কালো দাঁড়াকের মতো, তেলে পাকানো গঁটে-বাঁশের ছড়ির মতো লাল দুখানা সরু ঠ্যাং, আর বারো হাত কাঁকুড়ের তেরো হাত বীচির মতো এতটুকু মাথায় এত বড় এক লম্বা ঠোঁট—এক আঙুল কলমের যেন দশ আঙুল নিব, তার ভারে মাথাটা ঝুঁকেই আছে, মুখের দুপাশে বোয়ালমাছের মতো দুটো চোখ বসানো! রিদয়ের বোধ হল, পাখি মাছ কাঁকুড় কলম বাঁশ সব মিলিয়ে যেন এই পক্ষীরাজ সৃষ্টি হয়েছে!

হাড়গিলেকে দেখে চকা তাড়াতাড়ি ডানার পালক ঝেড়েঝেড়ে সামনে এগিয়ে এসে দণ্ডবৎ হয়ে দু-তিনবার প্রণাম করে দাঁড়িয়ে ভাবতে লাগল হঠাৎ খান্নাজং কী কাজে এলেন? নাটবাড়ির চুড়োয় হাড়গিলের বাসা চকা জানে আর ফাল্গুন মাসের গোড়াতেই হাড়গিলেদের আনবার পূর্বে খান্নাজং বাসাটা একবার তদারক করতে প্রতি বছরে এখানে এসে থাকেন সেটাও জানা কথা। কিন্তু হাড়গিলেরা তো হাঁসদের সঙ্গে প্রায়ই আলাপ-সালাপ রাখে না, হঠাৎ আজ হাঁসের দলে রাজার আগমন হল কেন, এটা চকা ভেবে না পেয়ে একবার ঘাড় চুলকে বললে—“জং বাহাদুরের বাসার খবর ভালো তো, গেল ঝড়বৃষ্টিতে কোনো লোকসান হয়নি তো?”

হাড়গিলেরা সবাই তোতলা, সহজে কথা কওয়া তাদের মুশকিল, খান্নাজং অনেকক্ষণ ঠোঁট কাঁপিয়ে এ-চোখ বুজে ও-চোখ খুলে ভাঙা গলায় কাঁদুনি শুরু করলেন—“বুড়োবয়সে বাসাটা ঝড়ে পড়ে গেছে, একে উঁচু নাটবাড়ি, তায় আবার চুড়ো, গিন্নি দেখে-দেখে

সেখানেই বাসা বাঁধলেন, টিকবে কেন? এই বুড়োবয়সে জল-ঝড়ের মধ্যে ঐ গোটাকতক ভাঙা কাঠির বাসায় তো আমার টেকা দায় হয়েছে! এদিকে আবার মানুষগুলো সমস্ত জলা আর খাল-বিল ভরাট করে তার উপর দিয়ে রেলগাড়ি চালাবার বন্দোবস্ত করচে, দু-একটা সাপ ব্যাঙ যে ধরে খাব তারও রাস্তা বন্ধ! শুনেছি নাকি আবার এই নাটবাড়িটাতে ইন্টিশান বসাবে, তা হলে তো আমাকে এদেশ ছাড়তে হয় দেখি!”

চকা খুব দুঃখ জানিয়ে বললে—“আপনি তো তবু এতকাল এই নাটবাড়িতেই কাটালেন, ইচ্ছে করলে পরেও আপনি ইন্টিশানের চুড়োটায় বাসা বাঁধতে পারেন। মানুষে কোনোদিন আপনার উপরে গুলিও চালাবে না। আর বাসা থেকে আপনার আগবাচ্চা চুরি করে ভেজেও খাবে না, আপনার তো কোনো পরোয়া নেই। বড়জোর এখন চুড়োয় আছেন, নাইয় চরে নেমে বসবেন; কিন্তু আমাদের দশা দেখুন দেখি—

ভোজনং যত্র তত্র শয়নং হট্টমন্দিরে

মরণং গোমতী তীরে অপরদ্বা ভবিষ্যতি!

এইভাবেই সারাজীবন কাটাতে হবে। আপনার তো যাহোক একটা দাঁড়াবার স্থান আছে, আমাদের দশাটা ভাবুন তো। ভবঘুরের মতো—

যেখানে-সেখানে শোও আর খাও

পৃথিবীটা ঘিরে চক্কর দাও

শেষ একদিন অকস্মাৎ!

বিনি মেঘে বজ্রাঘাৎ!

“তাগে পেলেই মানুষ গুলি চালাচ্ছে আমাদের দিকে!”

হাড়গিলে গলার পালকের দাড়ি দুলিয়ে বললেন—“কথাটি তো বলেছ ঠিক, কিন্তু নাটবাড়ি হয়ে পর্যন্ত ঐ চুড়োটায় বাস করে আসছি সাতপুরুষ ধরে, আজ হঠাৎ চুড়ো থেকে চরে বসা কি কম কষ্টের কথা, আর ঐ হাড়গিলের চরটাও শুনেছি মানুষেরা চেষ্টে ফেলে ওখান দিয়ে বড়-বড় মালের জাহাজ চালাবে!”

চকা এবারে আমতা-আমতা করে বললে—“তা হলে তো মুশকিল দেখছি, মানুষের সঙ্গে তো আমরা পেরে উঠব না, এ-বিষয়ে আপনি—”

এবারে হাড়গিলে ঠোট বাজিয়ে বলে উঠলেন—“আহ, সে মানুষের কথা, যখন তারা আসবে তখন ভাবা যাবে। এখন একটা কথা শুধোই, এদিক দিয়ে চুয়োদের পল্টন যেতে দেখছ কি?” হাজার-হাজার চুয়ো এইমাত্র এইদিক দিয়ে গেছে শুনে হাড়গিলে আকাশে চোখ তুলে বললে—“এতদিনে বুদ্ধি গণেশের ইঁদুরের দফা রফা, আজ রাতের মধ্যেই চুয়োর নাটবাড়ি দখল করবে।”

চকা ভয় পেয়ে বললে—“কী বলেন লড়াই বাধবে নাকি?”

হাড়গিলে বলে উঠলেন—“বাধবে আর কি, বিনাযুদ্ধে চুয়োর আজ কেবলা মেরে নেবে, রাজা গঙ্গাসাগরের দিকে রানীকে নিয়ে দৌড় দিয়েছেন। বামুন গেল ঘর তো লাঙ্গল তুলে ধর, কেবলায় যারা ছিল তারা মানস-সরোবরের ধারে আসছে পূর্ণিমায়

পক্ষিরদলের বারোয়ারির নাচ দেখতে ছুটেছে, ঠিক ঝোপ বুঝেই চুয়োর দল কোপ দিতে চলেছে। কেল্লায় গোটাকতক অকর্মণ্য বুড়ো নেংটি ছাড়া আর তো কেউ নেই, এতকাল নেংটিদের সঙ্গে এই নাটবাড়িতে কাটালাম, এখন বুড়ো বয়সে আর শিং ভেঙে বাছুরের দলে যাওয়ার মতো চুয়োর দলে ভিড়তে আমার ইচ্ছে যায় না, তাই ভাবছি থাকি কি যাই।”

হাড়গিলে যে ইঁদুরদের বিপদের খবরটা না দিয়ে হাঁসের দলে এসে কাঁদুনি শুরু করেছে এটা চকার মোটে ভালো লাগল না। সে একটু এগিয়ে গিয়ে হাড়গিলেকে বললে—“গণেশের ইঁদুরদের আপনি ও-খবরটা পাঠাননি এখনো?”

হাড়গিলে গলার থলি দুলিয়ে বললে—“খবর দিয়ে লাভ? তারা আসবার আগেই সে-কেল্লা দখল হয়ে যাবে।”

চকা এবারে চটে বললে—“হয়ে যাবে বললেই হয়ে গেল, এমন অঘটন হতে দেব না আমি বলছি!”

যে-চকার ঠোঁট একেবারে ভোঁতা, নেই বললেই হয় আর যার পায়ের নখও ততোধিক ধারালো, সঙ্গে না হলেই যার ঘুম আসে, তিনি লড়তে চান চিরুনিদাঁত চুয়োদের সঙ্গে! হাড়গিলে হেসেই অস্থির। ঘাড় নেড়ে চকাকে বললেন—“বুরুঞ্জিতে লেখা আছে এই ঘটবে, কারো সাধ্য নেই তা রদ করা, আমি পণ্ডিতদের দিয়ে গণিয়ে দেখেছি কোনো উপায় নেই, না হলে আমি চুপ করে বসে আছি!”

চকা হাড়গিলের কথায় কান না দিয়ে ডাক দিলে—“পাঁপড়া নানকৌড়ি, নেড়োল কাটচাল, লালসেরা আগুমানি, চোখ-ধলা ডানকানি, পাটাবুকো হামস্তি, মারাগুই চাপড়া, তীরগুশি আকায়ব, তোমরা যাও মানস-সরোবরের পথে যত নেংটি দেখবে সবাইকে খবর দাও লড়াই বাধবে।” অমনি সাতটা বুনাহাঁস অন্ধকারে ডানা ছড়িয়ে উড়ে পড়ল। চকা আবার বাঙলাদেশের হাঁসদের ডাক দিলে—“সনদ্বীপের বাঙাল, ধনমাণিকের কাওয়াজি, রামমঙ্গলার ঘেংরাল, চব্বিশ পরগনার সরাল!” অমনি তেল চুকচুকে মোটাপেট পাঁচজন উপস্থিত হল হেলতে-দুলতে, চকা তাদের বললে—“চট করে যাও গঙ্গাসাগরের দিকে, নেংটিদের রাজা পলাতক ইঁদুরায় আর ইন্দুরানীকে ফিরিয়ে আনো!” কিন্তু এবারের দল অত চটপট উড়ে পড়ল না, বাঙাল মাথা চুলকে বললে—“এ-কাজটা কি সমীচীন হবে, ইঁদুরের যুদ্ধে হাঁসদের যোগ দেওয়া কি সঙ্গত, তা ছাড়া এই অন্ধকার রাতে আপনাকে একলা এই শত্রুদের মাঝে—”

চকা ধমকে উঠল : “বড় দেরি করছ তোমরা!” বাঙলার হাঁসরা পটাস-পটাস করে ডানা ঝাপটে দক্ষিণমুখে আস্তে-আস্তে উড়ে চলল।

চকা তাদের দিকে খানিক কটমট করে চেয়ে থেকে সুবচনীরা হাঁসকে বললে—“তুমি গিয়ে হাড়গিলে চরে চুপচাপ বসে থাকো, আমি কেবল হংপাল বুড়ো-আংলাকে পিঠে নিয়ে নাটবাড়িতে যাব, যদি কেউ চুয়োদের তাড়াতে পারে তো এই ছোকরা।” বলে চকা হাড়গিলের সঙ্গে রিদয়ের আলাপ করে দিলে।

টিকটিকির মতো বুড়ো-আংলাকে দেখে হাড়গিলে একবার গলার থলি ফুলিয়ে খানিক হেলে-দুলে হেসে নিলেন। তারপরে ঝপ করে ঠোঁটে করে রিদয়কে আকাশে ছুড়ে-ছুড়ে

লোফালুফি শুরু করে দিলেন, রিদয় ভয়ে চীৎকার করতে লাগল। চকা তাড়াতাড়ি ছুটে এসে বললে—“জং বাহাদুর করেন কী! ওটা মানুষ—ব্যাঙ নয়, ওকে ছাড়ুন, গেল যে!”

“মানুষ!” বলেই হাড়গিলে মাটিতে রিদয়কে নামিয়ে দিয়ে দু-চারবার ডানা آپসে নৃত্য করে বললেন—“বুরুঞ্জিতে ঠিক তো লিখেছে, অসুষ্ঠপ্রমাণ এই মহাপুরুষ এসেছেন ঠিক ভূতচতুর্দশীতেই, আর ভয় নেই, আমি এখনি গিয়ে নাটবাড়ির সকলকে এ-খবর দিচ্ছি। জয় গণেশের জয়!” বলে হাড়গিলে নাটবাড়ির দিকে উড়ে গেল।

হাড়গিলের ব্যবহারে রিদয় ভারি চটে ছিল, সে গৌ হয়ে চকার পিঠে উঠে বসল। নাটবাড়ির চুড়োয় একখানা যাঁতার মতো পাথর, তার মাঝখানটায় রাজাদের ধ্বজি গাড়বার গর্ত, সেই গর্তে খানদুই পুরোনো হোগলাপাতার মাদুর বিছানো, তার উপর কাঠকুটো আর পালকের তোশক, একপাশে কোন কালের রানীদের ছেঁড়া কাপড়ের একটুকরো জরির আঁচল মাদুর-ছেঁড়ার মধ্যে ঝিকমিক করছে, কতকালের মরচে-ধরা একটা খিল-ভাঙা তালা, একটা কলঙ্ক-পড়া রূপোর চুষিকাঠি, ভেঁতা একটা শরের কলম, ছেঁড়া একপাটি জরির লপেটা জুতো, আধখানা পরকলা লাগানো শিং-এর চশমা একটা, গেল বছরের ফাটা টিনের পেয়ালার মতো গোটাকতক ডিমের খোলা, পেটটা ফুটো করা একটা আধমরা ব্যাঙ, এমনি সব নানা সাজ-সরঞ্জাম দিয়ে বাসাটা ভর্তি। কতকালের সে বাসা তার ঠিক নেই, তার গায়ে ছোট-বড় ঘাস-পাতা গজিয়ে গেছে, এমনকি গোটাবারো লতাওয়ালা একটা বটগাছ পর্যন্ত, তাতে আবার ফল ধরেছে।

চকার সঙ্গে রিদয় এসে দেখলে নাটবাড়ির সবাই এসে আজ বাসায় হাড়গিলেকে ঘিরে কীসব পরামর্শ করছে, বুড়ো ভূতুম-পেঁচা একদিকে বসে গোল দুই চোখ বার করে কেবলি হুঁ-হুঁ সায় দিচ্ছে, কালো বেরালটা লেজ নাড়ছে আর মিউমিউ করে কী যে বকছে তার ঠিক নেই, হাড়গিলে মাঝে বসে কেবলি গলার থলি ঝাড়ছেন আর পাঁচ গুণ্ডা বুড়ো নেংটি ইঁদুর শুকনোমুখে একধারে চুপটি করে বসে এদিক-ওদিক কান ঘোরাচ্ছে।

ইঁদুর বেরাল পেঁচা হাড়গিলে এখানে জমা হয়েছে দেখেই রিদয় বুঝলে নাটবাড়িতে আজ বিষম গুণ্ডগোল। চকা আর রিদয়ের দিকে কেউ আজ চেয়েও দেখলে না, সবাই চেয়ে রয়েছে হাঁ করে যেদিক দিয়ে দলে-দলে চুয়ো সার বেঁধে মাঠের উপর দিয়ে আসছে!

ভূতুম-পেঁচা খানিক ভূতের মতো নাকিসুরে চুয়োদের বিষম উৎপাতের কথা বর্ণনা করে চলল। বেরাল মিউমিউ করে খানিক কাঁদুনি গাইলে—“এই বুড়ো বয়সে শেষে কি চুয়োর পেটে যেতে হবে নাকি, আগবাচ্চা কাউকেই তারা রেহাই দেবে না!”

হাড়গিলে ইঁদুরদের ধমকে বললেন—“এই দুঃসময়ে তোমাদের চাঁইদের বারোয়ারিতে যেতে দিয়ে যত মুখ্যামি করেছ, লড়াই দেবার জন্যে একটা লোক পর্যন্ত রইল না কেব্লায়! আমি কি এই বুড়ো বয়সে চুয়ো মেরে ঠোঁটে গন্ধ করতে পারি, ছি-ছি! এমন করে কেব্লা ফাঁক রেখে সব নেংটির চলে যাওয়াটা ভারি অন্যায় হয়েছে!”

ইঁদুরগুলো কেবল হতভম্ব হয়ে বেরালের দিকে চাইতে লাগল। বেরাল ফোগলা দাঁত খিচিয়ে বললে—“আমার দিকে দেখছ কী? তোমরা নিজেদের ঘর সামলাতে না পার নিজেরাই মরবে। আমার কী, আমি ষষ্ঠীর দুয়ারে গিয়ে ধন্য দেব। সেখানে

পেসাদের কিছু না পাই দুধ তো আছে।”

ইদুরেরা হাড়গিলের দিকে চাইতে তিনি গম্ভীর হয়ে বললেন—“আমি আর কী করতে পারি বলো? এই অঙ্গুষ্ঠপ্রমাণ টিকটিকির মতো মানুষটিকে তোমাদের এনে দিলেম, এঁর সঙ্গে পরামর্শ করে যা ভালো হয় করো। আমার যথাসাধ্য তো তোমাদের জন্যে করলেম, এখন যা করেন গণেশ ঠাকুর। আঃ আর পারিনে!” বলে হাড়গিলে পা মোড়া দিয়ে আকাশের দিকে ঠোট তুলে চোখ বুজলেন।

ইদুর বেরাল পেঁচা একবার রিদয়ের মুখের দিকে চাইলে তারপর আন্তে-আন্তে সভা ছেড়ে যে যার বাসায় যাবার উদ্যোগ করলে। এদের রকম দেখে চকার এমনি রাগ হচ্ছিল যে সবকটাকে ঠেলে সে চুয়াদের মুখে ফেলে দেয়, বিশেষ করে ওই একঠেঙে হাড়গিলেটাকে একধাক্কায় নাটবাড়ির চুড়ো থেকে একেবারে নিচে ফেলে দেবার জন্যে চকা নিসপিস করতে লাগল।

রিদয় তাকে চোখ টিপে বললে—“চুয়াদের জন্ম করা শক্ত নয়, যদি নাটবাড়ির ঠাকুরঘরের লক্ষ্মীপেঁচা আমাকে এখন একবার ঠাকুরঘরে যে-দুয়োরের উপরে কুলুঙ্গিতে গণেশ বসে আছেন তাঁর কাছে নিয়ে যান!”

ভূতুম অমনি তাড়াতাড়ি লক্ষ্মীপেঁচাকে ডেকে আনলে। রিদয় লক্ষ্মীপেঁচাকে গণেশের কথা শুধোতে সে বললে—“ঠাকুর তো এখন শয়ন করেছেন, ঠাকুরঘরের দরজা বন্ধ!” রিদয় চকার সঙ্গে চুপিচুপি দু-একটা কথা বলাবলি করে পেঁচাকে বললে—“পুরোনো দরজা খুলে নিতে কতক্ষণ? চলো, পথ দেখাও।”

লক্ষ্মীপেঁচা আগে পথ দেখিয়ে চলল, সঙ্গে রিদয়।

চকা বললে—“এই ভূতচতুর্দশীর রাত্রের পোড়োবাড়িতে একা তোমায় যেতে দিতে মন সরছে না—যদি পেঁচায় পায়, আমাকেও সঙ্গে যেতে হল।”

হাড়গিলে অমনি তাড়াতাড়ি বলে উঠলেন—“না-না, সে হতে পারে না, তুমি গেলে গোল হবে, বুরুঞ্জিতে লিখছে এই ভূতচতুর্দশীতে একা এই অঙ্গুলিপ্রমাণ মানুষটি এসে নাটবাড়িতে মৃষিকদের পুনঃপ্রতিষ্ঠা করে হাড়গিলে-বংশের সুখসৌভাগ্য বৃদ্ধি করবেন। তুমি গেলে শাস্ত্রের কথা মিথ্যা হয়ে যায়। এই নাও শনিবার অমাবস্যাতে তোলা এই মানকচুর শিকড় সঙ্গে রাখো, ভূত পালাবে।” বলে রিদয়ের হাতে হাড়গিলে তাঁর বাসার ছেঁড়া-মাদুর একটু ভেঙে দিয়ে তার কানে মন্তর দিলেন।

রিদয় ঝাঁকড়াচুলের মধ্যে কচুর শিকড় গুঁজে চিলে ছাতের গোল সিঁড়ি বেয়ে পেঁচার সঙ্গে নেমে চলল, মনে-মনে ভূতের মন্তর আওড়াতে-আওড়াতে—হং সং বং লং হাঃ ফুঃ। ভূতচতুর্দশীর রাত্রি এমন অন্ধকার যে, ভূতকে পর্যন্ত দেখা যায় না! রিদয় সেই অন্ধকারে পেঁচার সঙ্গে চিলের ছাতের ঘোরানো সিঁড়ি দিয়ে ক্রমাগত নেমে চলেছে। দূরদিকে পিছল পাথরের দেওয়াল, তার মাঝে-মাঝে এক-একটা ঘুলঘুলি, সেইখান দিয়ে একটু যা আলো আর বাতাস আসতে পায়! রিদয় দেওয়ালের গা ঘেঁষে টিকটিকির মতো পায়ে-পায়ে নামছে, অন্ধকারে পেঁচা যে কোন দিকে চলেছে সে-ই জানে, কেবল সে এক-একবার হাঁকছে—“উঁচা-নিচা!” আর সেই ডাক শুনে রিদয় চলেছে, ইক্ষুপের প্যাঁচের মতো পাক-দেওয়া সিঁড়ি পার হয়ে অন্ধকারে!

একটা কিসের গায়ে হাত পড়তেই সেটা কেঁ বলে ঝটপট করে উঠল, এক জায়গায় জল পড়ে ডোবা মতো হয়েছে হঠাৎ ঠাণ্ডা জলে পা রেখেই রিদয় থমকে দাঁড়াল, পেঁচা অমনি বলে উঠল—“বাঁয়ে ঘেঁষে।” কখনো বাঁয়ে কখনো ডাইনে কখনো উঁচায় কখনো নিচায় এইভাবে রিদয় চলেছে! চোখে কিছু দেখছে না, কানে শুনছে খালি যেন এখানে কী একটা ঝটপট করে উঠল, ওখানে মাথার উপর থেকে কী ঠিক ঠিক করে ডাক দিলে, কখনো শুনলে পাথরের গায়ে কে নখ আঁচড়াচ্ছে, ওদিকে কারা যেন দুন্দাড় করে পালিয়ে গেল, পায়ের কাছে কী একটা পাশমোড়া দিলে, হঠাৎ গালে যেন কে একটা চিমটি কেটে গেল, কানের কাছে চট করে একটা কে ‘টু’ দিয়ে পালাল! এর উপরে রিদয় নানা বিভীষিকা দেখছে—হঠাৎ এক জায়গায় গোটাকতক চোখ আলেয়ার মতো জ্বলেই আবার নিভে গেল। যেন ইলিশমাছের জাল নাকের সামনে কে একবার ঝেড়ে দিয়েই সরে পড়ল, হঠাৎ একটা গরম হাওয়া মুখে লাগল, তার পরেই বরফের মতো বাতাস এসে কাঁপিয়ে দিলে!

রিদয়ের মনে হচ্ছে এইবার সিঁড়ি শেষ হল কিন্তু খানিক গিয়ে আবার সিঁড়ি, আবার চাতাল, আবার ধাপ, আবার দেওয়াল, এমনি ক্রমাগত ওঠানামা করতে করতে চলা—এর যেন শেষ নেই। আঁধি ধাদি ভূত পেত্নি ব্রহ্মদৈত্য বাম বামড়ি কন্ধকাটা শাঁকচুনি ডাকিনী যোগিনী ভ্যাল ভেলকি, পেটকামড়ি সবই আজ ভূতচতুর্দশীতে জটলা করতে বেরিয়েছে, আঁদাড়ে-পাঁদাড়ে রিদয়কে দেখে কেউ ঝমঝম করে নাচতে লাগল, কেউ ফিকফিক করে হাসতে লাগল। খুস-খাস খিট-খাট আওয়াজ করে ভূতেরা কেউ খড়ম পায়ের, কেউ হাড় মড়-মড় করে, কেউ বা ঘণ্টা বাজিয়ে, কেউ বা চটি চটপট করে তার সঙ্গে সিঁড়ি বেয়ে নামছে। ভয়ে রিদয়ের হাত পা অবশ হয়ে এসেছে, ঠিক সেই সময় সরু গলির শেষে মস্ত একটা চাতালের উপর এসে পেঁচা ‘ঠাকুরবাড়ি’ বলেই অন্ধকারে কোথায় মিলিয়ে গেল!

অনেকক্ষণ ধরে কারুর সাড়াশব্দ নেই, রিদয় অন্ধকারে হাতড়ে দেখলে চারিদিকে দেওয়াল, দরজাও নেই, কিছুই নেই! রিদয় ভয়ে কাঠ হয়ে দাঁড়িয়ে আছে, একটা কে তার পায়ের এসে সুড়সুড়ি দিয়ে তাকে আস্তে-আস্তে দেওয়ালের কাছে টেনে নিয়ে গেল, তারপর কিচ করে যেন চাবি খোলার শব্দ হল! একটা মস্ত দরজা হড়হড় করে গড়িয়ে আপনি যেন খুলে যাচ্ছে, পায়ের নিচে পাথরের মেঝেটা তারি ভারে কাঁপছে!

ঠিক সেই সময় বিকট শব্দে মাথার উপর ঘটং-ঘং ঘটং-ঘং করে রাত বারোটার ঘড়ি পড়ল। অমনি দপ-দপ করে চারদিকে আলোয় আলো এসে দেওয়ালির পিদুম জ্বালিয়ে দিলে, আর ঘণ্টা নাড়তে-নাড়তে ভয়ঙ্কর এক কাপালিক ব্রহ্মদৈত্য মড়ার মাথার খুলিতে ঘিয়ের সলতে জ্বালিয়ে উপস্থিত—

গলে দোলে ভীষণ রুদ্রাক্ষ মালা

পিঙ্গল নয়নে যেন মহেশ্বরের কোপানল জ্বালা!

রিদয় দেখলে ঘরের মধ্যে কালো পাথরের প্রকাণ্ড এক মূর্তি, তাতে কতকালের রক্ত-চন্দনের ছিটে, ভৈরবটির জিভ লকলক করছে আর গায়ে সোনা-রূপো হীরে-

জহরৎ আর মুণ্ডমালা বুলছে! ব্রহ্মদৈত্য আরতি আরম্ভ করলেন :

রম্-রম্ রম্-রম্ শব্দ উঠে

ভূত প্রেত পিশাচ দাঁড়ায় সবে জোড় করপুটে ।

তাধিয়া-তাধিয়া বাজায় তাল

তোতা খেই-খেই বলে বেতাল

ববম-ববম বাজায়ে গাল

ডিমি-ডিমি বাজে ডমরু ভাল

ভবম-ভবম বাজায়ে শিঙ্গা

মুদঙ্গ বাজায় তাধিঙ্গা-ধিঙ্গা

খেই-খেই নাচে পিশাচ দানা ।

রিদয় হাঁ করে ভূতের কাণ্ড দেখছে এমন সময় পেঁচা কানের কাছে ফিসফিস করে বললে, “এখানে নয়, পাশের কুঠরিতে গণেশ ঠাকুরের সভা।” হোমের ধোঁয়ায় আলোগুলো ক্রমে ঘোলাটে হয়ে এল; সেই সময় রিদয় পেঁচার সঙ্গে আস্তে-আস্তে পাশ কাটিয়ে গণেশ-মহলের গলিতে সঁধোল। দেউড়িতে একটা মোটাপেট হিন্দুস্থানী দরোয়ান সিঁদ্ধি খেয়ে খালিগায়ে ভাঁ হয়ে ঢোলক পিটছে, অন্ধকারে রিদয় তাকেই গণেশ ভেবে চিপ করে একটা পেন্নাম দিয়ে হাতজোড় করে দাঁড়াল।

দারোয়ানজী ভারী গলায় বললে, “কৌন হোঃ?”

রিদয় কিছুই বুঝলে না, তবু ঘাড় নেড়ে বললে—“আজ্ঞে আমি রিদয়, নেংটি ইঁদুরেরা বড় বিপদে পড়েছে তাই—”

“ক্যা বক্ বক্ লাগায়া”—বলে দারোয়ান আবার ঢোল পিটতে লাগল।

রিদয় ভাবলে গণেশ বকের কথা শুধোচ্ছেন; সে তাড়াতাড়ি বললে—“আজ্ঞে বকের সঙ্গে আমার আলাপ আছে, কিন্তু আজ আমি ইঁদুরদের হয়ে লড়াই করতে চাই, সেইজন্যে আপনার ঐ জয়ঢাকটি আমি চাই।” বলে রিদয় যেমন ঢোলকে হাত দিয়েছে, অমনি গণেশের দরোয়ান ধমকে উঠল—“ধৎ তেরি!”

রিদয় ভয়ে দশহাত পিছিয়ে পড়ল—সেই সময় পেঁচা এসে তার কানে-কানে বললে—“করছ কী? উনি গণেশ নন, ভিতরে চলো!” তারপর দারোয়ানের সঙ্গে পেঁচা গিয়ে কী খানিক বকাবকি করলে, তখন দরোয়ান দুয়োর ছেড়ে দিয়ে বললে—“আইয়ে বাবু!”

মহলের মধ্যে গণেশের পরিচয় চৌষট্টি ভাগ কলাবৌ, কেউ রঙতুলি নিয়ে আলপনা দিচ্ছিল, কেউ সেতার বাজিয়ে গান-বাজনা করছিল, কেউ মালা গাঁথছিল, কাঁথা বুনছিল, এমনি চৌষট্টি খাখা ঘরের মধ্যে সবাই এক-এক কাজে, হঠাৎ রিদয়কে দেখে সবাই মাথায় ঘোমটা টেনে জুজুবুড়িটি হয়ে বসল।

পেঁচা সেখান থেকে রিদয়কে নিয়ে আর একটা হাতিগুঁড়ো গজদন্তের খিলানোর মধ্যে দিয়ে গণপতি গণেশের বৈঠকখানায় এনে হাজির করে দিলে। রিদয় দেখলে ঘরের উত্তর গায়ে মস্ত একটা তক্তাপোশে গের্দা হেলান দিয়ে থান ধুতি পরে মেরজাই পরে এক ভদ্রলোক বসে আছেন, তাঁর গজদাঁতও নেই গুঁড়ও নেই, মোটা পেটও নয়, দিকি দেবতার মতো চেহারা!

পেঁচা রিদয়ের কানে-কানে বললে—“ইনিই রাজা গণেশ, ঐকে যা দরবার করতে হয় করো।”

রিদয়ের মুখে কথা নেই, ইনিই গণেশ! ভয়ে-ভয়ে সে এগিয়ে বললে—“মশায়ের নাম?”

উত্তর হল—“আমি গণপতি, কী চাই?”

রিদয় খুব নরম হয়ে বললে—“যে-ইদুরগুলিতে চড়ে মশায় বেড়িয়ে বেড়ান সেগুলির বড় বিপদ উপস্থিত!”

গণেশ ভুরু কুঁচকে বললেন—“ইদুর! আমি তো কোনোদিন ইদুরে চড়িনে!”

রিদয় বললে—“আজ্ঞে, ভুলে যাচ্ছেন আপনি, হস্তী-বেশ ধরে যখন হাওয়া খেতে বেরোন, সেই সময় যে ইদুর আপনার গাড়ি—”

গণেশ হোঃ-হোঃ করে হেসে বললেন—“তুমি পাগল নাকি আমাকে সুদ্ধ গাড়ি টেনে চলতে পারে যে ইদুর তাকে তুমি কোথায় দেখলে? ছেলেবেলায় আমি দু-একটা ইদুর পুষেছিলাম কিন্তু সবগুলোর বাচ্চা হয়ে আমার ঘরে এমনি উৎপাত লাগালে যে, সব ক’টাকে আমি ইদুর-কলে ধরে বিদায় করেছি। তুমি ভুল খবর শুনেছ, ইদুরে আমি চড়িনে, হস্তীবোশেও সঙ সেজে আমি হাওয়া খেতে যাইনে, নিশ্চয়ই কেউ তোমায় ঠকিয়েছে!”

রিদয় অবাক হয়ে বললে—“সে কী মশায়, ঘরে-ঘরে ইদুরে-চড়া আপনার ছবি, তা ছাড়া আমি নিজের চোখে দেখছি আপনি ঢোল বাজিয়ে ইদুর-নাচ করছেন, আমাকে শাপ পর্যন্ত দিয়ে এলেন, এখন বলছেন উল্টো, আমাকে ছলনা করছেন!”

গণেশ গম্ভীর হয়ে বললেন—“বাপু আমি যা-ই করি, এটুকু জেনো আমি ছলনাও করিনি শাপও দিইনি! ইদুরেও চড়িনি কোনোদিন, ঢোলও পিটিনি। ওই আমার দারোয়ানগুলো মাঝে-মাঝে হোলিতে দেওয়ালিতে ঢোল পিটিয়ে আমার কান ঝালাপালা করে, ওদের গিয়ে শুধোও। যদি আর কোনো গণেশ থাকেন তো বলতে পারিনে।”

রিদয় চোখ মুছে বললে—“মশায় যে আমাকে শাপ দিলেন, এখন শাপান্ত না করে দিলে তো আমি মারা যাই!”

গণপতি চোখ পাকিয়ে বললেন—“কোনো সাপের ওঝাকে শুধোওগে বলে দেবে, কে তোমায় শাপ দিয়েছে আর কেমন করে শাপান্ত হবে—যাও, আমাকে বিরক্ত করো না!”

রিদয় মুখ কাঁচুমাচু করে বললে—“মশায়, আমি গরিব!”

গণেশ বিরক্ত হয়ে মুখ ফেরালেন।

রিদয় জানত তুতি করলেই দেবতারা খুশি হন, তাই সে একেবারে গলায় বস্তুর দিয়ে গণেশের রূপ বর্ণনা করে গণেশ-বন্দনা শুরু করে দিলে :

খর্ব্বল কলেবর গজমুখ লম্বোদর

বিষ্য নাশ করো বিষ্মরাজ,

পূজা হোম যোগে যোগে তোমার অর্চনা আগে

তব নামে সিদ্ধ সর্ব কাজ।

শুণে তুলে খৈ মোয়া দস্তে খাও চিবাইয়া
 ইদুর বাহন গণপতি,
 আপনি আসরে উর রিদয়ের আশা পুর
 নিবেদিনু করিয়া প্রণতি ।

গণেশ কানে হাত দিয়ে বললেন—“আরে রাম রাম কী বাজে বকছ, তুমি তো ভালো বিপদে ফেললে দেখি, রোসো আমি একবার বাড়ির মধ্যে থেকে আসছি, বিশেষ কাজ আছে ।” বলে গণেশ উঠে গেলেন ।

এতক্ষণ গণেশের চৌষটি কলাবৌ ঘরে কী হচ্ছে দরজার পাশ দিয়ে উঁকি দিয়ে দেখছিলেন, কর্তা উঠে যেতেই গণেশ-দাসীকে দিয়ে রিদয়কে ডেকে তাঁরা শুধোলেন—“হ্যাঁগা তুমি কর্তার কাছে কী নালিশ করছিলে?” রিদয়ের মুখে ইঁদুরের খবর শুনে তাঁরা বলে উঠলেন—“ওমা, এই দরবার করতে এসেছ তা বলতে হয়, ওই আমাদের কুমোর-বৌ কর্তার যে মূর্তিগুলো গড়ে-গড়ে ভটচাফি মশায়ের হাতে দিয়ে লোকের ঘরে-ঘরে বিক্রি করতে পাঠায়, সেই গণেশের তুমি বুঝি সন্ধান করছ? ওই দয়োয়ানজীকে বলো সে তোমাকে সেই গণেশের দোকান দেখিয়ে দেবে ।”

রিদয় কলাবৌদের পেন্নাম করে আবার দেউড়িতে এসে দরোয়ানজীর সঙ্গে আর একটা ঘুপসিঘরে গিয়ে দেখলে, দোকানঘরের এক-এক কুলুঙ্গিতে এক-একরকম গণেশ—গোবর-গণেশ তিনি কলম হাতে পুঁথি লিখছেন, সিদ্ধিদাতা-গণেশ তিনি এক ধামা দিল্লির লাডু নিয়ে বসেছেন, মাড়োয়ারি-পটির টঙ্ক-গণেশ বসে-বসে খালি আকাশে আঁকশি দিচ্ছেন, হেড়ম্ব-গণেশ তিনি খুব আড়ম্বর করে ঢোল পিটছেন ।

রিদয় টিপ করে তাঁকে নমস্কার করে বললে—“গণেশদাদা, চিনতে পারেন?” হেড়ম্ব রিদয়ের কথার জবাব দিলেন সমস্কৃত দেবভাষায়—“বুং!” রিদয় ভাবলে এ তো মুশকিল, যদি বা কত কষ্টে এসে ধরলেম, এখন কথা না বুঝলে উপায়? সে একবার ইঁদুরের দিকে, একবার ঢোলকের দিকে একবার নিজের দিকে আঙুল নেড়ে ইশারায় বোঝালে ঢোলকটা চাই । গণেশ ঢোলকটা রিদয়কে দিয়ে এদিক-ওদিক গুঁড় নেড়ে কী বললেন বোঝা গেল না । রিদয় শুধু শুনলে—“বুং চটাপট্ তুং কং করং বাদনং পুনস্তম্ ব্যস্তম্ নাদম্ কুণ্ডমকুলম্ পৌউন্ড্রবর্দ্ধনম্ গণ্ডস্থলম্ আগচ্ছতু ।”

রিদয় গণেশের মুখ দেখে বুঝলে তিনি খুব খুশি হয়েছেন । সে অমনি আচার্যি পুরুতকে দুর্গোপজ্যেয় শ্রাদ্ধে শান্তিতে যেমন করে সব মন্তর আওড়াতে শুনেছিল ঠিক তারি নকলে বললে—“হুং ভূত স্বাহা, কুরু-কুরু কুণ্ডলিনী নমোঃ আসিতো দেবল গৃহাং কুরু ভূভাং হং যং ছট ফট ব্রহ্মবিদ্যা হরিষে স্বাহা অহং চিটপটাং হুং শান্তি ভূশান্তি ভূতরশান্তি অষধেঃশান্তি ছিহরি ছিহরি ছিহরি হরিবোল হরিবোল হরিবোল সূর্য প্রণাম ।” গণেশ খুশি হয়ে দুবার ঘাড় নেড়ে “তথাস্তু” বলে চোখ বুজলেন ।

রিদয় আস্তে-আস্তে ঢোলক নিয়ে বেরিয়ে এল । দরোয়ান ঘরের দুয়োরেই দাঁড়িয়ে ছিল, সে অমনি বখশিশের জন্যে হাত পাতল, রিদয় এদিক-ওদিক দেখে আস্তে-আস্তে মানকচুর শিকড়টি বার করে বললে—“দরোয়ানজি আর তো সঙ্গে কিছু নেই, এইটে নাও ।”

দরোয়ান ‘হাং তেরি,’ বলে হাত ঝাড়া দিলে ।

শিকড় যেমন মাটিতে পড়া অমনি পেঁচা রিদয়কে ছোঁ দিয়ে একেবারে ঘুরোনো সিঁড়ি বেয়ে ছাতে এসে উপস্থিত। সঙ্গে-সঙ্গে পেঁচো এসে রিদয়কে পেয়ে বসল—রিদয় অজ্ঞান হয়ে পড়ল আর বহুরূপীর চামড়ার মতো তার গায়ের রঙ লাল, নীল, হলদে, রকম-রকম বদলাতে আরম্ভ করলে। হাড়গিলে অমনি তাড়াতাড়ি ছুটে এসে মস্তুর পড়ে পেঁচো ঝাড়তে বসে গেলেন :

স্বপ্নাপসার শকুনী
অন্ধ পুতনা শীত পুতনা মুখমণ্ডিকা
নৈগমেষ প্রসীদতু
ক্লীং চর্চ হং হং ঝংখা
ওঁলং শ্রীং কপালিকং জং জং
তিষ্ঠতি মুষিকং চং চং চর্কশং হংসঃ
হং ফট্ স্বাহা।

মস্তুরের চোটে রিদয় হাঁ করলে, যেন খেতে এল, অমনি চট করে হাড়গিলে ধুলোপড়া বেড়ি দিয়ে পেঁচোর মুখবন্ধন করে দিলেন :

ধূল-ধূল স্বর্গের ধূল
মর্তের মাটি
লাগ-লাগ পেঁচোর দস্ত-কপাটি
হাঁ করে নাড়িস তুও খা পেঁচির মুণ্ড
যাঃ ফুঃ
কার আঙে হাড়িপ বাবার আঙে
হাঁড় মড়-মড় হাড়গিলের আঙে।
শিগরি যাঃ শিগরি যাওঃ।

পেঁচো রিদয়কে ছেড়ে পালাতেই রিদয় ধড়মড়িয়ে উঠে বসল। চকা রিদয়ের কানে-কানে শুধোলে—“গণেশ কী বললেন?”

রিদয় বললে—“তা তো সবটা বুঝলুম না, কেবল আসবার সময় তিনি বললেন—তথাস্তু।”

চকা হেসে বললে—“তবে আর কী, কেবলা মার দিয়া! আর তোমাদের ভয় নেই। একদিন সকালে উঠে দেখবে, যে-রিদয় সেই রিদয় হয়ে গেছে। চলো এখন যুদ্ধং দেহি করা যাক গে।”

এদিকে কেবলা খালি পেয়ে চুয়োর দল এ-ওর পিঠে চড়ে একটা ঘুলঘুলি দিয়ে কেবলার মধ্যে ঝাঁপিয়ে পড়ে একটার পর একটা নেংটি ইঁদুরের গড়াভাগুর সব দখল করে লুঠের চেষ্টায় দলে-দলে পিলপিল করে অন্ধকার সিঁড়ি বেয়ে তেতলায় চৌতলায় পাঁচতলায় উঠে ছতলায় রাজসভায় ঠাকুরবাড়িতে, এমনকি অন্দরমহলে পর্যন্ত ঢোকবার যোগাড়, দু-একটা চুয়ো ছাতেও উঠে হাড়গিলের বাসাটা পর্যন্ত প্রায় এগিয়েছে। এমন সময় উত্তর দক্ষিণ থেকে নেংটি ইঁদুরের দলকে খবর দিয়ে চকার বাকি হাঁসেরা ফিরে এল। ঠিক

সেই সময় গণেশের ঢোলকে রিদয় চাঁটি বসালে—ধিক-ধিক-ধিক ধাঁকুড়-ধাঁকুড়।

ঢোলের শব্দে চুয়োর দল লেজ উঁচু করে শিউরে উঠে যে যেখানে ছিল থির হয়ে দাঁড়িয়ে গেল, তারপর তালে-তালে লেজ দোলাতে-দোলাতে দলে-দলে সিঁড়ি বেয়ে উঠতে আরম্ভ করলে। চুয়োতে-চুয়োতে কেল্লার প্রকাণ্ড ছাত ভরে গেল, রিদয় চুড়োয় বসে ঢোল বাজাচ্ছে—

চুয়ো, হাততালি দুয়ো
নেংটি থিং নিগিরি টিং
ধাতিং তিং নাতিং থিং
চুয়ো, হাততালি দুয়ো।

আর সব চুয়ো লেজে-লেজ জড়াজড়ি করে নৃত্য করছে, পেঁচা পালক ফাঁপিয়ে, বেরাল লেজ ফুলিয়ে, হাড়গিলে গলার খলি দুলিয়ে সঙ্গে-সঙ্গে তাল দিচ্ছে! সব চুয়ো যখন ছাতে এসে জড়ো হল, তখন রিদয় চকার পিঠে চড়ে ঢোল বাজাতে-বাজাতে আকাশে উড়তে আরম্ভ করলে, চুয়োগুলো নাচতে-নাচতে লাফাতে থাকল। আনন্দে তারা মনে করলে যেন সবার ডানা গজিয়েচে, তারা প্রথমে ছাতের পাঁচিল, তারপর ছাতের আলসে, শেষে একেবারে আকাশে বাষ্প দিয়ে ডিগবাজি খেতে-খেতে মাটিতে এসে পড়ে জোড়া-জোড়া হাঁ করে আকাশের পানে চার পা তুলে চেয়ে রইল।

চুয়োগুলো নাটবাড়ির লীলাখেলা সাঙ্গ করে সরে পড়েছে অনেকক্ষণ। হাড়গিলে, বেরাল, পেঁচা পর্যন্ত ঢোলের আওয়াজে এমনি মশগুল হয়ে গেছে যে পায়-পায়ে কখন সবাই একেবারে ছাতের প্রায় কিনারায় এসে পড়েছে টেরই পায়নি, হঠাৎ রাত একটার ঘন্টা পড়ল অমনি রিদয় ঢোল বন্ধ করলে, সবাই চটকা ভেঙে দেখলে কেল্লা খালি, আকাশে অমাবস্যার চাঁদ দেখা দিয়েছে, চুয়ো আর একটাও নেই। রিদয়কে নিয়ে চকা উড়ে চলেছে। হাড়গিলে, পেঁচা চটকা ভেঙেই দেখলে বেরাল আলসে থেকে আকাশে একটা পা বাড়িয়ে চুয়োদের মতো ঝাঁপ দিয়ে গড়িয়ে পড়ে আর কি! হাড়গিলে তার লেজ ধরে এক টান দিয়ে বললে—“কর কী, পড়ে মরবে যে!”

বেরাল ফ্যালফ্যাল করে খানিক চেয়ে থেকে—“ইকি”—বলেই ফ্যাঁচ করে হেঁচে আন্তে-আন্তে পেছিয়ে এল।

ওদিকে নেংটির দল আন্তে-আন্তে কেল্লায় এসে যে যার ঘরে ঢুকে ধান ভানতে বসে গেল। চুয়ো তাড়াবার জন্যে হেড়ম্ব-গণেশের ঢোলককে ছাড়া আর কাউকে যে ধন্যবাদ দেওয়া দরকার সেটা তাদের মনেই এল না!

রাতের মধ্যে পেঁচার দল প্রায় বারোআনা মরা চুয়ো খেয়ে সাফ করে দিলে, বাকি যা রইল সেগুলোর উপরে সকালবেলায় কাক চিল এসে পড়ল। বেলা আটটার মধ্যে সব সাঙ্গ হয়ে গেল।

আজ অমাবস্যা তিথি, রাত্রিরটা হিমালয়ের এপারটায় কাটিয়ে কাল থেকে হাঁসেরা পাহাড়ের ওপারে নিজের-নিজের দেশের দিকে রওনা হবে, দেশের কথা ছাড়া আজ আর কারুর মুখে অন্য কথা নেই। আকাশে মেঘ করেছে, বিষ্টি নেই, কেবল ঠাণ্ডা

হাওয়া আর শীতালু বাতাস। মাথার উপর দিয়ে দলে-দলে পাখি হু-হু করে উত্তরমুখো চলেছে—সবাই দেশে যেতে ব্যস্ত, তার ওপর এ-বছর পাখিদের বারোয়ারি পড়েছে। কুঁচেক কুঁচিক তারা বারোয়ারির নেমন্তন্ন করতে বেরিয়েছে, যার সঙ্গে দেখা হচ্ছে চোঁচিয়ে জানাচ্ছে পুন্নিমার দিনে বারোয়ারিতে যেতে হবে, ভারি জলসা।

চকা নিমন্ত্রণ পেয়ে ভারি খুশি, রিদয়কে বললে—“তোমাদের দুজনের কপাল ভালো, বারো বছর অন্তর কৈলাস-পর্বতের ধারে মানস-সরোবরে এই বারোয়ারির মজলিস হয়, সেখানে সারসের নাচ, হরিণ-দৌড়, আর্গিন-পাখির কনসার্ট, গাঙ-শালিকের গীত, ছুঁচোর কেতন, শেয়ালের যুক্তি, মেড়ার লড়াই, তালুক-নাচ, সাপ-বাজি, মাছের চান, এমনি আরো কত কী হবে তার ঠিকানা নেই! ব্রহ্মার হাঁস কর্মকর্তা, স্বয়ং পশুপতি হবেন সভাপতি, পৃথিবীর পশুপক্ষী সেখানে হাজির হবে। মানুষের কপালে এমন আশ্চর্য কারখানা দেখা এ-পর্যন্ত ঘটেনি, কোথায় লাগে তোমাদের হরিদ্বারের কুম্ভমেলা! আর পাহাড়ের ওধারে আমাদের দেশটা কী চমৎকার তোমায় কী বলব, পালতি জলা—যেটা ব্রহ্মার হাঁস আর পৃথিবীর জলচর পাখি, কি পোষা কি বুনো সবাইকার আড্ডা, সেটা যে কত বড় তা কেউ জানে না, উত্তরের সমস্ত নদী সমস্ত পাহাড় এসে সেইখানেই শেষ হয়ে আবার সব নতুন-নতুন নাম নিয়ে দক্ষিণদিকে নেমে এসেছে। এই পালতির উত্তর গায়ে ঢোলা পর্বত, সেই ঢোলা পর্বতের ওপারে পাঁচিলে ঘেরা চীন মুল্লুক, তারো ওধারে বরফের দেশের ধারে ‘তন্ত্রা’ বলে একটা দেশ। বছরে প্রায় দশ মাস সেখানে বরফের চাদর মুড়ি দিয়ে ফুল পাতা নদ নদী সবাই ঘুমিয়ে থাকে, কেবল বসন্তের মাস দুই সেখানে সূর্য দেখা দেন, আর অমনি সারাদেশ ফুলে-ফলে পাতায়-ঘাসে দেখতে দেখতে সবুজ হয়ে ওঠে, আর আমরা সব পাখিরা মিলে সেখানে গিয়ে বাসা বেঁধে ডিমে তা দিয়ে বাচ্চা ফুটিয়ে চলে আসি। বসন্তের শেষে পালতি জলায় বাচ্ছারা বড় হবার জন্যে আপনারাই উড়ে আসে, আমরা সারা বছর দেশে-বিদেশে ঘুরে আবার বছরের এই সময়টিতে গিয়ে দেখি আমাদের ছেলে-পিলেরা কেউ বড় হয়েছে, কেউ বড় হয়ে নিজের পথ দেখে নিতে বিদেশে চলেছে, কোনো-কোনো বাচ্ছা বা মরে গেছে, কেউ কেউ বা এরি মধ্যে বিয়ে থাওয়া করে ঘরকন্যা পাতবার চেষ্টায় আছে, কোনো বাচ্ছা বা সন্ন্যাসী হয়ে দেশ ছেড়ে বেরিয়ে গেছে, কাউকে ধরে মানুষ খেয়ে ফেলেছে, কাউকে মানুষে গুলি করে মেরে ফেলেছে, আর কাউকে বা তারা জেলখানার মতো খাঁচার ভরেছে, আর কাউকে বা ডানা কেটে পোষ মানিয়ে ছেড়ে দিয়েছে। বছরের এই সময়টিতে আমরা একবার করে নিজেদের জন্মস্থানে আর পুরোনো বাসায় ফিরে আসতে পাই, নিজের ছেলেমেয়ের দেখা পাই, সুখ-দুঃখের দুটো কথা কয়ে নিই, তারপর আবার চলি এদেশ-সেদেশ করে।”

রিদয় বলে উঠল—“আমারও তো দেশ আছে কিন্তু আমার তো সেখানে ফিরতে একটুও ইচ্ছে হয় না।”

চকা বললে—“সে কী! তোমার বাপ-মা কেউ নেই নাকি? যখন বড় হবে, বৌ হবে সংসার হবে, ছেলে-পুলে নাতি-পুতি হবে তখন বুঝবে সারা বছরের পরে দেশে ফিরতে কী আনন্দ। তখন দেশের ডাক যখন এসে পৌছবে দেখবে মন অমনি উধাও

হয়ে ছুটেছে আর কিছুতে মন বসছে না, প্রাণ নীল আকাশে প্রজাপতির মতো সোনার পাখনা মেলে দিয়ে উড়ে দিন নেই রাত নেই, কি সকাল কি সন্ধ্যা কেবল বঁধুর মুখ মধুর হাসিই মনে জাগবে তখন।”

চকার কথা শুনতে শুনতে রিদয় কেমন আনমনা হয়ে গেল। সারাদিন ধরে আজ তার কেবলি মনে পড়তে লাগল—আমতলির সেই ঘর ক’খানি, সেই তেঁতুলতলার ঘাট, তেপান্তর মাঠ, হাঁসপুকুরের কাদা জল, তাতে শালুক ফুল, বাড়ির ধারে কুমকোলতার মাচা তার উপরে দুগুণা টুনটুনি পাখিটি, উঠোনের কোণে তুলসীমঞ্চটি, কালো মাটি-লেপা ঘরের দেওয়াল তার উপরে মায়ের হাতে লেখা লক্ষ্মীপূজার আলপনা, দড়ির আলনায় বাপের কোঁচানো চাদর, পুরোনো শোবার তক্তা তার উপর শীতলপাটি আর লাল ঝালর দেওয়া তালপাতার পাখাখানি। সব আজ পরিষ্কার যেন রিদয় চোখে দেখতে লাগল, আর থেকে-থেকে মন তার ঘরে যেতে আকুলি-বিকুলি করতে থাকল—সকাল কেটে দুপুর হয়েছে, তখনো রিদয় আকাশের দিকে চেয়ে ঘরের কথা ভাবছে—দলে-দলে কত পাখির ঝাঁক দেশমুখে চলে গেল—“চল-চল-চলরে চল” বলতে-বলতে। নাটবাড়ির জলায় যত পাখি—

কাদাখোঁচা জলপিপি কামি কোড়া কঙ্ক
পালতির কুঁচেক আর মৎস্য বঙ্ক।
ডাছকা ডাছকি আর খঞ্জনী খঞ্জন
সারস সারসী যত বক বকীগণ।
তিস্তিরী তিস্তিরা পানিকাক পানিকাকি
কুরবী কুরল চক্রবাক চক্রবাকি।

সবাই দলে-দলে দেশমুখে উড়ে পড়ছে! রিদয় দেখলে মাথার ওপর দিয়ে কত পাখির ঝাঁক দেশ-বিদেশ থেকে, কেউ বন ছেড়ে, কেউ খাঁচা ভেঙে হু-হু করে দেশে চলেছে—

ময়না শালিক টিয়া তোতা কাকাতুয়া
চাতক চকোর নুরী তুরী রাস্তুয়া।
ময়ূর ময়ূরী সারিস্তক আদি খগ
কোকিল কোকিলা আদি মরাল বিহগ।
সীকরী বহরী বাসা বাজ তুরমুতী
কাহা-কুহি লগড় ঝগড় জোড়া ধুতি।
শকুনী গুধিনী হাড়গিলা মেটেচিল
শঙ্খচিল নীলকণ্ঠ শ্বেত রক্ত নীল।
ঠেটি ভেটি ভাটা হরিতাল গুড়-গুড়—
বাকচা হারিত পারাবৎ পাকরাল
হাতারিয়া করকটে ফিঙ্গা দহিয়াল।

চড়ুই মুনিয়া পাবদুয়া টুনটুনি বুলবুলি ফুলঝুটি ভিংরাজ রঙে-রঙে সবুজে-লালে সোনালিতে-রূপোলিতে আকাশ রাঙিয়ে চলেছে যে যার দেশে বাতাসে ডানা ছড়িয়ে। রিদয় কেবলি বসে-বসে দেখতে লাগল আর মনে-মনে বলতে লাগল—“যদি ডানা পেতুম!”

পাখিদের দেখাদেখি ভীমরুল ডাঁশ-মশা দলে-দলে উড়তে আরম্ভ করেছে, চকার দলের হাঁসেরা আর থির থাকতে পারছে না, এখনো সারারাত এখানে কাটাতে হবে ভেবে তারা কেবলি উসু-খুসু করছে আর ডানা ঝাড়া দিচ্ছে!

চকা একবার রিদয়ের কানের কাছে বলে গেল, যা-কিছু নেবার আছে সঙ্গে, এইবেলা বেঁধে-ছেঁদে রাখো, কাল ভোরেই রওনা হতে হবে। রিদয়ের দেশের জন্য মনটা আনচান করছে কিন্তু বেড়াবার শখ এখনো মেটেনি। সে পথের মাঝে নিজের আর খোঁড়ার জন্যে গোটাকতক গুগলি টোপাপানা এটা ওটা সেটা নিয়ে উলুখড়ের একটি গাঁজে বুনতে বসে গেল।

থলেটা তৈরি হতে প্রায় সন্ধ্যা হয়ে এল। হাঁসেরা তাড়াতাড়ি খেয়ে নিয়ে চোখ বুজে রাতটা কোনোরকমে কাটিয়ে দেবার যোগাড় করছে এমন সময় চকা এসে রিদয়কে শুধাল—“খোঁড়াকে দেখেছ কি? তাকে খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে না।”

রিদয় তাড়াতাড়ি থলে ফেলে উঠে দাঁড়িয়ে বললে—“সে কী, গেল কোথায়, শেয়ালে নিলে না তো?”

চকা শুকনোমুখে বললে—“এই তো এখানে একটু আগেই ছিল, হঠাৎ গেল কোথা!” রিদয় বিষম ভয় পেয়ে এদিক-ওদিক ছুটোছুটি খোঁজাখুঁজি করতে লাগল। একে সন্ধ্যা হয়ে গেল, যেখানে পাখির ডাক শোনে সেইদিকেই রিদয় ছুটে যায়, ঝোপঝাড় নেড়ে দেখে, নাম ধরে ডাক দেয়, এমনি সারারাত রিদয় ছুটোছুটি করতে লাগল অন্ধকারে জল কাদা ভেঙে! নাটবাড়ির উঠোনটা পর্যন্ত রিদয় খুঁজে এল, কিন্তু সুবচনীরা খোঁড়া-হাঁস কোথাও নেই!

এদিকে সকাল হয়ে এল, চকা বললে—“সে নিশ্চয়ই অন্য দলে মিশে এগিয়ে গেছে, আর মিছে খোঁজা, চলো আমরা বেরিয়ে পড়ি, সময় উত্তরে যাচ্ছে!”

রিদয় ঘাড় নেড়ে বললে—“তাকে না নিয়ে আমি এখান থেকে নড়ছি নে, তোমরা যেতে চাও যাও।”

চকা মুশকিলে পড়ল! রিদয় নড়তে চায় না, এদিকে সব হাঁসেরই দেশে যাবার টান রয়েছে, তবু খোঁড়ার জন্যে চকা আরো এক ঘন্টা দেরি করলে, তাতেও যখন খোঁড়ার সন্ধান পাওয়া গেল না তখন তারা রিদয়কে একলা রেখে চট করে দেশ থেকে ঘুরে আসবার জন্যে উত্তরমুখে উড়ে পড়ল—আসি-আসি বলতে-বলতে।

চকার দল চলে যেতে রিদয়ের চারদিক যেন শূন্য বোধ হতে লাগল! সে আশ্তে-আশ্তে নাটবাড়ির ভাঙা পাঁচিলটা আর একবার সন্ধান করতে চলেছে, এমন সময় দূর থেকে দেখলে খোঁড়া কিরাশ-কলমীর ডাঁটা মুখে নিয়ে খোঁড়াতে-খোঁড়াতে পাঁচিলের গায়ে একরাশ ভাঙাচোরা পাথরের মধ্যে গিয়ে সঁধোলে। এমনি খোঁড়াকে শেওলাগুলি নিয়ে সেখানটায় আনাগোনা করতে দেখে রিদয়ও লুকিয়ে-লুকিয়ে পাঁচিলে উঠে দেখলে—জড়োকরা পাথরের মধ্যে চমৎকার ছাইরঙের একটি বালিহাঁস শুয়ে আছে, খোঁড়া তার মুখে খাবার তুলে-তুলে দিচ্ছে আর দুজনে কথা হচ্ছে—“আজ কেমন আছ? তেমনিই? ডানার ব্যথাটা যায়নি?”

“না, এখনো নাড়তে গেলে বুকটায় বেদনা করে।”

“মানুষগুলো কী নিষ্ঠুর! ভাগ্যি গুলিটা বুকে লাগেনি।”

“লাগলে আর কী হত, নাহয় মরে যেতুম!”

“ছি-ছি অমন কথা বোলো না, আমার ভারি দুঃখ হয়।”

“আমি তোমার কে যে আমার জন্যে দুঃখ হবে; আজ এই দেখা শোনা এত ভাব এত যত্ন, কাল হয়তো তুমি চলে যাবে, দুদিন পরে মনেও থাকবে না, কে বালি কোথাকার বালি!”

খোঁড়া ঘাড় নেড়ে বললে—“অমন কথা বোলো না, যতদিন বাঁচব তোমায় ভুলব না, জলার মধ্যে এই দিনটি মনে থাকবে!”

বালিহাঁস একটু ঘাড় হেলিয়ে খোঁড়ার গা ঘেষে বললে—“আমি দলছাড়া হয়ে পড়লুম, কতদিনে সারব তার ঠিক নেই!”

খোঁড়া বুক ফুলিয়ে বললে—“ভয় কী আমি তোমার কাছে রইলুম, এখন একটু ঘুমোও, আমি একবার ঘুরে আসি।”

খোঁড়া চলে গেলে রিদয় আস্তে-আস্তে গর্তের মধ্যে ঢুকে দেখলে এমন সুন্দরী হাঁস সে কোনোদিন দেখেনি, এতটুকু তার মুখটি, পালকগুলি নরম যেন তুলো, সাটিনের মতো ঝকঝক করছে, চোখদুটিও কাজলটানা যেন ঢলঢল করছে! রিদয়কে হঠাৎ দেখে বালিহাঁস ভয় পেয়ে পালাবার চেষ্টা করতে লাগল কিন্তু বেচারার ডানায় বেদনা, উড়তে পারে না, বালি চর্চা করে কাঁদতে লাগল।

রিদয় তাড়াতাড়ি বললে—“আমি হংপাল হাঁসদের বন্ধু, খোঁড়া-হাঁসের সেঙাত, আমায় দেখে ভয় কী?”

বালিহাঁস রিদয়ের কথায় সাহস পেয়ে ঘাড়টি একটু নিচু করে বললে—“তার মুখে আপনার নাম শুনেছি, আপনি অতি মহাশয় লোক।” এমনভাবে এই কথাগুলি বালি বললে যে, রিদয়ের মনে হল কোনো রাজকন্যে যেন তার সঙ্গে আলাপ করছেন!

রিদয় বললে—“দেখি, আপনার কোথায় হাড়টা ভেঙেছে সোজা করে দিই।” আস্তে-আস্তে বালিহাঁসের ডানার তলায় হাত দিয়ে রিদয় মচকানো হাড়টা ধরে খুঁট করে যেমন সরিয়ে দেওয়া অমনি বালিহাঁসটি “মাগো!” বলে অজ্ঞান হয়ে পড়ল।

রিদয় কখনো ডাক্তারি করেনি, পাখিটা মরে গেল ভেবে সে তাড়াতাড়ি পাছে খোঁড়া এসে দেখে সেই ভয়ে লফ দিয়ে চোঁচা চম্পট। খোঁড়া বেশি দূর যায়নি, দু-দোক জল খেয়েই ফিরে আসছে, পথের মধ্যে রিদয়ের সঙ্গে দেখা! রিদয় তাড়াতাড়ি খোঁড়াকে বললে—“কোথায় ছিলে সবাই যে চলে গেল, সারারাত তোমাকে খোঁজাখুঁজি করেছি, চলো আর দেরি নয়, এই বেলা গিয়ে তাদের ধরি, বেশি দূরে এখনো যায়নি!”

খোঁড়া আমতা-আমতা করে বললে—“রোসো, এখনি যেতে হবে? এত শিগুরি কি না-গেলেই নয়?”

রিদয়ের ভয় হল পাছে খোঁড়া গিয়ে দেখে বালিহাঁস মরে গেছে। সে তাড়াতাড়ি খোঁড়ার পিঠে চেপে তাকে ওড়াবার চেষ্টা করতে লাগল।

খোঁড়া ঘাড় নেড়ে বললে—“দ্যাখো ভাই আমার এক বন্ধু বড় বিপদে পড়েছে, তাকে একলা ছেড়ে যাওয়া তো হতে পারে না, বেচারার ডানাটি জখম হয়েছে নড়তে

পারে না, আমি গেলে তাকে কেবা খাওয়ায় আর কেই বা যত্ন করে!”

রিদয়ের ইচ্ছে হাঁস সেদিকে না যায়, সে কেবলি তাকে ফেরাতে চেষ্টা করতে লাগল, কিন্তু খোঁড়ার মন পড়ে আছে সেই রূপকথার রাজকন্যার মতো সুন্দরী বালিহাঁসের দিকে, সে রিদয়কে নিয়ে একবার উত্তরমুখে উড়ল, কিন্তু খানিক পথ গিয়েই বলল—“ভাই, বড় মন কেমন করছে, মানস-সরোবর না গিয়ে, এই নাটবাড়ির চালায় দু-চারদিন কাটিয়ে চलो বাড়ি মুখে হওয়া যাক, দেশে যাবার জন্যে মন টেনেছে আর ঘুরে বেড়াতে ভালো লাগছে না।”

রিদয়েরও মনটা সকাল থেকে দেশের দিকেই টানছিল, সে কোনো কথা কইলে না। খোঁড়া-হাঁস আস্তে-আস্তে উড়ে এসে আবার নাটবাড়ির ধারে নামল ঠিক বেছে-বেছে সেই খানটিতে, যেখানে তার বালিহাঁস রয়েছে। খোঁড়া রিদয়কে পিঠ থেকে নামিয়ে গলা উঁচু করে দুবার ডাক দিলে—“বালি ও বালি!” কোনো উত্তর এল না, তারপরে ছুটে গিয়ে দেখলে পাথরের মধ্যে শুকনো ঘাস পাতা বিছানো তাদের দুদিনের বাসাটি খালি হা-হা করছে, কেউ কোথাও নেই। রিদয় চূপ করে রইল, ভাঙা গালায় খোঁড়া-হাঁস আবার ডাক দিলে—“বালি, কোথায় বালি!”

রিদয় ভাবছে নিশ্চয় শেয়াল এসে মরা হাঁসটা টেনে নিয়ে গেছে, ঠিক সেই সময় জলার ধারে বেনা-বনের সবুজ পাতাগুলো নড়ে উঠল, তার পরেই মিঠেসুরে—“এই যে আমি, একটু গা ধুয়ে নিচ্ছি” বলে বালি আস্তে-আস্তে জলা থেকে উঠে এল! তার বকঝকে পালকে শিশিরের মতো জলের ফোঁটাগুলি আলো পেয়ে হীরের মতো বকঝক করছে, রিদয়ের মনে হল যেন জলদেবী জল থেকে উঠে এলেন।

খোঁড়া হেলতে-দুলতে বালির কাছে গিয়ে আস্তে-আস্তে তার গলা চুলকে দিয়ে বললে—“বেদনা আছে কি?” বালি ঘাড় নেড়ে বললে—“একটুও না, তোমার বন্ধুর কুপায় আর তোমার যত্নে আমি ভালো হয়ে গেছি।” তারপর দুজনে জলে গিয়ে সাঁতার আরম্ভ করলে, রিদয় জলের ধারে বসে একটা বেনার শিষ চিবাতে থাকল।

বালিহাঁসকে সঙ্গে নিয়ে খোঁড়া এর মধ্যে একদিন চুপিচুপি পদ্মবনে পদ্মফুলের সোনালি রেণু এ-ওর গায়ে ছড়িয়ে দিয়ে নিজেরাই নিজেদের গায়ে হলুদ মেখে, মাছরাঙা পাখিদের বৌ-ভাতে মাছ খাইয়ে, বিয়ে-থাওয়া খাওয়া-দাওয়া চুকিয়ে জলার ধারে বাসা বাঁধবার যোগাড়ে আছে, দেশে ফেরার কথা বিদেশে উড়ে চলার আর নামটি করে না। রিদয় শুধোলে বলে—“আমরা দুটিতে যেখানে থাকি সেইখানেই আমাদের দেশ।”

রিদয় বলে—“আমার তো দেশ আছে, আমাকে তো সেখানে যেতে হবে, বিয়ে-থাওয়াও করতে হবে। এই জলার মধ্যে না পাওয়া যায় ভালো খাবার, না আছে ভালো শোবার জায়গা, এখানে বাসা বাঁধলে তো আমার চলবে না।”

বালিহাঁস বললে—“তা বেশ তো, এই জলার ওপারেই একটা গয়লাপাড়া আছে, চলুন আপনাকে তাদের গোয়ালে রেখে আসি। একটি বুড়ি গাই তাদের আছে এক ছটাক করে দুধ দেয়, দুধ ভাত সবই সেখানে পাবেন।”

রিদয় শুধোলে—“আর তোমরা?”

বালিহাঁস লজ্জায় মুখটি নিচু করে রইল। খোঁড়া চুপিচুপি রিদয়ের কানে-কানে

বললে—“ভাই, ওর ডিম পাড়বার সময় হয়েছে, দুটো মাস অপেক্ষা করো, তার পরে সবাই একসঙ্গে বাড়ি ফেরা যাবে, এই কটা দিন তুমি কোনোরকমে গৌহাটিতে কাটাও।”

হাঁসের বাচ্চা হবে শুনে রিদয় ভারি খুশি, সে একখানা শালপাতার নৌকোতে ভর দিয়ে গয়লাপাড়ার ঘাটে গিয়ে উঠল। গয়লাপাড়া নামেই পাড়া, একঘর বই গয়লা নেই, তাও আবার গয়লা-বুড়ো অনেককাল হল মরেছে, আছে কেবল এক বুড়ি গাই আর এক বুড়ি গয়লানী!

গয়লাবাড়ির উঠোনে ঢুকে রিদয় এদিক-ওদিক চাইতে লাগল, ঘুটঘুটে আঁধার রাতটা, বাড়ির কোথাও একটি আলো নেই, কোনদিকে গোয়াল কোনদিকে টেকিশাল কোথায় বা হেঁসেল কিছুই দেখবার যো নেই, একটা কেবল বেলগাছ ভূতের মতো ঐকেবেঁকে টেরা-বাঁকা মোচড়ানো দোমড়ানো শুকনো ডাল নিয়ে উঠোনের মাঝে দাঁড়িয়ে আছে, আর তার উপরে বসে একটা কালো পেঁচা কেবলি চঁচাচ্ছে—“যো-মৈ-র বাড়ি যাঃ, মাথা খাঃ!”

ঝড় উঠল, তার সঙ্গে টিপটিপ বিষ্টি নামল, আরো দুটি পথিক নেউল আর খটাস তাড়াতাড়ি উঠোনে ঢুকে এদিক-ওদিক চাইতে চাইতে রিদয়কে দেখে শুধোলে—“এটা কি গৌহাটির চটি, রাতে থাকবার ঘর পাওয়া যাবে কি এখানে?”

রিদয় বললে—“আমি তো গয়লাবাড়ি বলে এখানে ঢুকেছি কিন্তু অন্ধকারে কিছুই দেখছি নে। এটা গোয়াল কি চটি কি ধর্মশালা বা পাঠশালা কিছুই বোঝা যাচ্ছে না, কারু সাড়াশব্দ পাচ্ছি নে, কেবল একটা পেঁচা ডাকছিল একটু আগেই শুনেছি।”

খটাস বললে—“তবে নিশ্চয় এটা গঙ্গাযাত্রীর ঘর!”

নেউল বলে উঠল—“মাঠের মধ্যে কখনো মড়া-পোড়ার ঘাট হয়? বাড়িই বটে, তবে এটা কলুর বাড়ি কি গয়লাবাড়ি কিম্বা পুলিশের খাদাবাড়ি তা বোঝা যাচ্ছে না!”

খটাস বললে—“সেটা বোঝবার সহজ উপায় আছে।”

রিদয় শুধোলে—“কোনো বাড়ি সহজে চিনবার উপায় কী প্রকাশ করো।”

খটাস খানিক ভেবে বললে—“মানুষেরা নানা কাজের জন্যে নানারকম বাড়ি-ঘর বাঁধে তা তো জানে—উত্তরমুখো, দক্ষিণমুখো, পূর্বমুখো, পশ্চিমমুখো। গয়লা বাঁধবে একরকম, তেলি বাঁধবে অন্যরকম, মালী বাঁধবে একরকম, কুমোর বাঁধবে একরকম। আট বোঝো না? কে কীরকম বাঁধবে তার হিসাবটা জানলেই কোনটা কী বাড়ি বোঝা যাবে।”

নেউল বললে—“হিসেবটা কেমন শুনি?”

‘শোনো তবে, প্রথমে মালীর বাড়ি কেমন তা বলি শোনো,’ বলে খটাস খনার বচন আরম্ভ করলে :

চৌদিকে প্রাচীর উচা কাছে নাই গলি কুচা

পুষ্প বনে ঢাকে রবি শশি

নানা জাতি ফোটে ফুল উড়ে বৈসে অলি কুল

কোকিল কুহুরে দিবা নিশি।

মন্দ মন্দ সমীরণ বহে সেথা অনুক্ষণ

বসন্ত না ছাড়ে এক তিল!

রিদয় বলে উঠল—“এখানে তো ফুলের গন্ধ মোটেই পাচ্ছিনে! তবে এটা মালীর ঘর নয়।”

“আচ্ছা, গন্ধে-গন্ধে বোঝো এটা তেলির বাড়ি কি না”, বলেই খটাস আবার শুরু করলে :

সরষের ঝাঁঝে তেলি হাঁচে ফেঁচ-ফেঁচ
বলদেতে ঘানি টানে ঘোঁচ-ঘোঁচ ভেঁচ।

নেউল বাতাসে নাক উঁচিয়ে বললে—“কই হাঁচি তো পাচ্ছে না! তবে এটা তেলির বাড়ি নয়, মালীর বাড়িও নয়।”

“কুমোর বাড়ি কি না দ্যাখো তো,” বলে খটাস শোলক আওড়ালে :

হাঁড়ি পাতিল ঠুকুর ঠাকুর কলসীর কাঁধা
পাতখোলার সোঁদা গন্ধ কুমোর বাড়ি বাঁধা।

রিদয় এদিক-ওদিক নাক ঘুরিয়ে বললে—“নাঃ, কোনো গন্ধই পাচ্ছিনে!”

“আচ্ছা দ্যাখো দেখি গয়লাবাড়ি কি না” :

গোয়াল ঘরে দিচ্ছে হামা নেহাল বাছুর
ঘোল মউনি বলছে ঘরে গাবুর গুবুর
ভালো দুধ টোকো দই দিচ্ছে সেথা বাস
মোষ দিচ্ছে নাক ঝাড়া গরু চিবায় ঘাস।

রিদয় পুবদিকে নাক তুলে বললে—“এসব কিছুই নেই এখানে।”

নেউল পশ্চিমদিকে শুঁকে-শুঁকে বললে—“যেন ভিজ়ে ঘাসের গন্ধ পাচ্ছি।”

খটাস উত্তর-দক্ষিণ পূর্ব-পশ্চিম চারদিকে কান পেতে নাক ঘুরিয়ে বললে—“এটা গয়লাবাড়ি বটে, কিন্তু তেমন গোঁড়া গয়লা নয়, শব্দ আর গন্ধগুলো কেমন ফিকে-ফিকে ঠেকছে, বিচিলি আছে, ঘাসও কিছু আছে, গরুও একটা যেন আছে বোধ হচ্ছে।”

ঠিক সেই সময় বুদিগাই “ওমঃ” বলে একবার ডাক দিলে! তিন পথিক তাড়াতাড়ি সেই দিকে গিয়ে দেখলে—কত কালের পুরোনো চালাখানা তার ঠিক নেই, বিষ্টির জলে মাটির দেওয়াল গলে গিয়ে বুড়ো মানুষের পাঁজরের হাড়গুলোর মতো ভিতরের চাঁচ আর খোঁটাখুঁটি বেরিয়ে পড়েছে, দরজার একটা ঝাঁপ খুলে মাটিতে শুয়ে পড়েছে, আর একটা পচা দড়ি ধরে পড়ো-পড়ো হয়ে এখনো ঝুলে রয়েছে! চালের খড় এখানে-ওখানে উড়ে গিয়ে ভিতর থেকে ঘুণ-ধরা বাঁশের আড়া দু-চারটে ফোগলা দাঁতের মতো দেখা যাচ্ছে!

তিন পথিকের পায়ের শব্দ পেয়ে গোয়ালের মধ্যে থেকে বুদি ভাবলে গয়লাবুড়ি তার জাব নিয়ে এল—সে দরজা থেকে মুখটা বাড়িয়ে এদিক-ওদিক দেখে বললে—“মাগোঃ মাঃ, রাত হল আজ কি খেতে দিবিনে!”

খটাস, রিদয় আর নেউল বুদির কথার উত্তর দিলে—“তিন পথিক মোরা, রাতের মতো জায়গা মিলবে কি?”

বুদি মাথা হেলিয়ে কেবলি শুধাতে লাগল—“কেগাঃ কে?”

রিদয় বললে—“আমি আমতলির তাঁতির পুত্রর শাপভ্রষ্ট বুড়ো-আংলা দেশভ্রমণে বেরিয়েছি।”

বুদি নেউলের দিকে শিং হেলিয়ে বললে—“ইনি?”

“নেউল পুত্রর ইনিও বেরিয়েছেন মৃগয়া করতে।”

খটাসের দিকে চোখ ফিরিয়ে বুদি রিদয়কে শুধালে—“আর ইনি কে?”

“ইনি হচ্ছেন খটাসের পুত্রর, দিগ্বিজয়ে বেরিয়েছেন।”

বুদি গোয়ালের দুয়োর ছেড়ে একপাশ হল, তিন বন্ধুতে বাদলার রাতে গোয়ালে আশ্রয় নিয়ে রাত কাটাবার যোগাড় করতে চলেছেন, বুদিগাই লেজ নেড়ে বললে—“আর জন্মো কত তপিস্যি করেছি, তাই কাঙালিনীর ঘরে রাজপুত্রর, পান্তরের পুত্রর আর কোটালের পুত্ররের পা পড়ল।” রিদয় খুশি হয়ে বুদির ঘাড়টা একটু চুলকে দিলে, তারপর খড়ের গাদায় শুয়ে তিন বন্ধুতে চোখ বুজলে।

এদিকে বুদিগাই সারাদিন জাব পায়নি, সে পেটের জ্বালায় কেবলি উসখুস করছে—“ওমঃ মাগোঃ, কোথায় গেলে আজ কি আর খাব না? ও ভাই রাজপুত্রর মাচানের উপর থেকে এক বোঝা খড় নামিয়ে দিতে পার, বড় খিদে লেগেছে!”

রিদয় দেখলে চালের বাতায় মস্ত এক বোঝা খড় চাপানো রয়েছে বটে, কিন্তু সেটা টেনে নামানো রিদয়ের সাধ্য নয়, একটা আঁটি কোনোরকমে টেনে রিদয় বুদির মুখের কাছে ধরে দিলে। গাই খড়গুলো মুখে নিয়ে জাবর কাটতে লাগল।

রিদয়ের একটু তন্দ্রা এসেছে, এমন সময় বুদি আবার বলে উঠল—“ওমা গো, ভাই পান্তরের পুত্রর একটুখানি জল এনে দিতে পার?”

নেইল ঘুমের ঘোরে বললে—“এত রাতে জল পাই কোথা!”

বুদি বিনয় করে বললে—“বাইরেই বিষ্টির জল জমা হয়েছে, উঃ বড় তেষ্ঠা, আমার গলার দড়িটা যদি খুলে দাও তো ওখানে গিয়ে একটু জল খেয়ে বঁচি!”

নেউল বুদির গলার দড়িটা দাঁতে কেটে দিয়ে বললে—“যাও তবে!”

বুদি দু-পা গিয়ে বললে—“ইস ভারি অন্ধকার, ভাই কোটালের পুত্রর!”

খটাস আধবোজা চেখ মেলে বললে—“কী?”

বুদি একে রাতকানা তাতে আবার কানে কালা হয়েছে, খটাস কী বললে—শুনতেই পেলো না। আবার ডাকলে—“ও ভাই কোটালের পুত্রর আমি রাতকানা, যদি গলার দড়িটি ধরে একটুখানি এগিয়ে দিয়ে এসো তো ভালো হয়!”

“ভালো বিপদেই পড়া গেল,” বলে খটাস দড়িটা ধরে বুদিগাইকে উঠানের মাঝে টেনে নিয়ে অন্ধকারে দাঁড় করিয়ে সরে পড়ল।

রাত তখন বারোটো, খড়ের গাদায় তিন বন্ধুতে আরামে নিদ্রা যাচ্ছে, এমন সময় বুদি গাই এসে সবার কানে-কানে বললে—“বড় বিপদ, বুড়িটা মরে গেছে!”

রিদয় তাড়াতাড়ি চোখ মুছে বললে—“সেকি! মরলো কেমন করে?”

বুদি নিশ্বাস ফেরে বললে—“দুঃখের কথা কইব কী, এই সন্ধেবেলা সে আমার গলাটি ধরে বলে গেল—‘বুদি শুনেছিস এই নাটবাড়ির জলায় রাজা এবার ধান

বোনবার হুকুম দিয়েছেন, এতকালে জমি সব আবাদ হবে; আমাদেরও দুঃখ ঘুচবে।’ আমি বললেম—‘মা, তোমার আর দুঃখ ঘুচবে কী, তোমার ছেলেপুলে ক’টাই বিদেশে গিয়ে সংসার ফেঁদে কাজ-কারবার করতে বসে গেল, বুড়ি মাকে তো তারা একটিবার মনেও করলে না!’ মা বললে—‘বুদি লো বুদি, তাদের দুঃখসনে, ঘরের ভাত পেলে কি তারা আমাকে একলা ফেলে বিদেশে যায়, না পরের চাকরি করে? এইবার তাদের চিঠি দেব দেখিস কেমন না তারা আসে! আমার মরবার সময় সব ছেলেরা এসে আমায় ঘিরে দাঁড়াবে আর আমি ডঙ্কা মেরে স্বর্গে চলে যাব এই সাধটি আমার কি পূর্ণ হবে বুদি!’ এই বলে মা ঘরের মধ্যে চিঠি লিখতে গেল, গোয়ালঘরে আর জাবও দিতে এল না, পিদুমও জ্বাললে না! সন্কেবেলা মাকে যেন কেমন-কেমন দেখনু, তাই বলি একবার যাই দেখে আসি। ওমা, ঘরে উঁকি দিয়ে দেখি যেখানকার যেটি সব তেমনি গোছানো রয়েছে—পিদুমটি জ্বলছে বিছানা পাতা রয়েছে কিন্তু মা আমার চিঠিটুকু হাতে নিয়ে আলুথালু হয়ে দরজার ধারে পড়ে রয়েছেন, ছেলেরা আসবে ছেলেরা আসবে করেই বুড়ি মলো গো।

“আহা! এই গয়লা বৌয়ের দশা কি এমন ছিল। এই বাড়িতে দেখেছি ছেলে-মেয়ে চাকর-বাকর গিসগিস করছে—ঐ নাটবাড়ির সমস্ত জলাটা ওদের জমিতে পড়েছে, আজ এখনো কত জমি যে বেখবর পড়ে আছে তার ঠিক নেই। কর্তা যতদিন ছিলেন যেমন বোলবোলা তেমনি লক্ষ্মীর ছিরি। আহা, ওই গয়লা-বৌ তখন দুবেলা সেজেগুজে পাঁচজন গয়লানী সঙ্গে গাই দোহাতে আসত, নূপুরের শব্দ শুনলে গাই-গরু সব চারদিক থেকে হামা দিয়ে ছুটে আসত গো। এমন লক্ষ্মী বৌ কচি-কাচা নিয়ে বিধবা হল গো! তখন এক-একদিন সে আমার গলা ধরে কানত আর বলত—‘বুদি, আর পারিনে যন্ত্রণা সহ্যে।’ আমি বলি, ‘মা এই শরীর তোমার, একা সবদিক দেখা কি তোমার কর্ম, দু-চারটে দাস-দাসী নায়েব-গোমস্তা বেশি রাখলে হয় না?’ কিন্তু সে বড় কমিষ্টি, নিজের হাতে ছেলে-মানুষ ধান-বোনা রান্না-করা গাই-দোয়া সব করবে! আমি বলি—‘মা, শরীর যে ক্ষয় হল!’ কিন্তু বৌ কেবলি বলে—‘ভালো দিন আসছে বুদি আসছে!’ আর ভালো দিন! ছেলেগুলো বড় হয়ে চাকরির চেষ্টায় বিভূঁয়ে বিদেশে টো-টো করে ঘুরতে লাগল, কেউ বিদেশ গিয়ে সংসার পাতলে, ছেলেপুলে হল কিন্তু বুড়িকে আর কেউ দেখলে না। জমি-জমা গহনা-গাঁটি বেচে ছেলে-মেয়ে নাতি-পুতি এমনি তিনপুরুষ ধরে সবাইকে বিয়ে দিয়ে চাকরি নিয়ে বিদেশে পাঠাতে-পাঠাতে বুড়ি ক্রমে সর্বস্বান্ত হয়ে না খেয়ে মরবার দাখিল হল! ছেলে-মেয়ে কত যে জন্মাল, মানুষ হল, বড় হয়ে বুড়িকে একলা রেখে চলে গেল, এই গয়লাবাড়িতে ক’পুরুষ ধরে কত কারখানাই দেখলুম যে, তা কী বলি!

“এদানি বুড়ি আর দুঃখ করত না, ছেলেদের কথা হলে বলত—‘বুদি এখানে এলে তাদের তো কষ্ট বই আরাম হবে না, তবে কেন আর তাদের ডেকে পাঠাই; এই তো ভাঙাবাড়ি, এখানে জায়গা কোথায় তাদের বসবার শোবার খাবার! ওই বাপ-মা-হারা আমার শিবরাত্রির সলতে ওই ছোট নাতিটি বেঁচে থাক, মরবার সময় তবু মুখে জল

দেবার একজন তো রইল—কী বলিস!’ কিন্তু এ-নাতিও বড় হয়ে যেদিন কুলির সর্দারি করতে বিদেশে গেল সেদিন থেকে বুড়ির আর চোখের জল থামল না। সে দিন-দিন কুঁজো হয়ে পড়ল, হাল-গরু জোত-জমা সমস্ত পাঁচ ভূতে লুঠে পালাল, বুড়ি দেখেও দেখলে না—শেষে এখানে আর কেউ রইল না—এই বুদি আর ওই বুড়ি ছাড়া। বুড়ি খেতে পায় না দেখে আমি একদিন বললুম—‘মাগো, কসায়ের কাছে আমাকে বেচলে তো পয়সা পাও, তা কর না কেন!’ বুড়ি আমার গলা ধরে বললে—‘বুদি সব ছেলে-মেয়ে তোর দুধ খেয়ে মানুষ হল তোকে আমি কি ছাড়তে পারি।’ অহা সেই আমার সেগাতনী মনিবনী, গিনি মা-জননী আজ নিজেই চলে গেল গোঃ, ওমা” —বলে সে অঝোরে কাঁদতে লাগল।

রিদয় অনেকক্ষণ চুপ করে থেকে বললে—“আহা বুদি, আমতলিতে মাকে আমি এমনি করে ফেলে এসেছি যে!”

বুদি বলে উঠল—“যাও কালই ফিরে যাও, না হলে হয়তো এই বুড়ির মতো ছেলে-ছেলে করে শেষে সেও মরবে। তোমার তো এখনো গিয়ে মাকে দেখবার সময় আছে কিন্তু এই বুড়ির ছেলেরা কি পোড়াকপাল নিয়েই জন্মেছিল, কখনো দেশে এল না, মা মরে গেল তাকেও দেখতে পেল না!”

সকালবেলায় মিউনিসিপালের মর্দোফ্রাসগুলো এসে বুড়িকে পোড়াতে নিয়ে গেল, খটাস চলে গেল দিঘিজয়ে, নেউল চলে গেল মুগয়াতে, রিদয় বুড়ির ঘর থেকে তার ছেলেদের নামের চিঠিখানি ডাকে ফেলে দিয়ে বুদিকে মাঠে রেখে খোঁড়ার কাছে ফিরে চলল। পাতিজলার কাছ বরাবর এসে বিদয় দেখলে খোঁড়া-হাঁস সকালে উঠে জলের মাঝে একটা মাটির টিপিতে দাঁড়িয়ে ডানা ঝাড়ছে, বালিহাঁস তখনো ঝোপের মধ্যে ঘুমিয়ে আছে। রিদয় সারারাত কিছু খায়নি, হাঁসের কাছে না গিয়ে সে বরাবর বুদিগাইটার পিছনে-পিছনে জঙ্গলে গিয়ে ঢুকল! দু-একটা পাতবাদামের চেষ্টায় রিদয় একটা শিরীষ গাছের উঁচুডালে কাঠবেড়ালিদের ঘরে ভিক্ষে করতে চলেছে। মস্ত শিরীষ গাছ, তার সব উপরের ডালে কাঠবেড়ালিদের খোপ বসতি, ঝোপ বসতি। এমনি এপাড়া-ওপাড়ায় রিদয় “জয়রাম” বলে গান গেয়ে দাঁড়াচ্ছে আর কেউ এসে তাকে দুটো শুকনো ছোলা, কেউ একটা বাদাম, এমনি টুকিটাকি ভিক্ষে দিচ্ছে। রামের দোহাই দিলে কাঠবেড়ালিদের ভিক্ষে দিতেই হয়, কিন্তু এক-এক কাঠবেড়ালি গিনি ভারি কিপটে, রিদয়কে দূর থেকে দেখেই বলছে—“ওগো ঘরে কিছু নেই, কর্তা হাটে গেছেন, ওবেলা এসো—এখন কিছু হবে না।” রিদয় পাকা ভিখিরি, সহজে ছাড়বে কেন, গান শুরু করলে :

বাসনা করায় মন পাই কুবেরের ধন
সদা করি বিতরণ তুমি যত আশ না
আস তাই আরো চাই ইন্দের ঐশ্বর্য পাই
ক্ষুধা মাত্র সুখা খাই মরি-মরি ফাঁস না
ফাঁসনা কেবল রৈল বাসনা পূরণ নৈল
লাভে হতে লাভ হৈল লোকে মিথ্যা ভাসনা!

কাঠবেরালি-গিনি এতেও সাড়া দেয় না, রিদয় এবারে হিন্দি গান ধরলে :

ধুম বড়া ধুম কিয়া খানে জোনে নাহি দিয়া

চহঁয়ার ঘেরলিয়া ফোজ কি গিতাপায়!

আরে চহঁয়ার, আরে চহঁয়ার।

এক থোকা শিরীষ-ফুলের তলায় দাঁড়িয়ে বুড়ো-আংলা পেট বাজিয়ে গাইছে, এমন সময় মনে হল তার কোমরের কাপড় ধরে কে টান দিচ্ছে, রিদয় ফিরে দেখতেই একটা কাক 'খাও' বলে তার ঠোঁট আর ডান হাতটা চেপে ধরলে, অমনি আর একটা কাক, তারপর আর একটা আর একটা এসে রিদয়কে ছোঁ দিয়ে উড়িয়ে নিয়ে চলল। ডোমকাকের দল রিদয়কে চোখে-মুখে কিছু দেখতে দিচ্ছে না—“যকা-যকা” বলে এর মুখ থেকে ও, তার মুখ থেকে সে, এমনি রিদয়কে ফুটবলের মতো ছুড়ে দিতে-দিতে দল বেঁধে গোলমাল করতে-করতে চলেছে দেখে বুদি গাই “ওমা-ওমা” করে চোঁচাতে-চোঁচাতে লেজ তুলে ছুটোছুটি করতে লাগল। ইচ্ছেটা কাকগুলোকে শিং দিয়ে গাঁতায়, কিন্তু তারা আকাশে সে-বেচারি মাটিতে—বুদি কেবল ধুলো উড়িয়ে মাঠে ছুটোছুটি করতে লাগল!

খোঁড়া-হাঁসও আকাশে কাক দেখে—“ক্যা-ক্যা” বলে একবার ডাক দিলে, কিন্তু দেখতে-দেখতে কাকের দল অদৃশ্য হয়ে গেল।

রিদয় চটকা ভেঙে যখন চেয়ে দেখলে, তখন কাকেরা পাতি-জলা পেরিয়ে নাটবাড়ি ছাড়িয়ে কাকচিরের দিকে চলেছে। হাঁসের পিঠে আরামে উড়ে চলা এক, আর কাকের ঠোঁটে ঝুলতে-ঝুলতে চলা অন্য একরকম। রিদয় দেখলে জলা-জমি যেন একখানা ফাটা-ফুটো গালচের উল্টো পিঠের মতো পায়ের তলায় বিছানো রয়েছে, সবুজ লাল কানো কত রকমের যেন সুয়োঁ-ওঠা পশমে বোনা, বাঙলাদেশের পরিষ্কার ছক-কাটা জমির মতো মোটেই নয়, জলগুলো দেখাচ্ছে যেন মাঝে-মাঝে ছোট বড় আয়না ভাঙা।

দেখতে-দেখতে সূর্যি উঠল, আলো পেয়ে মাটি যেন সোনা রূপো আর নানা রঙের উলে-বোনা কাশ্মীরি শালের মতো দেখাতে লাগল। তার পরে জলা পার হয়ে বন-জঙ্গল মাঠ-ঘাটের উপর দিয়ে কাকেরা রিদয়কে নিয়ে উড়ে চলল! কাকেরা তাকে ধরে নিয়ে কোথায় চলেছে, কোথা রইল খোঁড়া-হাঁস, কোথায় বা চকার দল, কোথা বুদি, কোথা বালি!

রিদয় ভয় পেয়ে চারদিক চাইছে এমন সময় ডোমকাক ডাক দিলে—“খবরদার!” অমনি সব কাক রিদয়কে নিয়ে জঙ্গলের তলায় নেমে পড়ল! চোরকাঁটার বনে রিদয়কে ঠেলে ফেলে গোটা পঞ্চাশেক কাক সঙিনের মতো ঠোঁট উঁচিয়ে তার চারদিকে পাহারা দিতে দাঁড়িয়ে গেল।

রিদয় গা ঝাড়া দিয়ে উঠে বললে—“তোরা যে আমাকে বড় ধরে আনলি!”

ডোমরাজা দৌড়ে এসে বললে—“চুপ, কথা কবি তো চোখ ঠুকরে নেব।”

রিদয় বুঝলে এবার সহজে ছাড়ান নেই, এরা সব ডাকাতে-পাখি। গোলযোগ

করলে হয়তো মাথাটাই ফাটিয়ে দেবে। সে কী করে, শুকনোমুখে কাকগুলোর দিকে চেয়ে রইল। কাকগুলোও তাকে ঘিরে ধারালো ঠোঁট বাড়িয়ে একচোখে তাগ করে দাঁড়িয়ে থাকল।

দূর থেকে দেখে রিদয় ভাবত কাকগুলো বেশ কালো চিকচিকে, যেন কালো আলপাকার চায়না-কোট-পরা নতুন উকিল কৌছিলের মতো, চালাক চতুর চটপটে। কিন্তু কাছ থেকে কাকগুলোকে রিদয় দেখলে কদাকার কালো কুচ্ছিত যতদূর হতে হয়, পালকগুলো রুখো মড়মড়ে যেন কালিতে ছুপোনো তালপাতা, পাগুলো গেঁটে-গেঁটে কাদামাখা খরখরে, ঠোঁটের কোণে এঁটো ঝোলঝাল মাখানো; একটা চোখ যেন ছানিপড়া আর একটা যেন ময়লা পয়সার মতো তামাটে কালো। কোথায় শাদা ধপধপে সুবচনীর্ হাঁস আর কোথায় এই কালো কুচ্ছিত কাগের ছা সব।

রিদয় এই কথা ভাবছে এমন সময় মাথার উপরে অনেক দূর থেকে হাঁসের ডাক এল—“কোথায়—কোথায়?” রিদয় গলা শুনে বুঝলে খোঁড়া তার সন্ধানে চলেছে, সেই সঙ্গে সঙ্গে বালিহাঁসও ডাকদিয়ে গেল “সেঙাত সেঙাত!” বনের ওধারটায় বুদিও একবার হাঁক দিলে—“ওগোঃ ওগোঃ!” রিদয় বুঝলে তিনজনেই এসেছে, সে অমনি হাত নেড়ে ‘হেথায়’ বলে চৈঁচাতে যাবে আর ডোমরাজা ছুটে এসে ধমকে বললে—“কিও! আয় দিই চোখদুটো খুবলে!” রিদয় অমনি মুখ বুজে গৌ হয়ে বসল।

হাঁসেরা চলে গেল, বুদি গাইও ডেকে ডেকে থামল, তখন ডোমকাক হুকুম দিলে—“উঠাও!” দুটো কাক তাকে আবার ঠোঁটে ঝুলিয়ে নিয়ে ওড়বার চেষ্টায় আছে দেখে রিদয় বললে—“বাপু তোমাদের মধ্যে কেউ পালোয়ান কাক থাকে তো আমাকে পিঠে করে নিয়ে চলো, অমন ঝোলাঝুলি করলে আমার হাত পায়ের জোড় সব খুলে যাবে যে!”

ডোমকাক ধমকে বললে—“চল-চল, অত বাবুগিরিতে কাজ নেই। কাগে চড়বেন এত সুখ তোর কপালে—আমরা কি ঘোড়া যে তোকে পিঠে নেব!”

এবারে ঝোড়োকাগ এগিয়ে এসে বললে—“মহারাজ, মানুষটাকে হাড়গোড় ভেঙে দ করে নিয়ে গেলে তো ওটা আমাদের কোনো কাজে আসবে না, আমি বরং ওকে পিঠে নিই, কী বলেন?”

ডোমকাক মুখ সিঁটকে বললে—“তোমার ইচ্ছে হয় তো ওর পালকি বেহারার কাজ করতে পার, কিন্তু দেখো পালায় না যেন!”

রিদয় দেখলে টোঁড়াকাগটা ওর মধ্যে দেখতে শুনতে ভদ্ররকম, সে আন্তে-আন্তে তার পিঠে চড়ে বসল।

কাকের দল ক্রমাগত দক্ষিণমুখেই উড়ে চলেছে। পরিষ্কার দিনটি খটখট করছে, চারদিকে যেন বাতাস আর আলো ছড়িয়ে পড়েছে, বনের শিয়র দিয়ে রিদয়কে নিয়ে কাকরা উড়ে চলল।

রিদয় দেখলে বৌ-কথা-কও পাখি বকুলগাছের আগডালে বসে বৌকে শুনিয়ে কেবলি গাইছে—“কথা কও বৌ কথা কও, মাথা খাও বৌ কথা কও!” রিদয় অমনি বলে উঠল—“কথা কইবে কি ছিলে, কথা শুনলে গা জুলে!”

“কে রে?” বলে হলদি পাখি আকাশের দিকে ঘাড় তুলতেই, রিদয় তাকে শুনিয়ে বললে—“কাকে-ধরা যক্! কাকে-ধরা যক্!”

ডোমকাক অমনি ধমকে উঠল—“আবার কথা!”

আরো দক্ষিণমুখে গিয়ে রিদয় দেখলে আমবাগানের মাথায় ঘুঘু বসে তার বৌকে গান গেয়ে ঘুম ভাঙাচ্ছে আর গলা ফুলিয়ে আদর করে ডাকছে—“বুঝু ওঠো দেখি ম্ম!”

রিদয় অমনি বলে উঠল—“আদর দেখ উহুঃ!”

ঘুঘু গলা তুলে বললে—“কে রে কে রে?”

রিদয় তাকেও শুনিয়ে দিলে—“কাকে ধরা যক্!”

এবার ডোমকাক রেগে রিদয়কে ডানার থাপ্পড় দিয়ে বললে—“ফের বকচিস, চুপ!”

টোড়াকাক বলে উঠল—“বকুক না যত পারে, পাখিগুলো ভাবচে আমরাও ঠাট্টা তামাশা শিখেছি।”

ডোমকাক আর উচ্চবাচ্য করলে না। রিদয় ঘাঁটিতে-ঘাঁটিতে সব পাখিকে জানিয়ে দিতে-দিতে চলল—তাকে কাকে ধরেছে!

এমনি বন ছাড়িয়ে তারা একটা নগরের উপরে এসে পড়ল। নদীর ধারে মস্ত শিবমন্দির, তারি চুড়োয় ত্রিশূলের ডগায় বসে শালিক তার বৌকে শুনিয়ে রাগরাগিণীতে গলা সাধছে; বৌ তার পঞ্চবটির বাসায় ডিমে তা দিচ্ছে আর কর্তার গান শুনছে—“সা রে গা মা পা—চারটে ডিমে তা, ধা নি সা—দুই জোড়া ছা!”

রিদয় অমনি আকাশ থেকে বলে উঠল—“কাগে খাবে গা!” শালিক “কেও?” বলে মুখ ফেরাতেই রিদয় শুনিয়ে দিলে—“কাকে-ধরা যক্!”

যতই দক্ষিণদিকে এরা এগোতে থাকল ততই বড়-বড় নদী খাল-বিল ক্ষেত মাঠ-ঘাট গ্রাম-নগর দেখা দিতে থাকল। একটা মস্ত বিলের ধারে একটা হাঁস আর একটা হাঁসের সামনে দাঁড়িয়ে কেবলি ঘাড় নাড়ছে আর বলছে, “চেয়ে দ্যাখ আমি তোরি চিরদিন আমি তোরি।”

রিদয়ের মনে হল যেন খোঁড়া আর বালি দুজনে কথা কইছে; সে অমনি তাদের শুনিয়ে বলে উঠল—“এসা দিন রহে থোড়ি রহে থোড়ি!”

“কেও—কেও?” বলে হাঁস মুখ ফেরাতেই রিদয় শুনিয়ে দিলে—“কাকে-ধরা যক্!” এমনি যাকে দেখে, তাকেই নিজের খবর শুনিয়ে দিতে-দিতে রিদয় চলেছে!

বেলা দুপুর, কাকের ঝাঁক এক মঠের জমিতে নেবে সড়া পেসাদ খেতে আরম্ভ করলে। রিদয় খেলে কি না সেদিকে কারু লক্ষ্য নেই। ডোমকাক রিদয়কে আগলে বসে আছে, এমন সময় টোড়াকাক একটা ডালিম এনে ডোমকাককে বললে—“মহারাজ দুটো ফল খেতে আজ্ঞে হোক!” ডালিম ভাঙা কাকের কর্ম নয়, তা টোড়াকাক জানত—ডোমরাজা নাক তুলে বললে—“ওই শুকনো ফল আমি খাব, থুঃ!” টোড়া অমনি সেটা রিদয়ের পায়ের কাছে ফেলে তাড়াতাড়ি রাজার জন্যে যেন ভালো ফল আনতেই যাচ্ছে এইভাবে ছুটে পালাল। রিদয় বুঝলে টোড়া তার জন্যেই ডালিমটা এনেছে; সে অমনি সেটা দাঁতে চিবিয়ে ছালসুদ্ধ খেয়ে ফেললে।

ভাত খেয়ে ডোমরাজ মঠের চুড়োর উপরেতে গেলেন, অন্য সব কাক খেয়েদেয়ে পেট ভরিয়ে রিদয়কে ঘিরে গাল-গল্প শুরু করলে। পাতিকাক দাঁড়াকাককে শুধালে—
“দাদা চুপচাপ ভাবছ কী শুনি!”

দাঁড়াকাক গলা ঝাঁকনি দিয়ে বললে—“ভাবছিলুম এই তল্লাটে এক মিয়া সাহেব একটি মুরগি পুষেছিল, মুরগি ঐ মোছলমানের বিবিকে এত ভালোবাসত যে তাকে খাওয়াবার জন্যে লুকিয়ে বিবির পানের ডাবরে গিয়ে চারটি করে ডিম পেড়ে আসত। মিয়া ডিম খুঁজে খুঁজে হয়রান, তখন কিন্তু আমাদের মধ্যে কে একটা চালাক কাক সে লুকানো ডিম খুঁজে বার করেছিল, না? তার নামটা কী মনে পড়ছে না। সে কি তুমি না আমি, না ওই ডোম না এই ঝোড়োকাক?”

পাতিকাক বলে উঠল—“ওঃ! বুঝেছি, আচ্ছা শোনো দেখি বলি, বোষ্টম-বাড়ির সেই কালো বেরালটাকে মনে আছে তো? সেই যেটা বোষ্টম-বৌয়ের হেঁসেলের মাছ রোজ নিয়ে পালাত, কোথায় সে লুকিয়ে মাছটা রাখত তা বোষ্টম না বোষ্টমী না কালো কেউ টের পেত না, সেই মাছের সন্ধান কে-কে পেয়েছিল দাদা, তুমি না আমি, রাজা না মন্ত্রী?”

সব কাক অমনি এগিয়ে এসে নিজের-নিজের বড়াই করতে আরম্ভ করলে। কেউ বললে—“মাছ চুরি আবার একটা কাজের মধ্যে, আমি একবার একটা খরগোশের লেজ ঠুকরে দিয়েছিলাম; আর একটু হলেই সেটাকে নিয়ে চিলের মতো ছোঁ দিয়ে উড়েছি আর কি, এমন সময় সেটা তার গর্তে সঁধিয়ে গেল!”

আর এক কাগ বলে উঠল—“আরে বাবা খরগোশছানা বেরালছানা এদের নিয়ে খেলা করেছে—মানুষের কাছে কখনো এগিয়েছ? আমি একবার ফিরিস্জির বাড়িতে গিয়ে তাদের টেবিলের রূপোর কাঁটাচামচ চুরি করে সাফ বেরিয়ে এসেছি, একটি পালকে পর্যন্ত আঁচড় লাগেনি!”

রিদয় থেকে-থেকে বলে উঠল—“এই বিদ্যের আবার এত বড়াই, এই বেলা ওসব চুরিচামারি ছাড়ো, না হলে মানুষ বিরক্ত হয়ে একদিন এমন গুলি চালাতে আরম্ভ করবে যে কাকবংশ ধ্বংস করে তবে ছাড়বে!”

“কী বলিস?” বলে সব কাক রিদয়কে তেড়ে এল, মনে হল এখনি তাকে ছিঁড়ে খাবে।

দাঁড়াকাক তাড়াতাড়ি সবাইকে ঠাণ্ডা করে বললে—“ছেলেমানুষ কী বলতে কী বলেছে। থামো হে ওকে মেরো না, রাজা তা হলে ভারি দুর্গুণিত হবেন। মনে নেই সেই যকের ধনটা বার করা চাই। ছোঁড়াটা না হলে সে কাজটা করে কে? তা ছাড়া এটা মানুষ, একে মারলে পুলিশ হাস্যামা হতে পারে।”

কাকেরা রিদয়কে আর কিছু না বলে দাঁড়াকেই ধমকাতে লাগল—“হাঃ মানুষ, ভারি তো উনি বড়লোক যে ভয় করতে হবে, ঢের-ঢের অমন মানুষ দেখেছি—”

এই সময় ডোমকাক উপর থেকে হাঁক দিলে—“চালাও!” এবারে কাকের দল রিদয়কে নিয়ে কাকচিরার পতিত জমির দিকে চলেছে—গ্রাম নগর আর দেখা যাচ্ছে না, কেবল ধু-ধু বালি আর কাঁটাগাছ। মানুষ নেই, গরু নেই, পাখি নেই—কেবল আগুনের

মতো রাঙা সূর্যটা পশ্চিমদিকে ডুবছে—সমস্ত আকাশে যেন আগুন ধরিয়ে দিয়ে।

ভর সন্ধ্যাবেলা ডোমকাক রিদয়কে ধরে নিয়ে কাকচিরার জঙ্গলে এসে নামল। ডোমকাক দূত হয়ে আগে গিয়ে সবার বাসায় খবর দিলে রাজা এলেন, অমনি সব কাকিনী “বা-বা-বা তোবা-তোবা” বলে বাসা ছেড়ে তামাশা দেখতে ছুটল।

শেয়ালের দল অহ্লাদে লেজ ফুলিয়ে হাঁক দিলে—‘হ্যা—কয়েদ হ্যা, তোফা হ্যা!’ চারদিকে হৈ-চৈ—ক্কা-ক্কা-হ্যা শব্দ উঠেছে, তারি মধ্যে টোঁড়া রিদয়ের কানে-কানে বললে—“আমি তোমার দিকে আছি, দেখো খবরদার ওদের কথা শুনে কোনো কাজ কোরো না। কাজ করিয়ে নিয়েই তোমায় মেরে ফেলবে, সাবধান।”

ডোমকাক এসে রিদয়কে টানতে-টানতে শেওড়াগাছের গোড়ায় গর্তটার মধ্যে নামিয়ে দিলে, রিদয় যেন জেরবার হয়ে পড়েছে এমনভাবে আধমরার মতো গর্তের মধ্যে গুয়ে পড়ল। ডোমরাজা ডাকলে—“ওঠ, যা বলি তা কর।” রিদয় যেন শুনতেই পেল না, চোখ বুঝে রইল। ডোম তাকে ধরে যকের পেঁটার কাছের টেনে হিঁচড়ে নিয়ে গিয়ে বললে—“খোল এটা।”

রিদয় ধাক্কা দিয়ে ডোমকে সরিয়ে বললে—“খিদেয় পেট জ্বলছে এখন আমি কাজ করব? আজ রাত্তিরটা না ঘুমিয়ে নিলে আমি কিছু কাজ পারব না, গা-হাত-পা টাটিয়ে গেছে।”

“খোলো আভি!” বলে ডোম রিদয়কে ঝাপটা মেরে পেঁটার গায়ে ঠেলে দিলে : রিদয় গৌঁ হয়ে পেঁটরা ধরে নেড়ে বললে—“বাবা, যে মরচে-ধরা তাল, এ তো খোলা সহজ নয়, আজ খেয়ে-দেয়ে গায়ে জোর হোক, কাল তখন দেখা যাবে!”

ডোম রেগে রিদয়ের গায়ে এক ঠোকর বসিয়ে বললে—“খোল বলছি!”

রিদয় এবারে আর রাগ সামলাতে পারলে না, ডোমকে এক থাপ্পড় কষিয়ে কোমর থেকে ছুরি বার করে বললে—“ফের বজ্জাতি, পাজি কোথাকার!”

ডোমকাক রাগে আর চোখে দেখতে পাচ্ছে না—“তবে রে” বলে সে রিদয়ের উপরে যেমন ঝাঁপিয়ে পড়ল, অমনি রিদয় ছুরিটা তার চোখে বসিয়ে দিলে। ডোমকাক দুবার ডানা ঝটপট করেই অন্ধা পেল।

“হত্যা হ্যা, হত্যা হ্যা,” বলে শেয়াল চোঁচাতে লাগল, “ক্যা ক্যা” বলে কাকরা গোলমাল করে তেড়ে এল। টোঁড়া বোকা সেজে কেবলি রিদয়কে আড়াল করে করে ডানা ঝাপটাতে লাগল, যেন কতই রেগেছে এইভাবে। রিদয় বিপদ গুণে পেঁটরাটা জোরে টেনে খুলে তার মধ্যে লুকোবার চেষ্টা করতে লাগল। পেঁটরাটা কিন্তু টাকায় পয়সায় ঠাসা, তার মধ্যে জায়গা নেই দেখে দু-চার মুঠো পয়সা বাইরে ছড়িয়ে ফেললে!

এতক্ষণ কাকরা হট্টগোল করছিল যেন কাঙালি বিদেয়ের ভিড় লাগিয়েছে। পয়সা পড়তে সবাই ছোঁ দিয়ে এক-একটা তুলে বাসার দিকে দৌড়—চকচকে পয়সা পেয়ে তারা রাজা, রাজহত্যা সব কথাই ভুলে গেল।

সব কাক যে-যার ঘরে গেছে, তখন টোঁড়াকাক এসে রিদয়কে বললে—“ভূমি জানো না আমার কী উপকার করেছ। এসো আমার পিঠে চড়ো, আমি তোমাকে এমন জায়গায় রেখে আসব যেখানে শেয়ালের বাবাও আর ধরতে পারবে না।”

এত ছটোপাটির পর রিদয়ের ঘুম পাচ্ছিল, সে কাকের পিঠে চড়ে ঢুলে-ঢুলে পড়তে লাগল! ঘুমের ঘোরে তার যেন মনে হল অন্ধকারে কাকের চেহারাটা গণেশের ইঁদুরের মতো হয়ে যাচ্ছে—কাক বগ হাঁস শেয়াল সব একসঙ্গে তার মাথার ভিতরে ঘুরছে। এমন সময় আকাশ থেকে যেন বোধ হল চকার দল হাঁকলে—“কোথায়?”

“হেথায়” বলে যেমন রিদয় চেয়েচে অমনি দেখলে কোঁ করে দরজা খুলে গণেশের মতো মোটা পেট নিয়ে তার বাপ ঘরে ঢুকে বললেন—“কিছু ভাঙিসনি তো?”

রিদয় ভয়ে-ভয়ে একবার কুলুঙ্গিটার দিকে চেয়ে দেখলে যেখানকার গণেশ সেইখানেই রয়েছে—দুবার মাথা চুলকে রিদয় এক দৌড়ে বাড়ির উঠোনে এসে দেখলে খোঁড়া-হাঁস পুকুরপাড়ে একটা বুনোহাঁসের সঙ্গে ভাব করছে—আর একটা ঝোড়োকাক চালে বসে “কা-কা” করে ডাকছে—গোয়ালঘর থেকে কপ্লে গাই ডাক দিলে “ওমঃ,” ঠিক সেই সময় একটা গুলি পুকুরঘাট বেয়ে আস্তে-আস্তে জলে নেমে গেল।

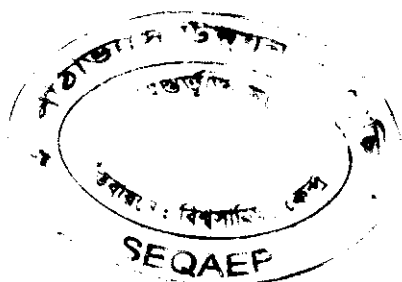
রিদয় পুকুরপাড়ে হাঁ করে কী ভাবছে দেখে রিদয়ের মা কাছে এসে বললে—“কী হল তোর?”

রিদয় মাথা চুলকে বললে—“মা, আমি কি সত্যিই বড় হয়ে গেছি?” বলে আপনার মাথায় হাত বুলোতে লাগল!

সেই সময় ডালিমগাছে টুনটুনি পাখি বলে উঠল—“ও কী রিদয় হল কী!”

“মাথা আর মুণ্ড হল!” বলে রিদয় পুকুরের জলে ঝাঁপিয়ে সাঁতার আরম্ভ করলে।

রিদয়ের মা চৈঁচিয়ে বললে—“এত বড়টি হলি তবু তোর ছেলেমানষি গেল না। উঠে আয়, পাঠশালায় যাঃ।”



চিরায়ত গ্রন্থমালা

এবং

চিরায়ত বাংলা গ্রন্থমালা

শীর্ষক দুটি সিরিজের আওতার

বাংলাভ্যাস সহ পৃথিবীর বিভিন্ন দেশ

ও ভাষার শ্রেষ্ঠ রচনাসমূহকে

পাঠক সাধারণের কাছে সহজলভ্য করার লক্ষ্যে

বিশ্বসাহিত্য কেন্দ্র

একটি উদ্যোগ গ্রহণ করেছে।

এই বইটি 'চিরায়ত বাংলা গ্রন্থমালা'র

অন্তর্ভুক্ত।

বইটি আপনার জীবনকে দীপ্যাবিত করুক।



বিশ্বসাহিত্য কেন্দ্র

“সামাজিক আন্দোলন গড়ে তুলুন, পাঠাভ্যাস বৃদ্ধি করুন”

সেকেন্ডারি এডুকেশন কোয়ালিটি অ্যান্ড অ্যাকসেস এনহান্সমেন্ট প্রজেক্ট (সেকায়েপ)

পাঠাভ্যাস উন্নয়ন কর্মসূচির পুরস্কারের জন্য মুদ্রিত

বিক্রির জন্য নয়